মাহমূদ গযনবীর
ভারত অভিযান-২

ঝলকিত তলোয়ার

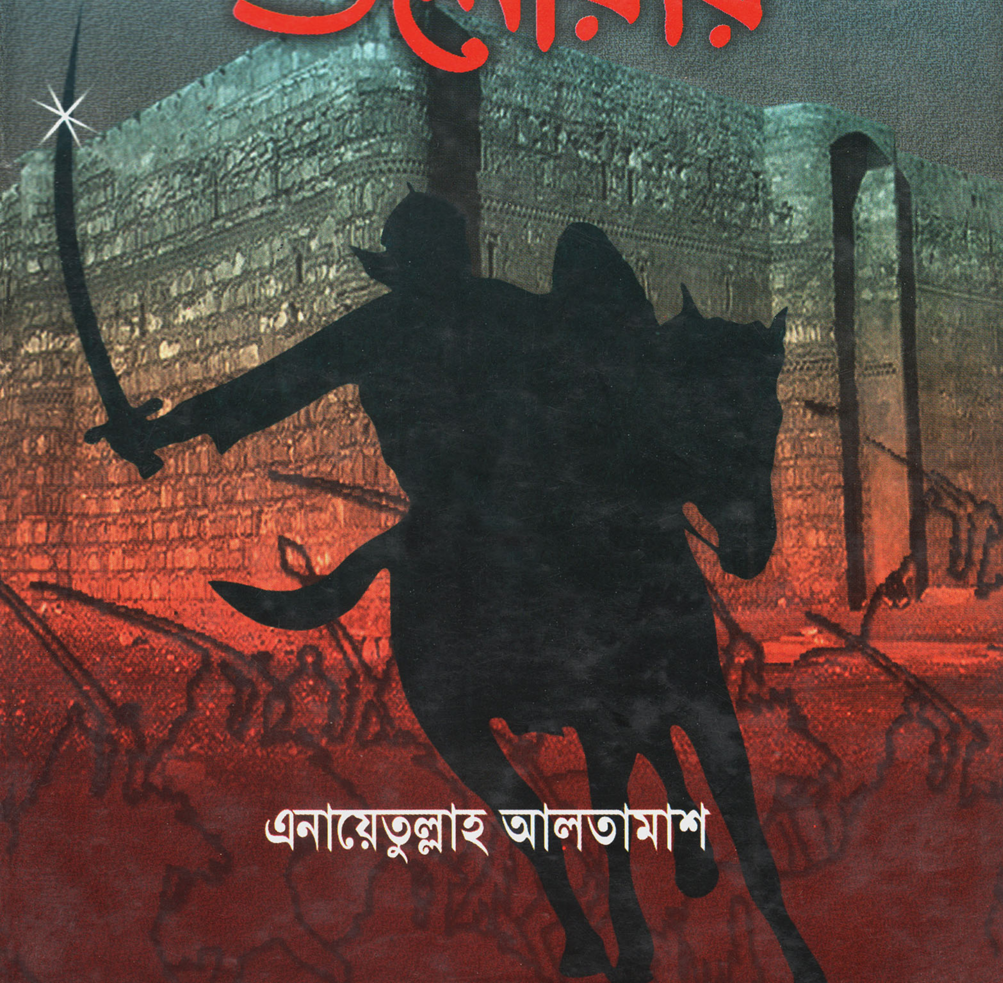

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

ভারত অভিযান - ২

ঝলকিত তলোয়ার

ভারত অভিযান - ২

ঝলকিত তলোয়ার

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনুবাদ

শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা

মনযূর আহমাদ

আবেহায়াত পাবলিকেশন্স

ভারত অভিযান-২
ঝলকিত তলোয়ার
এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

প্রকাশক
মনযূর আহ্মাদ

আবেহায়াত পাবলিকেশন্স
১/৫ সাত মসজিদ রোড (২য় তলা)
মোহাম্মদপুর বিআরটিসি বাসস্ট্যান্ড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
আগস্ট—২০০৩

কম্পিউটার কম্পোজ
আল-আশরাফ কম্পিউটার্স
গেণ্ডারিয়া ঢাকা-১২০৪
ফোন ঃ ৭৪১২৯৩৬

মূল্য ঃ আশি টাকা মাত্র

BHAROT AVIJAN-2 : Writer Enayatullah Altamas, Translated by Shahidul Islam, Published by Abehayat Publications, 1/5 Sat Maszid Road, Mohammadpur, Dhaka-1207.

PRICE : TAKA EIGHTY ONLY

লেখকের কথা

“মাহমূদ গযনীর ভারত অভিযান” সিরিজের এটি দ্বিতীয় খণ্ড। উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান মাহমূদ গযনী সতের বার ভারত অভিযান পরিচালনাকারী মহানায়ক হিসেবে খ্যাত। মাহমূদকে আরো খ্যাতি দিয়েছে পৌত্তলিক ভারতের অন্যতম দু' ঐতিহাসিক মন্দির সোমনাথ ও থানেশ্বরীতে আক্রমণকারী হিসেবে। ঐসব মন্দিরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন মাহমূদ। কিন্তু উপমহাদেশের পাঠ্যপুস্তকে এবং ইতিহাসে মাহমূদের কীর্তির চেয়ে দুষ্কৃতির চিত্রই বেশী লিখিত হয়েছে। হিন্দু ও ইংরেজদের রচিত এসব ইতিহাসে মধ্যযুগের অন্যতম এই মহানায়কের চরিত্র যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে তাঁর সুখ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। ইংরেজ ও হিন্দু ভাবাদর্শে রচিত ইতিহাস এবং পরবর্তীতে সেইসব অপইতিহাসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম লেখকরাও মাহমূদের চরিত্র যেভাবে উল্লেখ করেছে তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বোঝার উপায় নেই, তিনি যে প্রকৃতই একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের সৈনিক ছিলেন, ইসলামের বিধি-বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। দুমশনদের প্রতিহত করে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করণের জন্যেই নিবেদিত ছিল তার সকল প্রয়াস। অপলেখকদের রচিত ইতিহাস পড়লে মনে হয়, সুলতান মাহমূদ ছিলেন লুটেরা, আগ্রাসী ও হিংস্র। বারবার তিনি ভারতের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ করে সোনা-দানা, মণি-মুক্তা লুট করে গযনী নিয়ে যেতেন। ভারতের মানুষের উন্নতি কিংবা ভারত কেন্দ্রিক মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কখনই ছিল না। যদি তৎকালীন ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে ইসলামের ঝাণ্ডা ছড়িয়ে দেয়ার একান্তই ইচ্ছা তাঁর থাকতো, তবে তিনি কেন মোগলদের মতো এখানে স্থায়ীভাবে থেকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন না? ইত্যাকার বহু কলঙ্ক এঁটে তার চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে।

মাহমূদ কেন বার বার ভারতে অভিযান চালাতেন? মন্দিরগুলো কেন তার টার্গেট ছিল? সফল বিজয়ের পড়ও কেন তাকে বার বার ফিরে যেতে হতো গযনী? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব ও ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক ও ইনসাফগার শাসক সুলতান মাহমূদকে তুলে ধরার জন্যে আমার এই প্রয়াস। নির্ভরযোগ্য দলিলাদি ও বিশুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে আমি এই

বইয়ে মাহমূদের প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত পক্ষে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর মতোই মাহমূদকেও স্বজাতির গাদ্দার এবং বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যতো বার তিনি ভারত অভিযান চালিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে না হতেই খবর আসতো, সুযোগ সন্ধানী প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা গযনী আক্রমণ করছে। কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়েই মাহমূদকে গযনী ফিরে যেতে হয়েছে। একপেশে ইতিহাসে লেখা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ সতের বার ভারত অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমূদকে উৎখাত করার জন্যে কতো শত বার আগ্রাসন চালিয়ে ছিল গযনীর দিকে।

সুলতান মাহমূদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শত্রুদের দমিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে ভারতের পৌত্তলিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমূদের পিতা সুবক্তগীন তাকে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বস্তিতে থাকতে দিবে না। এরা গযনী সালাতানাতকে উৎখাত করে পৌত্তলিকতার তুফানে কাবাকেও ভাসাতে চাচ্ছে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মত ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জোর জবরদস্তি হিন্দু বানাচ্ছে। এদের ঈমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌত্তলিকতার দুর্গ গুড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্যাতিত বনি আদমকে আযাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

আলবিরুনী, ফেরেশ্তা, গরদিজী, উতবী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজয়ী এলাকায় তার হেদায়েত মতো পুরোপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে শাইখের দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছদ্মবেশে পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, "আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গযনীর সুলতানের দূত সুলতান নিজেই হয়ে থাকেন। এটা প্রকৃতই মুসলমানের আলামত।"

মাহমূদ কুরআন, হাদীস ও দ্বীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সব সময় তার বাহিনীতে শত্রু পক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দু'রাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, "আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমূদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীর সেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের ব্যবধান ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খৃস্টশক্তি আর মাহমূদের প্রতিপক্ষ ছিল মুসলমানদের অন্যতম শত্রু হিন্দু পৌত্তলিক। ইহুদী ও খৃস্টানরা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত নারী গোয়েন্দা দিয়ে আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-খৃস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল খুবই দুর্বল কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল খুবই তৎপর ও চৌকস।

তবে একথা বলতেই হবে, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমূদের গোয়েন্দারা ছিল নৈতিক দিক দিয়ে ততোটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটতে যেতো। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাঙ্গররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা কার্যক্রম বেশি ফলদায়ক ছিল।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য ও বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের জন্যে গল্পের মতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বভাব জেনে এবং আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বসূরীদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

লাহোর।

প্রকাশকের আরয

ঔপন্যাসিক আলতামাশ এখন এদেশেও যথেষ্ট পরিচিত। সুলতান মাহমূদ গযনীও কারো কাছে অপরিচিত নন। অপরিচিত ছিল এ বইটি এবং এ বইয়ের সুলতান মাহমূদ গযনী। সুলতান মাহমূদ নামটি প্রায় সকলে শুনেছি কিন্তু তাঁর জীবন ও সংগাম, সংঘাত ও বিজয় সম্পর্কে কতটুকু জানি? আজ নিজেকে উপমহাদেশের এক গর্বিত মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিচ্ছি-এই গর্ব, পরিচয় ও অর্জনের পিছনে কার অবদান সবচেয়ে বেশী? কাদের খুন চুষে সজীব হয়েছে এই মাটি? শের্‌কী ও কুফ্‌রীর জঙ্গল ঝেড়ে বিপদ সঙ্কুল পথ মারিয়ে এখানে কারা ঈমানের আবাদ করেছিল? তাদেরকে আমরা কতটুকু চিনি, তাদের সত্যিকার পরিচয় কি আমরা জানি? সহস্রাধিক বছর থেকে এদেশে ইসলাম বিজয়ী। এই বিজয়ী নিরাপদ যমীন বহু কষ্টে পেয়েছি না স্বপ্নে পেয়েছি?

সেই ইতিহাস, সেই সব কথা, অজানা সব তথ্য বিধৃত হয়েছে এই বইয়ে। ইতিহাস বাঙময় হয়ে উঠেছে আলতামাশের দক্ষ হাতের শৈল্পিক কলমে। মূল বইটির নাম 'আওর এক বুত শিকান পয়দা হুয়া।' বাংলা নাম 'মাহমূদ গযনীর ভারত অভিযান।' অন্তত সাত-আটটি খণ্ডে এই সিরিজ শেষ হবে। সিরিজের দ্বিতীয় বইটির নাম "ঝলকিত তলোয়ার'। বইটির অনুবাদ করেছেন "মাসিক আল-আশরাফ"-এর নির্বাহী সম্পাদক এবং আমার অকৃত্রিম বন্ধু, উজ্জীবিত প্রাণ মুমিন **মাওলানা শহীদুল ইসলাম**। অত্যন্ত সরস ও সাবলীল তার অনুবাদ।

এ বইয়ে অনেক দুর্বলতা আছে, ওয়াদা অনুযায়ী যথাসময়ে পাঠকের হতে তুলে দিতে যথেষ্ট দেরী হয়েছে। সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি বইটি সুন্দর করতে। তবুও ভুল রয়ে গেছে। এই দুর্বলতা ও ভুল দূর করার সুযোগ পাব দ্বিতীয় সংস্করণে। সার্বিক সুন্দরের লক্ষ্যে বিনয়ের সাথে এই সময়টুকু চাচ্ছি পাঠকের কাছে। এর সাথে চাচ্ছি সকলের সুপরামর্শ, শুভ কামনা ও দোয়া। ভরসা শুধু আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা এবং পাঠকের ভালবাসা।

মনযূর আহমাদ

১৩.০৭.০৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অভিন্ন পথের অভিযাত্রী

ভোর হল। রাজা জয়পালের সকল যুদ্ধসরঞ্জাম জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। দেড় মাইল এলাকা জুড়ে শুধু ছাই-ভস্ম আর আগুনের কুণ্ডলী। তখনও মানুষ বেঁচে যাওয়া পণ্যসামগ্রী রক্ষায় সচেষ্ট। এদিকে মুসলমান পাড়ায় শুরু হয়েছে হিন্দুদের সন্ত্রাস। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ আর লুটতরাজ চলছে। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। মুসলিম নারী-পুরুষদের টেনে হেঁচড়ে ঘর থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। মহিলাদের গায়ের অলংকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। রাজা জয়পাল নিজেই এই নির্দেশ দিয়েছে । রাজা বলেছে, মুসলমানদের ঘরে যা পাও হাতিয়ে নাও এবং সরকারের কোষাগারে জমা কর।

রাতে এমরান ও তার সাথীরা পণ্ডিতের কাছ থেকে ঋষীকে ছিনিয়ে নেয়ার পর ব্যর্থ পণ্ডিত শহরের দিকে রওয়ানা হলো। শহর জ্বলছে কিন্তু সে বিষয়ে পণ্ডিতের মনে বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই। সে সোজা মন্দিরে প্রবেশ করলো এবং একটু পরেই কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে বেরিয়ে এলো। শহরের সকল মানুষ আগুনের পাশে এসে জড়ো হয়েছে। ছেলে-বুড়ো, প্রৌঢ়-যুবা, যুবতী-কিশোরী কেউ বাকি নেই। পণ্ডিত ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা এই দুরবস্থার মধ্যেও খুঁটে খুঁটে দেখছিল মেয়েদের। কারণ ঋষীর শূন্যতা তাকে পূরণ করতেই হবে। হঠাৎ একটি চেহারায় দৃষ্টি আটকে গেল পণ্ডিতের। একটি কিশোরীর প্রতি ইঙ্গিত করে দূরে সরে গেল।

একটু পড়েই দেখা গেল, কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ি এসে হাজির। মন্দিরের বিশেষ গাড়ির আগমনে সসম্মানে মেয়েরা এদিক ওদিক সরে গেল। পণ্ডিতের এক লোক ঐ কিশোরীকে ধরে ফেলল, অপর একজন মেয়েটির নাকের ওপর একটি রুমাল রেখে তাকে টেনে-হেঁচরে গাড়িতে তুলল। অবস্থার আকস্মিকতায় ব্যাপারটি কেউ তেমন আন্দাজ করতে পারল না। পণ্ডিতের ঈশারায় দ্রুত মেয়েটিকে নিয়ে গাড়ি পৌঁছে গেল মন্দিরে। বেলা বাড়ার আগেই তাকে টিলার মন্দিরে পৌঁছে দেয়া হল। যে টিলায় আটকে রাখা হয়েছিল ঋষীকে। কিন্তু মেয়েটি চেতনানাশক পদার্থের প্রভাবে তখনও হুঁশ ফিরে পায়নি।

পৌত্তলিকতাকে কখনো ধর্ম বলা যায় না। আজও বিবেকবান মানুষের কাছে তা কখনো ধর্ম নয়। অলীক কল্পনা, রেওয়াজ-রসম, মনুষ্য সৃষ্ট আনুষ্ঠানিকতা ও গোড়ামীর সমন্বিত রূপ পৌত্তলিকতা। কোনো উর্বর মস্তিষ্কের মতলববাজ এই অমানবিক কর্মগুলোকে ধর্ম হিসাবে আখ্যা দিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত করেছে। পৌত্তলিকতাবাদে আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্ত্বার অনুভব অসম্ভব। কথিত এ মতবাদে নিরীহ্ অসহায় মেয়ে এবং শিশুদের অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হয়, বিনা অপরাধে এদের হত্যা করা হয়; ধোঁকা, প্রতারণা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ পৌত্তলিক ধর্মের মূল ভিত্তি। পৌত্তলিক ধর্মের পণ্ডিতেরা এসব অমানবিক ও অলীক অপকর্মগুলোকে ধর্মীয় বিধান বলে সমাজে চালু করেছে আর ভক্তেরা এগুলোকেই মেনে নিয়েছে ধর্মীয় বিধান হিসেবে। এরা আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য মূর্তি বানিয়েছে এবং প্রতিটি বড় বড় সৃষ্টির পূজা করছে ও অসংখ্য দেব-দেবীকে একেকটা মহান সৃষ্টি এবং শক্তির অধিকারী বলে প্রচার করছে। এখনও পর্যন্ত এদের মধ্যে দেখা যায়, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, সাপ-বিচ্ছু, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি ইত্যাদির পূজা করতে।

গজনীর শার্দূল-গোয়েন্দারা যে দক্ষতায় রাজা জয়পালের যুদ্ধ সামগ্রীতে আগুন ধরিয়ে দিল জয়পালের বাহিনী তাদের বিন্দু বিসর্গও আঁচ করতে পারলো না। জয়পাল উল্টো ভাবলো, কিশোরী বলিদানে বিলম্বের কারণে দেবতা অসন্তুষ্ট হয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। অবশ্য সে একথাও বলেছিল, অসম্ভব নয় যে, এটা সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দারা করেছে। কিন্তু এ অগ্নিকাণ্ড 'দেবতার-রোষ না প্রতিপক্ষ গোয়েন্দাদের কাজ' রাজা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিল না। হতাশা ও ব্যর্থতায় নিমজ্জিত রাজা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সেনাপতিকে বলল, "পণ্ডিতকে ডাক। দেবতা চরম রুষ্ট হয়েছে। একটির বদলে দু'টি মেয়েকে বলি দিতে হবে, তাড়াতাড়ি।" রাজা চেঁচিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো বলছিল, "মুসলমানদের সব ঘর জ্বালিয়ে দাও। এদের সবকিছু লুটে নাও। আর সকল মুসলমান মেয়েকে ধরে এনে আমার সামনে হাজির করো।"

সত্যিকারে যারা আগুন লাগিয়েছিল এরা ছিল দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী, দূরদর্শী। জয়পালের দেবতাদের শাসন এদের উপর অচল। জয়পাল যখন অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত নিয়ে ভাবছে আর হতাশা ও মর্মযাতনায় ভুগছে ইত্যবসরে গোয়েন্দারা তার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

মুহূর্তের মধ্যে কয়েকশ' মুসলমান নারী শিশুকে ধরে এনে রাজার সামনে হাজির করা হলো। এদের অধিকাংশই ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলিম ঘরের নারী ও শিশু। বলপূর্বক এদেরকে নিজেদের হারেম থেকে ধরে আনা হয়। রাজা চোখ বড় বড় করে অগ্নি দৃষ্টিতে মুসলিম নারী-যুবতীদের দেখছিল। রাজার এই দৃষ্টিতে যেমন ছিল রোষ তেমনি ছিল পাশবিক উন্মত্ততা।

মুসলিম নারীদের মধ্য থেকে একদল সুন্দরী যুবতী-কিশোরীকে রাজার সাঙ্গ-পাঙ্গরা অন্যদের ডিঙ্গিয়ে রাজার সামনে নিয়ে গেল। রাজা এদের দেখে বলল, "তোমাদের সৌভাগ্য যে তোমরা সবাই সুন্দরী। অন্যথায় তোমাদের সাথে এমন ব্যবহার করা হত, জীবনের জন্য তোমাদের জাতি একটা শিক্ষা পেত। এখন থেকে তোমরা রাজ মহলে থাকবে। তোমাদের ধর্মকে ভুলে যেতে হবে। যেদিন তোমাদের লোকেরা এসে বলবে, অগ্নিকাণ্ড কারা ঘটিয়েছে সেদিন তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে।" একথা বলে পৈশাচিক হাসি হাসল রাজা।

"তোমাদের ধর্মের মতো আমাদের ধর্ম এমন ঠুনকো নয় যে, তোমাদের কথায় ভুলে যাব।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল এক কিশোরী।

"এই মেয়ে! বকবকানি বন্ধ কর।" গর্জে উঠল এক মন্ত্রী। "জান, কার দরবারে তোমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছ?"

"তোমাদের মহারাজ আমাদের খোদা নয়।" বলল অন্য এক কিশোরী। "অসহায়, নিরপরাধ মেয়েদের উপরে যে রাজা হাত উঠাতে পারে তাকে কোন মুসলিম নারী সম্মান করতে পারে না। মহারাজা! তুমি মনে রেখো, তোমার যাবতীয় জুলুম-অত্যাচার আমরা হাসি মুখেই বরণ করব। কিন্তু তোমার পরিণতি হবে ভয়াবহ। তোমাকে মৃত নয় জীবন্ত জ্বলতে হবে। তোমার কোন দেবতাই তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। ইতোমধ্যে তুমি দু'বার পরাজিত হয়েছো। একটি নয় হাজার কিশোরীকে দেবীর চরণে বলিদান করলেও তোমার পরাজয় বিজয়ে রূপান্তরিত হবে না। পরাজয় তোমার বিধিলিপি। তুমি আমাদের শাস্তি দিলে এরচেয়ে শতগুণ বেশি কঠিন শাস্তি তোমাকে আমাদের প্রভু দেবেন।"

"এদের নিয়ে যাও।" নির্দেশ করল রাজা। সৈনিকেরা টেনে-হেঁচড়ে মুসলিম মেয়েদেরকে বন্দিশালায় নিয়ে গেল।

* * *

সুলতান মাহমূদ খোরাসান ও বোখারাকে নিজের শাসনে নিয়ে এলেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হলো না। সে সময়ে বাগদাদের খেলাফতে আসীন হন কাদের বিল্লাহ্ আব্বাসী। ইসলামী নীতি অনুযায়ী সকল ছোট বড় রাষ্ট্র ও রাজ্য বাগদাদ খেলাফতের অধীনস্থ। সকল রাজ্য ও রাষ্ট্রপ্রধান কেন্দ্রীয় খেলাফতের ফর্মান মানতে বাধ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকদের দুর্নীতি, আদর্শচ্যুতি এবং আঞ্চলিক শাসকদের ভোগবিলাসিতা ও ক্ষমতালিপ্সা খেলাফতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এবং শাসকদের মাঝে সৃষ্টি করে পারস্পরিক বিদ্বেষ। তখন শুধু বাগদাদ খেলাফত প্রতীকী কেন্দ্ররূপে বেঁচে আছে। তবুও সুলতান সুবক্তগীন কেন্দ্রীয় খেলাফতের সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। সুলতান মাহমূদও খেলাফতের প্রতি আনুগত্য বহাল রাখলেন। বুখারা ও খোরাসানকে গজনী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে সুলতান

মাহমূদ কেন্দ্রীয় খলিফাকে লিখলেন—"আমার এলাকার মুসলমানরা গৃহযুদ্ধে যে বিপদগ্রস্ত হয়েছে সে বিপর্যয় এখনো কাটেনি। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী ক্ষমতালিপ্সুদের বিরুদ্ধে আমাকে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। এরা আমাদের ভূখণ্ড টুকরো টুকরো করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল আর নিজেদেরকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করছিল। আমি তাদের কাছে বহুবার মৈত্রী ও সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়েছি, অমুসলিমদের ক্রীড়নক হয়ে মুসলিম জাতি নাশ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছি কিন্তু আমার শান্তিপ্রস্তাব ও উদারতাকে তারা হীনমন্যতা ও দুর্বলতা মনে করেছে। এরা পরিস্থিতি এতই বিপদাপন্ন করে তুলেছিল যে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমরা আপনার অনুমোদন গ্রহণ করার সুযোগও পাইনি। তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে প্রতিরোধব্যবস্থা করতে হয়েছে। দৃশ্যত আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, বোখারা ও খোরাসান বিদ্রোহী ও গাদ্দারদের থেকে ছিনিয়ে এনে আমি তা গজনী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেছি। অবশ্য একে আমি সুসংবাদ ও সাফল্য মনে করি না। মূলত এটা একটা জাতীয় দুর্ঘটনা যে, আমরা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত। যে সমষ্টিগত শক্তি ইসলামের সুরক্ষা এবং অগ্রগতির জন্য ব্যয় করার কথা ছিল, যে শক্তি ইসলামের সীমানাকে বিস্তৃত করার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল সেই অপরিমেয় সম্ভাবনাকে আমরা অভ্যন্তরীণ হানাহানিতে অপব্যয় করেছি......।

আমি ময়দানের লোক। আমার মনে হয়, আমার জীবন রণাঙ্গনে কেটে যাবে। আমার লাশ হয়ত কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকবে। আমার ভয় হয় ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে যেন আমি নিহত না হই। এমন লড়াই সংঘাতে আমার মৃত্যু হলে আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দেব? আমি আমার রাজত্বের পরিধি বৃদ্ধি করতে চাই না, আমি চাই ইসলামের বিস্তৃতি। রাজমুকুট মাথায় পরে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসার অবকাশ আমি কখন পাব! হিন্দুস্তানের অসংখ্য দেব-দেবী আমাকে তিরস্কার করছে। রাজা জয়পাল হিন্দুস্তানের সকল রাজাদের নিয়ে আমার বিরুদ্ধে সমরায়োজন করছে। আমি যখন ওদের দিকে অগ্রসর হই তখন আমার মুসলমান ভাইয়েরা পিছন থেকে আমার পিঠে ছুরি মারে। আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে আমার ভাই ও মুসলিমরা অভিন্ন শত্রুতে পরিণত হয়েছে....।

আপনি কি ঘোরী, তিবরিস্তানী, সামানী ও এলিখানীদের বলতে পারেন যে, আমরা সবাই একই নবীর উম্মত? এদেরকে কি একথা শুনানো সম্ভব যে, ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে বিধর্মীদের মোকাবেলায় টিকে থাকা সম্ভব নয়....?

এখানে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এখনো বিদ্যমান। জনাবের দু'আ ও সহযোগিতা আমার একান্ত কাম্য। গজনী সালতানাতের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভাল নয়। আমি জানি, আমাকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করা আপনার পক্ষেও অসম্ভব। আমি তা

প্রত্যাশাও করি না। আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে সহযোগিতা করেন।

আপনার গুণমুগ্ধ
মাহমূদ
খাদেম
"গজনী সালতানাত"

সুলতান মাহমূদের পত্রের জবাবে বাগদাদের খলিফা কাদের বিল্লাহ আব্বাসী লিখলেন....... ।

"আপনার চিঠি পাঠান্তে দুঃখ বোধ করছি। কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হইনি। অবশ্যই ব্যাপারটা মোটেও নতুন নয়। আমাদের শাসকদের মধ্যে ক্ষমতার নেশা মিল্লাতের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আজ যারা পারস্পরিক জিঘাংসায় লিপ্ত এরা ইসলাম ও মুসলমানের অমিত সম্ভাবনাকে নিজেদের হীন স্বার্থে অপাত্রে ব্যবহার করছে। আপন ভাইকে নিশ্চিহ্ন করতে এরা ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলেছে। উম্মতে মোহাম্মদীকে নিজেদের দাস ও প্রজা বানিয়ে রাখার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের শাসনের বিরুদ্ধে অপবাদ ও মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে গৃহযুদ্ধকে উস্কে দিচ্ছে। এটা এখন মুসলিম শাসকদের প্রধান কাজে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে আমাদের শাসকদের মধ্যে চলছে এই অপপ্রয়াস। নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতার মোহে উম্মাহকে ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত করছে। আর এক অঞ্চলের মুসলমানদেরকে অপর অঞ্চলের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। ফলে খেলাফতের মানচিত্র শত ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছে। আর এরই সুযোগ নিচ্ছে বিধর্মীরা। বিধর্মীরা আমাদের জ্বলন্ত আগুনে জ্বালানী ঢালছে। আর মুসলিম খেলাফতকে ভেঙ্গে চুড়ে বিনাশ করছে... ।

আমাদের শাসকবর্গ মোটেও বুঝতে চাচ্ছেন না, আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেলে প্রতিটি অংশই বিধর্মীদের সহজ শিকারে পরিণত হবে। কাণ্ড থেকে শাখা ভেঙ্গে গেলে যেমন শুকিয়ে মরে যায়, তেমনি কেন্দ্রীয় খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মুসলিম রাজ্যগুলোও অল্পদিনের মধ্যে ইসলামী চেতনা হারিয়ে বিলীন হয়ে যাবে। এভাবে যদি একের পর এক শাখা ভাঙ্গতে থাকে তাহলে এক সময় মুসলিম খেলাফতের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে ..... ।

গৃহযুদ্ধকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য যদি আপনাকে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় সেজন্য আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি। তবে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, ক্ষমতার মোহে যেন যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়েন। আপনি বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ জনগোষ্ঠীগুলোকে একত্র করুন। তাদেরকে ঐক্য-মৈত্রীর বাঁধনে আনতে চেষ্টা

করুন। হিন্দুস্তানে মুসলমানরা দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। কতিপয় শাসক হিন্দু রাজাদের ভয়ে এবং নিজেদের ভোগ ও বিলাসিতার উপকরণ আমদানী অক্ষুণ্ন রাখার হীন স্বার্থে ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি মনে করি, এদেরকে দমন করে হিন্দুস্তানের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া আপনার দায়িত্ব। তাদের ঈমান ও ইজ্জতের সুরক্ষা করা আপনার কর্তব্য। অনৈতিকতার আড্ডা হিন্দুস্তানের দেব-মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে সেখানে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা আপনারই কাজ...।

যদি আপনার দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন থাকে, আপনার উদ্দেশ্যে যদি কোন কলুষতা না থাকে, আল্লাহর পথে জিহাদই যদি হয় আপনার লক্ষ্য, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য আপনার পদচুম্বন করবে। ক্ষমতার মোহে এবং জাগতিক স্বার্থে যারা যুদ্ধ করে দৃশ্যত বিজয়ী হলেও এ সফলতা ক্ষণিকের। স্থায়ী সাফল্য তারাই লাভ করে যারা সত্যের পথিক ও ন্যায়ের পথে চলে।"

বাগদাদের খলিফা এই চিঠিতেই সুলতান মাহমূদকে খোরাসান, বোখারা, আফগানিস্তানসহ বিশাল ভূখণ্ডের সুলতান ঘোষণা করেন এবং তাকে 'ইয়ামীনুদ্দৌলা' এবং 'আমিনুলমিল্লাত' অভিধায় অভিষিক্ত করেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ কাসেম ফেরেশতা লেখেন, রাজা জয়পালের দ্বিতীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং গৃহযুদ্ধ অবদমনে সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনী, জনবল ও অস্ত্রবল একেবারেই পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক আবু নসর মুস্‌কাতি এবং আবুল ফজলের রচনা থেকে বোঝা যায় যে, সেই সময়ে সুলতান মাহমূদের অধীনে যে পরিমাণ দক্ষ সৈনিক, যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞ আলেম-উলামা ছিলেন এবং তার প্রশাসনে যে পরিমাণে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মী বাহিনী ছিল সমকালীন কোন শাসকের এমনটি ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞ ও দক্ষ এসব লোকদের পারিতোষিক হিসাবে সুলতান মাহমূদকে মোটা অঙ্কের খরচ বহন করতে হতো। তিনি তার প্রতিবেশী গোলযোগপূর্ণ রাষ্ট্র এবং পৌত্তলিক ভারতের আনাচে কানাচে গোয়েন্দা বাহিনীকে যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এর পেছনেও তাকে বিপুল খরচ বহন করতে হতো। বস্তুত এসব কারণেই অর্থনৈতিক দুরবস্থার মুখোমুখি হয়ে পড়েন সুলতান মাহমূদ। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলল আর অপরদিকে জয়পালের নেতৃত্বে হিন্দু রাজারা গজনী আক্রমণের প্রস্তুতি নিল। একদিকে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন অপরদিকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় সেনাশক্তির ঘাটতি। যারা ছিল তার মূল শক্তি এরাই হয়ে গেল প্রতিপক্ষ।

সুলতান মাহমূদের অবস্থা যখন চতুর্মুখী আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক দৈন্যতায় বিপর্যস্ত, সুলতানের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঠিক এই মুহূর্তে আঁধার ভেদ করে দেখা দিল আলোর আভা ....।

চতুর্দিক থেকে গোয়েন্দা পরিবেশিত দুঃসংবাদের ঘনঘটা। রাজা জয়পাল আক্রমণ শানাচ্ছে। আমির শ্রেণীর মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। গভীর দুঃশ্চিন্তায় তলিয়ে গেলেন সুলতান। নিজের আসনে বসে উদাস মনে উপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ইত্যবসরে প্রহরী এসে খবর দিল, দু'জন আগন্তুক সুলতানের সাথে জরুরী সাক্ষাৎ করতে চায়। এরা **চিস্তানের** বাসিন্দা। সুলতান তাদেরকে হাজির করতে বললেন। তারা এল। সুলতান তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে কাছে ডাকলেন এবং আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। তারা বলল, আমরা চিস্তানের বাসিন্দা। আমাদের গ্রামে সুপেয় পানির অভাব। অনেক দূর থেকে আমাদেরকে খাবার পানি বহন করতে হয়। গ্রামের সবাই মিলে আমরা একটি কূপ খননের জন্য কাজ শুরু করেছিলাম। আমাদের ধারণা মতে পানি খুব বেশী গভীরে থাকার কথা নয় এবং যমীনও খুব বেশী শক্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মাত্র তিন হাত খননের পরেই আর খনন করা সম্ভব হচ্ছিল না। পাথরের চেয়েও শক্ত মাটি দেখা গেল। খোরাসান ও চিস্তানের মহামান্য সুলতান! জমীন শক্ত ও পাথুরে হওয়াতে কোন সমস্যা ছিল না। আমরা তবুও খননকার্য অব্যাহত রাখতাম। কিন্তু তিন ফুট গভীরেই এমন মাটি দেখা দিল যে, আমাদের কোদাল, শাবল কোন কাজ করছিল না। আমরা জোরে আঘাত করলে মাটি থেকে আগুনের স্ফূলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, কোদাল ভেঙ্গে যায়। কিন্তু পাথর ভাঙ্গে না। এটা নিছক পাথর নয়। পাথরের রং অমন নয়। আমাদের বিশ্বাস, এটা কোন মূল্যবান ধাতু হবে। অনেকেই বলাবলি করছে, আগেকার কোন রাজা বাদশার গচ্ছিত ধন-সম্পদ এগুলো। যারা এই সমস্ত ধন-সম্পদ গচ্ছিত রেখেছে তাদের প্রেতাত্মা ও জ্বীনদের বসবাস এখানে। গ্রামের মানুষ এসব বলাবলি করে খুব ভীতু হয়ে পড়েছে। ভয়ে কেউ ওদিক মাড়াতে চায় না। একজন বুযুর্গ ব্যক্তি আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন সুলতানের কাছে এই খবর পৌঁছাতে। কারণ, যদি গচ্ছিত ধন-সম্পদ হয়ে থাকে তাহলে এগুলো উন্মুক্ত পড়ে রয়েছে। হেফাযত করা দরকার। আর কোন দামী ধাতু হলেও বিষয়টা সুলতানের নজরে থাকা উচিত।

সুলতান মাহমূদ তাদের কথা শুনে ভূমি সম্পর্কে কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং কয়েকজন কমান্ডারের সাথে কিছুসংখ্যক সৈন্য দিয়ে কথিত এলাকা পরিদর্শনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, জ্বিন-ভূত এসব কিছুই না। আপনারা ওখানে গিয়ে আরো খনন কার্য চালিয়ে ব্যাপারটি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আমাকে অবহিত করুন।

কয়েকদিন পর সুলতান মাহমূদকে খবর দেয়া হল, এটি কোন গুপ্তধন নয়, এটি স্বর্ণের খনি। ভূমি থেকে মাত্র চার-পাঁচ হাত গভীরে স্বর্ণস্তর। খনন করার পর বিরাট এলাকা জুড়ে স্বর্ণখনি দেখা গেল।

ঐতিহাসিক গারদেজী ও কাসেম ফেরেশতার মতে, সুলতান মাহমূদের শাসনামলেই ওই খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলন শুরু হয়। কিন্তু সুলতান মাহমূদের ইন্তেকালের পরে তার ছেলে মাসুদ যখন ক্ষমতায় আসীন হন তিনি পিতার নীতি আদর্শের পরিপন্থী কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি নিজেকে ভারতের হিন্দু রাজাদের মতো সুলতানের পরিবর্তে রাজা ঘোষণা করেন, আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। উত্তোলিত স্বর্ণখনির আয় অনৈসলামিক কর্ম, বিনোদন, সাজসজ্জা, মিনাবাজার প্রতিষ্ঠা ও খেল-তামাশায় ব্যয় করতে থাকেন। তখন একরাতের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে স্বর্ণখনি মাটির গভীরে হারিয়ে গেল। পরবর্তীতে বহু খনন করেও মাসুদ আর স্বর্ণখনির অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন না।

স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হবার পর মাহমূদ যখন দেখলেন, প্রকৃত পক্ষে এটি খাঁটি স্বর্ণ খনি তখন তিনি তার পীর ও মুর্শিদ আবুল হাসান খেরকানির দরবারে হাজির হলেন এবং বললেন, "আমার আব্বু জীবদ্দশায় এই স্বর্ণখনিটিকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম, একটি স্বর্ণের গাছ আমার ঘরের ছাদ ফুড়ে উপরের দিকে উঠেছে এবং এর ডালপালা অর্ধেক দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

.....এরপরে আমার জন্ম হলো। অবশ্য এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করা হলো যে, আমার শাসনামলে গজনী সালতানাতের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং দূরদূরান্ত পর্যন্ত ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়বে। এখন স্বর্ণখনি যা আবিষ্কৃত হলো সেটির অবস্থানও অনেকটা গাছের মতো। স্বর্ণের স্তর মাটির অল্প গভীরে গাছের ডালপালার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। আমার প্রিয় পীর ও মুর্শিদ! আপনি আমাকে মেহেরবানী করে বলুন, এসবের তাৎপর্য কী?"

"যমীনে এবং আসমানে আমাদের দৃষ্টিসীমার অগোচরে যা রয়েছে এর প্রকৃত কারণ একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন" বললেন, আবুল হাসান খেরকানী। তুমি মনে মনে যা ধারণা করেছ আল্লাহ্ সেটিও জানেন। তুমি এখনও যা চিন্তা করোনি সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ সম্যক অবগত। তোমার একথা অনুধাবন করা উচিত, আল্লাহ্ তা'আলা সেইসব রাজা বাদশাহকে এ ধরনের অলৌকিক ঈশারা করে থাকেন যারা রাসূলের প্রকৃত উম্মত হয়ে থাকেন। তুমি যদি আল্লাহর রাসূলের প্রেমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই জিহাদ করে থাক তাহলে যে সমস্ত লোক মুসলমান হওয়ার পরেও ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন এবং ক্ষমতা ও রাজত্বের লোভে মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, অহেতুক খুনোখুনি করছে আর তুমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এখন অভাবে নিপতিত হয়েছ এবং তুমি শুধু আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য কামনা করছ। আল্লাহ্ তোমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। গাছের আকৃতিতে তোমার অভাব পূরণে মাটির ভেতর থেকে স্বর্ণখনি উন্মোচন করে দিয়েছেন।

প্রত্যেক সুলতানেরই উচিত বৃক্ষ সদৃশ হওয়া। বৃক্ষ যেমন নিজে সূর্য-তাপ সহ্য করে মানুষকে ছায়া দেয়, মানুষ বৃক্ষের অঙ্গহানি করেও বৃক্ষের নীচে বসে আরাম করে। শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষ বৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে আবার প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠে। নব উদ্যমে আবার জীবনকর্ম শুরু করে। সুলতানদের ভূমিকাও এরূপ হওয়া উচিত। বৃক্ষ মানুষের রক্ত পান করে না, যমীন থেকে খাদ্য শোষণ করে মানুষের উপকার করে। মানুষকে দেয় কিন্তু মানুষের কিছু নেয় না।... মাহমূদ! নিজেকে এরকম ঘন শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ মনে কর। বৃক্ষের গুণাবলী আত্মস্থ কর। বৃক্ষ যেমন মানুষের উপকার করে, মানুষ থেকে উপকৃত হয় না, মানুষ বৃক্ষ কাটে কিন্তু বৃক্ষ মানুষ কাটে না। বৃক্ষ মানুষের বহুবিধ কাজে লাগে। কেউ গাছ চিরে পালঙ বানায়, কোন গাছ হয় অন্ধের হাতের যষ্টি। কোন গাছ রাজা বাদশাহদের সিংহাসন তৈরীতে লাগে....।

"মাহমূদ! যে সুলতান নিজেকে মানুষের শাসক মনে করে, মানুষকে মনে করে তার প্রজা। নিজেকে মনে করে মানুষের অন্নদাতা, বস্ত্রদাতা। বৃক্ষের মত গুণাবলী আত্মস্থ করতে পারে না, তাদের সিংহাসন উল্টে যেতে বেশি সময় লাগে না।

মাহমূদ! দু'টো জিনিস মানুষকে শয়তানে পরিণত করে। একটি সম্পদ অপরটি রাজত্ব বা ক্ষমতা। সেই ব্যক্তিও শয়তানে পরিণত হয়, রাজত্ব বা সম্পদ কোনটি তার নেই কিন্তু এ দু'টোর মোহে সে আচ্ছন্ন। যার মাথায় রাজত্বের মুকুট রাখা হবে, সে যদি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে মাথা নত করতে না পারে তার দ্বারা মানুষের কোন উপকার হয় না। এসব শাসক মানুষের অনুকম্পা ও শ্রদ্ধা পায় না। এসব শাসক মানুষকে মানসিক ও সামাজিক সুখ-স্বস্তি দিতে ব্যর্থ হয়। তারা আল্লাহ্‌র কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধি বলে বিবেচিত হবে। যে শাসকদের ভোগ-বিলাসিতার বিপরীতে গণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, আহাজারি-ফরিয়াদ, কষ্ট-দুর্ভোগের কান্না রয়েছে তাদের এই দুঃখ-দুর্ভোগগুলোই আখেরাতে সাপ-বিচ্ছু হয়ে এসব অত্যাচারী শাসকদের দংশন করবে....।"

খেরকানী আরো বলেন, "মাহমূদ! তুমি আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়েছ, আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করেছেন। একটু চিন্তা করে দেখ, তুমি আল্লাহ্‌র কোনো নবী-রসূল নও। আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতাও নও, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের পেট চিরে স্বর্ণখনি উন্মোচন করে তোমার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করেছেন। এই স্বর্ণ তোমার নয়, সালতানাতের। এ স্বর্ণের মালিক তুমি নও, দেশ ও জনকল্যাণে তা ব্যয় করতে হবে। তুমি যদি ক্ষমতা ও অহমিকায় আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ ও অনুকম্পাকে ভুলে যাও, ভুলে যাও তোমার প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিস্মৃত হও গণমানুষের অধিকার, তাহলে যমীন আবার তার সম্পদ লুকিয়ে

ফেলবে। যা আল্লাহ্ দান করেন তা ছিনিয়েও নিতে পারেন। তাঁর অর্থবহ ইঙ্গিতকে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও।"

স্বীয় পীর ও মুর্শিদ আবুল হাসান খেরকানীর কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে সুলতান মাহমূদ সৈন্যবাহিনীকে সুসংগঠিত করতে মনোনিবেশ করলেন। দেশের শাসন ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য প্রশাসনিক সংস্কার করলেন, তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন আনলেন। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকায় উন্নতি পরিলক্ষিত হল। তবুও সাধারণ মানুষ তার সেনাবাহিনীতে তরুণ, যুবক ছেলেদের ভর্তি করার জন্য উৎসাহে এগিয়ে আসত। তরুণ যুবকরা সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়াকে আভিজাত্যের পরিচায়ক মনে করত।

সরকারি ব্যবস্থাপনা ও নতুনভাবে সৈন্যবাহিনী ঢেলে সাজানোর পর মাহমূদ রাজা জয়পালের গতিবিধি জানার অপেক্ষা করছিলেন। জয়পালের দেশ থেকে কোন সংবাদ পেতে বিলম্ব হওয়ার অর্থ ছিল, জয়পাল হয়ত পরাজয়কে বরণ করে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। মাহমূদের এক সেনাপতি বলল, এই সুযোগে আমাদের উচিত ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া।

"জয়পাল দমে যাওয়ার ব্যক্তি নয়। অবশ্যই সে হামলা করবে।" বললেন সুলতান মাহমূদ। "আমি তার মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাতে চাই যে, ভারত আক্রমণের অভিপ্রায় আমার মোটেও নেই। এটা কি ভালো হবে না, সে তার রাজ্য ছেড়ে এসে আমাদের এলাকায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে? আমি যদি তার অগ্রাভিযানের খবর সময় মত পাই তাহলে আমাদের ইচ্ছে মতো সুবিধাজনক জায়গায় তাকে যুদ্ধ খেলায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতে পারব।"

"এতদিনে তো লাহোর থেকে কোন না কোন খবর পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। আমাদের লোকেরা গ্রেফতার হয়ে যায়নি তো?" বলল সেনাপতি।

"আরো কিছুদিন অপেক্ষা করুন, যদি কোন খবর না আসে আমি এদিক থেকে লোক পাঠাব।" বললেন সুলতান মাহমূদ।

লাহোর থেকে এমরান, নিজাম, কাসেম বলখী, জগমোহন, ঋষী ও জামিলার দল রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। যে রাতে দুঃসাহসী গজনী কমান্ডোরা জয়পালের যুদ্ধ সামগ্রীতে অগ্নিসংযোগ করেছিল সেই রাতেই ঋষীর স্থলে পণ্ডিতেরা অন্য একটি কুমারীকে জোরপূর্বক তুলে টিলার মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল। কিশোরীটি সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ার পর যখন সংজ্ঞা ফিরে পেল তখন সবকিছু সে অনুভব করতে পারছিল। প্রকৃত হিন্দু ঘরানার মেয়ে হওয়ার কারণে সে দেবের চরণে নিজেকে বলিদানে উৎসাহ বোধ করছিল। সে নিজে থেকেই বলছিল, ইন্দ্রা দেবীর চরণে আমাকে বলি দিয়ে দাও....মহারাজা জয়পালের কপালে আমার রক্তের তিলক পরিয়ে দাও...। আমার রক্তের ঝলকানিতে শত্রুদের অন্ধ করে দাও।

এ সত্যি এক তেলেসমাতী কারবার। মেয়েটিকে কেন্দ্র করে তার বয়সী মেয়েরা বৃত্তাকারে অর্ধনগ্ন হয়ে নাচছে আর মেয়েটি বিশেষ এক ধরনের বাজনার তালে তালে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিজে বলি হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কুমারীকে বলিদানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করার পর রাজা জয়পালকে টিলার মন্দিরে নিয়ে গেল পণ্ডিত। সাধু-সন্ন্যাসীরা রাজাকে স্বরস্বতি মূর্তির সামনে নিয়ে বসালো। রাজা সরস্বতীকে নমস্কার করলো। মন্দিরের কুমারীরা রাজার উপর ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে দিল। পণ্ডিতেরা ভজন গাইল। ঐ কুমারী মেয়েটিকে এভাবে সাজিয়ে রাজার সামনে পেশ করা হল যে, মনে হচ্ছিল মেয়েটি একটি পরী। মেয়েটি দু'হাত প্রসারিত করে রাজার উদ্দেশে বলছিল, ইন্দ্রাদেবীর চরণে আমাকে বলি দিয়ে দাও। রাজার কপালে আমার রক্তের তিলক পরিয়ে দাও।

কুমারী পণ্ডিতের জাদুর প্রভাবে মাথা পেতে ধরল। এক পণ্ডিত রাজা জয়পালের কোষ থেকে তরবারি বের করল। নাঙ্গা তরবারি রাজার মাথার উপর দিয়ে বার কয়েক ঘুরালো এবং এক কোপে কুমারীর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। মন্দিরে ঘন্টা ও শাখাধ্বনি বেজে উঠল। সাধু পণ্ডিতেরা ভজন গাইতে শুরু করল। সরস্বতী দেবীর চরণে করজোরে মিনতি জানাতে লাগল। প্রধান পণ্ডিত কুমারীর রক্তে আঙ্গুল চুবিয়ে রাজার কপালে তিলক পরিয়ে দিল। রাজা এই দুর্গম টিলার উপরে মন্দিরের এসব আয়োজন প্রত্যক্ষ করার পর তার চেহারা বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মনে হল যেন রাজা গজনী জয় করে ফেলেছে। সুলতান মাহমূদ তার কাছে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রফুল্ল চিত্তে মন্দির থেকে বের হয়ে রাজা কড়া নির্দেশ জারী করল, এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত সৈন্যকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত কর। রাজার নির্দেশে তার রাজ্যের সকল প্রজার গৃহ উজাড় হয়ে পড়ল। এর আগে হিন্দু প্রজারা রাজার কোষাগারে অকাতরে তাদের গচ্ছিত সম্পদ অর্পণ করেছিল। সেগুলো ভস্মিভূত হওয়ার পর পুনরায় রাজার অভিলাষ পূরণ করতে গিয়ে কৃষক প্রজাদের ঘরে এতটুকু আহারাদি অবশিষ্ট ছিল যা দিয়ে তারা মাত্র এক সপ্তাহ অতিবাহিত করতে পারে। কেননা রাজা ও পণ্ডিতেরা হিন্দু প্রজাদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ, মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা এমনভাবে প্রচার করেছিল যে, প্রজাদের মনে মুসলমানদের প্রতি তীব্র আক্রোশ সৃষ্টি হয়েছিল। সকল হিন্দু প্রজা রাজার আগ্রাসী অভিযানে সাহায্য করাকে ধর্মীয় দায়িত্ব বলে বিশ্বাস করত। অবশ্য ইতিপূর্বে হিন্দু গৃহিনী-মহিলারা তাদের সৌখিন অলঙ্কারাদি রাজার কোষাগারে জমা করেছিল। সেগুলো ভস্মীভূত হওয়ার পর এখন তারা তাদের বাকী সম্পদের সিংহভাগ রাজার কোষাগারে অর্পণ করতে বাধ্য হল। অপরদিকে রাজা জয়পাল অন্যান্য হিন্দু রাজা মহারাজাদের দরবারে ধরনা দিয়ে তার যুদ্ধ-ভাণ্ডারকে

স্ফীত করতে সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা চালাল। সবার কাছে রাজা শপথ করল, এবার সে আর পরাজিত হয়ে ফিরবে না। যে কোন মূল্যে সে গজনীকে পদানত করবেই।

* * *

নিজাম, কাসেম, জগমোহন, ঋষী ও জামিলাকে নিয়ে ইমরানের কাফেলা রাবী নদী পার হয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। ততক্ষণে তারা লাহোর থেকে বহুদূরে। ইমরান পেশাদার গোয়েন্দা, লাহোরের পথঘাট তার নখদর্পণে। প্রচলিত পথ ছেড়ে অজানা পথে কাফেলাকে নিয়ে চলল ইমরান। ঘন এক বনবীথিতে রাত পোহাল তাদের। ঋষী ঘোড়ার উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে নামিয়ে আনল ইমরান। সবাইকে বলল, এখানে আমাদের বিশ্রাম নিতে হবে। সারারাত কারো ঘুমানো সম্ভব হয়নি। ঘোড়াগুলোরও বিশ্রাম দরকার। এদেরকে দানাপানি দিতে হবে। পথ আমাদের অনেক দীর্ঘ। তদুপরি আমাদের যেতে হবে লুকিয়ে ছাপিয়ে। সবাই শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমের অতলে ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর জামিলা ইমরানকে জাগিয়ে একটু দূরে নিয়ে গেল এবং বলল, "তুমি এই হিন্দু মেয়েটার সাথে আমাকেও নিয়ে এসেছ, আমার ভবিষ্যৎ কি হবে বল?"

"এ মুহূর্তে আমার সামনে তোমার ভবিষ্যৎ নয়, গজনী সালতানাতের ভবিষ্যই প্রধান বিষয়।" জবাব দিল ইমরান। "গজনী পৌঁছে তোমাদের ব্যাপারে চিন্তা করব। আশা করি পথিমধ্যে এসব বিষয় তুলে আমার কর্তব্য কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।"

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আবার প্রচণ্ড ভয়ও হচ্ছে—তুমি এখন তোমার দেশের জন্য দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত আছো। অথচ তোমাকে পাওয়ার জন্যই আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি যে অপরাধ করেছিলাম, তোমার নির্দেশ মতোই সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি। কিন্তু এখন আমি দেখছি, ঋষীর প্রতি তুমি ঝুঁকে পড়েছ, তুমি আমার থেকে অনেক দূরে সরে যেতে চাচ্ছ। নিজের জন্যেই তো তুমি ঋষীকে নিয়ে যাচ্ছ!"

"তোমার কি এখনও চিত্তে সুখ আসেনি?" বলল ইমরান। "এখনও কি ঋষী তোমাকে প্রেতাত্মা হয়ে ভয় দেখায়? সেতো এখন সশরীরে তোমার সাথে যাচ্ছে। এখন তো আর তোমার ভয় করার কিছু নেই। অপরাধের বোঝাও নেই তোমার উপর।"

"আমার সাথে এসব তাত্ত্বিক কথাবার্তা বলো না ইমরান।" জামিলা চোখ বন্ধ করে দৈহিক উত্তেজনায় প্রকম্পিত কণ্ঠে বলল, "আমার শরীর বিক্রিত পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে, যদ্দিন এই শরীর আছে ততদিনই জীবন আছে, আছে দাম, আছে মান। আছে তোমার প্রতি মানুষের আগ্রহ।"

“শোন জামিলা!” ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ইমরান। “তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার পথ আর আমার পথ ভিন্ন। তোমার কাছে আজ আমি আসল পরিচয় প্রকাশ করছি। আমি তোমাদের দেশের অধিবাসী নই, আমি গজনী সালতানাতের একজন সৈন্য। ওখানকারই অধিবাসী। আমি গজনী সেনাবাহিনীর এক পদস্থ গোয়েন্দা। আর এরা দু'জন গজনী সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। বিগত যুদ্ধে এরা গ্রেফতার হয়েছে। জয়পালের প্রাসাদে অন্তরীণ হয়েছিল। এদের উদ্ধার করা ছিল আমার দায়িত্ব। আর দৈহিক রূপ-লাবণ্যের কাম-কামনায় জ্বলে পুড়ে মরছ তুমি। আমি এসবকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এই হিন্দু মেয়েটি ও তার ভাই সধর্ম ত্যাগ করেছে, আমি এদেরকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমার কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। শোন জামিলা! তোমার একথা প্রমাণ করতে হবে যে, ইসলাম একটা মর্যাদার ধর্ম। রূপ-রমণের কথাবার্তা এখন বাদ দাও। আমরা এখন শত্রু এলাকা অতিক্রম করছি। মৃত্যু আমাদের তাড়া করছে। নিজের ধর্মের জন্য নিজেকে বিলীন ও কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হও।”

ইমরান আবেগে উদ্বেলিত হয়ে জামিলাকে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে চাচ্ছিল। কিন্তু জামিলা মোটেও ইমরানের কথায় কর্ণপাত করল না। ইমরান কি বোঝাতে চাচ্ছে সেটা মোটেও সে বোঝার চেষ্টা করছে না। দেহ-কামনার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হল জামিলার হৃদয়ে। জামিলার ভাবখানা এমন ছিল যে, ইমরান যা বলছে সেগুলো তার পক্ষে মোটেও বোঝা সম্ভবপর নয়। জামিলার মাথায় শুধুই তার ভূত-ভবিষ্যৎ ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার কাছে রাজা জয়পালের রাজ্য আর গজনীর সুরক্ষা নস্যি। ইমরানকে কব্জা করাই মূল কথা। দীর্ঘদিন থেকে জামিলা ইমরানকে একান্তভাবে কাছে পাওয়ার জন্য ফুটন্ত কড়াইয়ের মতো উত্তপ্ত হয়ে আছে। শরীর মন আর দেহের উগ্র চাহিদাকে জামিলার পক্ষে সামাল দেওয়া মুশকিল। এতকিছুর পরও যখন দেখল, ঋষীর প্রতি ইমরানের ভীষণ আগ্রহ তখন হিংসার আগুন জামিলাকে আরো বেপরোয়া করে তুলল। ইমরানের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সাড়া না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হল জামিলা। তার মধ্যে আবার জন্ম হল বঞ্চিতের জিঘাংসা।

জামিলার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ঋষীর দিকে নিবদ্ধ করল ইমরান। ঋষীর কাছে গিয়ে ক্ষীণ স্বরে ডাকলো, ঋষী! ঋষী! ঋষী চোখ খুলে এদিক ওদিক দেখে ইমরানের দিকে অগ্রসর হল। ইমরানের কাছে পৌঁছে ছোট শিশুর মতো দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরল ঋষী। তার গলায় বুকে নিজের গণ্ডদ্বয় ও কপাল ঘষে আহ্লাদ জানাচ্ছিল সে। ইমরান সস্নেহে ঋষীর মাথা ধরে তার চোখে চোখ রাখল।

অদূরে বসে জামিলা সবই দেখছিল। আর আগ্নেয়গিরির লাভার মতো দাউদাউ করে জ্বলছিল।

ঋষী ইমরানের গলা জড়িয়ে বিস্ময় বিস্ফোরিত নেত্রে ইমরানের কাছে জানতে চাইল, 'তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমরা এখন কোথায়? আমার দাদা কোথায়? দু'টো লোক ওখানে পড়ে রয়েছে, এরা কি জীবিত?" জামিলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ইমরানের গলা ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ঋষী, 'এ মহিলাটি কে? এ তোমার বোন নয়তো? একে কোত্থেকে এনেছ?'

'তুমি সুস্থ হও। সবকিছুই বলব।' বলল ইমরান। ইমরান ঋষীকে ধরে তার কাছেই বসিয়ে দিল এবং বলল, 'তোমাকে আমরা পণ্ডিতের কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছি।' দু'হাতে চোখ ডলে ঋষী বলল, 'হ্যাঁ, কিছুটা মনে পড়ছে। পণ্ডিতরা আমাকে দেবীর চরণে বলি দানের জন্য জোর করে তুলে নিয়েছিল.... । আচ্ছা, ওরা এখন কোথায়? আমি কোথায়? আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না তো?'

'এ মহিলার নাম জামিলা।' বলল ইমরান। এ যদি সাহায্য না করত তাহলে পণ্ডিতরা তোমাকে যে দুর্গম জায়গায় অন্তরীণ করেছিল ওখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না।"

ঋষীকে ইমরান তার অপহরণ হওয়ার ঘটনা বিস্তারিত বলল। ঋষীকে উদ্ধার করতে কিভাবে জামিলা তাকে সহযোগিতা করেছে তাও জানাল। আরো জানাল, জামিলা এক বিত্তশালী বণিকের পালিয়ে আসা স্ত্রী। এছাড়াও ঐ বণিকের আরো দুই স্ত্রী ছিল। তাকে উদ্ধার করতে সহযোগিতা করায় ঋষী জামিলাকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই জামিলার রূপ, সৌন্দর্য ও কমনীয়তা তার মধ্যে জন্ম দিল ঈর্ষা। সে জামিলাকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

ইত্যবসরে নিজাম ও জগমোহন ঘুম থেকে জেগে ঋষীকে খুঁজতে শুরু করল। ঋষী তখন সুস্থ। জাদু ও বিষক্রিয়ার প্রভাব তার মাথায় নেই। টিলার মন্দিরে ঋষীর জীবনে কি ঘটেছিল তার একবিন্দুও মনে নেই ঋষীর।

'বন্ধুগণ!' বলল ইমরান। 'আমাদের সামনে দীর্ঘ সফর এবং বড় ভয়াবহ সেই পথ। সাথে রয়েছে অনেক স্বর্ণমুদ্রা, অলংকারাদি। যে বিজন এলাকা দিয়ে আমরা অতিক্রম করব, না আছে এখানে কোন আহার সংগ্রহের ব্যবস্থা না আছে সুপেয় পানি। সাথে যা আছে এগুলোকে অবলম্বন করেই আমাদেরকে পথ চলতে হবে।'

"তুমি আমাকে বলেছিলে, ঋষীকে উদ্ধার করতে পারলে তুমি আর ফিরে যাবে না।" বলল জগমোহন। "এ জন্য আমি ঘর থেকে অনেক অলংকারাদি নিয়ে এসেছি। সে কাপড়ের একটি থলে কোমর থেকে খুলে ইমরানের সামনে রাখল এবং বলল, আমাদের ঘরে যত ছিল তা ছাড়াও ঋষীর ব্যবহৃত অলংকারাদিও এখানে রয়েছে।"

জামিলাকে ইমরান বলেছিল, ঋষীকে উদ্ধার করতে পারলে সে আর শহরে ফিরবে না। এজন্য জামিলাও বণিক স্বামীর ঘর থেকে যথাসম্ভব নগদ টাকা-পয়সা,

অলংকারাদি সাথে নিয়ে এসেছিল। সফরের রীতি অনুযায়ী ইমরানকেই দলনেতার দায়িত্ব অর্পণ করল নিজাম এবং বলল, 'এইসব সোনা-দানা, টাকা-পয়সা তোমার দায়িত্বে রাখা হল এবং আমরা গজনী পৌঁছা পর্যন্ত তোমার নির্দেশ মতই সবাই চলব।' নিজামের সিদ্ধান্ত সবাই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিল এবং যার কাছে যা ছিল সব ইমরানের কাছে অর্পণ করল। সোনা-দানা ও টাকা-পয়সার পরিমাণ একেবারে কম ছিল না। সবগুলো কোমরে বহন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এজন্য একটা পোটলা বেধে ইমরান টাকা-পয়সা ও সোনা-দানা নিজের কাছে রাখলো। ইমরান সফর সঙ্গী সবাইকে এই বলে সতর্ক করল, 'আমাদের পথ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। শুধু যে এই সোনাদানাই ডাকাতদের আগ্রহের বস্তু তাই নয়, যে দু'টি মেয়ে আমাদের সাথে রয়েছে ডাকাতদের জন্য এরাও খুব লোভনীয়।'

অতএব ডাকাত, ছিনতাইকারী এবং রাজার গোয়েন্দাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাতে সফর করার সিদ্ধান্ত নিল ইমরান এবং দিনের বেলা লুকিয়ে-ছাপিয়ে সম্ভাব্য নিরাপদ জায়গায় বিশ্রামের মনস্থ করল।

বেলা ডুবে গেছে। ইমরানের কাফেলা আবার রওয়ানা করল। ইমরানের পিছনে জামিলা আর জগমোহনের পেছনে ঋষী আরোহণ করল। যেতে যেতে কাসেম তার ঘোড়াটাকে পিছনে নিয়ে গেল। কাসেমের অক্ষমতা ছিল, কাসেম নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানত না। নিজামের অবস্থাও ছিল তাই। কিন্তু ইমরান ছিল ভিন্ন। সে হিন্দুস্তানী ভাষা মাতৃভাষার মতই অনর্গল বলতে পারত। ঋষী, জামিলা ও জগমোহনের সাথেও সে অনর্গল কথা বলতে পারত। কাসেমকে পেছনে আসতে দেখে নিজামও পেছনে চলে গেল। তারা পরস্পর কথাবার্তা শুরু করল। দু'জনের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় একটু গভীর করার লক্ষ্যে তারা ইমরান থেকে একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে চলল।

"আচ্ছা তুমি কি ইমরানকে বিশ্বাস করতে পার? এই দুইটা সুন্দরী মেয়েকে সে কেন নিয়ে যাচ্ছে?" নিজামকে জিজ্ঞেস করল কাসেম। 'তাছাড়া এতগুলো সোনা-দানাও কেন তুমি ওর দায়িত্বে দিয়ে দিলে? তুমি কি জান না টাকা-পয়সা ও সুন্দরী নারী মানুষের ঈমানকে নষ্ট করে দিতে পারে....! টাকা আর নারীর কি যাদুকরী ক্ষমতা......!"

"ইমরান যদি বিশ্বাসযোগ্য না হতো তাহলে আমাদেরকে উদ্ধার না করেই সে এই হিন্দু মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত।" বলল নিজাম। 'দেখলে তো জামিলাকে সে কত কৌশলে ব্যবহার করেছে? যেহেতু এই মেয়েটি স্বামী বঞ্চিতা, এজন্য সুকৌশলে গজনী সালতানাতের পক্ষে তাকে ব্যবহার করেছে এবং তাকেও দিয়েছে স্বামী নির্যাতন থেকে মুক্তি।'

"এই দুই মেয়ের সাথে গজনী সালতানাতের লাভালাভের কি সম্পর্ক?" বলল কাসেম। "এটা ওর ভোগবাদী মানসিকতা। আর এর খরচ বহন করতে হচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে। তুমি যাই বল, ওর উপর আমার আস্থা নেই। তুমি কি ভেবে দেখেছ, জামিলা বিবাহিতা মেয়ে। স্বামী তালাক না দেয়া পর্যন্ত তার সাথে কারো বিবাহ বৈধ হতে পারে না! তুমি দেখো, জামিলাকে ইমরান রক্ষিতা হিসাবে রাখবে আর এই হিন্দু মেয়েটাকে মুসলমান বানিয়ে সে বিয়ে করবে।'

"তোমার কথাবার্তায় অবিশ্বাস নয়, হিংসার গন্ধ পাওয়া যায়।' বলল নিজাম। "দোস্ত! এই মেয়েদের উপর থেকে তোমার দৃষ্টি সরিয়ে নাও। তুমি কেন ভুলে গেলে, বন্দিদশা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে ইমরান আমাদের কতটুকু উপকার করেছে? ইমরান আমাদেরকে মুক্ত না করলে ওই কাফেরের বন্দিশালায় আমাদেরকে মরতে হতো। মুজাহিদ যুদ্ধ ময়দানে শহীদ হওয়ার জন্য জন্ম নেয়। বন্দিশালায় মৃত্যুবরণ করার জন্য নয়। গজনী পৌঁছে আমাদের কর্তব্য হবে আবার সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে হিন্দুস্তানী বেঈমানদের বিরুদ্ধে জেহাদকে বেগবান করা। ইমরান কাকে রক্ষিতা রাখল আর কাকে বিয়ে করল, তাতে আমাদের কি আসে যায়!"

"আমরা সেনাবাহিনীর ঊর্দ্ধতন অফিসার, আর ইমরান একজন সাধারণ গোয়েন্দা। আমাদের অধিকার আছে ইমরানের দোষ-ত্রুটি দেখার"। বলল কাসেম।

"এই ভ্রমণে আমরা ইমরানকে দলনেতা নির্বাচন করেছি"। বলল নিজাম। "সে যদি কোন ভুল করে বা কোন অন্যায় করে তাহলে আমরা তাকে বাধা দিতে পারি। কিন্তু তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। আমাদের এখন লক্ষ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বিবাদে গজনীতে পৌঁছা। সুলতানকে অবহিত করা, রাজা জয়পাল গজনী আক্রমণের জন্য তোড়জোড় করছে।"

"তুমি একেবারেই হাবা"। বলল কাসেম। "এই ব্যাটা আমাদেরকে ধোঁকা দেবে।"

জামিলা ইমরানের পেছনে আরোহণ করে তার কাঁধে হাত রেখে গায়ে গা মিশিয়ে বসেছে। ঘোড়ার ঝাঁকুনির সাথে সাথে বার বার ইমরানের গায়ে আঁছড়ে পড়ছে জামিলা আর আবেগ ও উত্তেজনাকর কথা বলে ইমরানকে তাতিয়ে তুলতে চাচ্ছে। ইমরান অনুভব করল, জামিলার মধ্যে কামনেশা তীব্র হয়ে উঠছে।

"এই হিন্দু মেয়েটিকে তোমার কাছে এত ভাল লাগে কেন?" ইমরানকে জিজ্ঞেস করল জামিলা। 'আচ্ছা বলতো, ও কি আমার চেয়ে বেশী রূপসী?'

'জামিলা! যে কথা আমি তোমাকে বলেছি এর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি তোমাকে বলতে চাই, একজন মুসলিম নারী এবং অমুসলিম নারীর মধ্যে

পার্থক্য থাকা উচিত। এ মুহূর্তে কোন মনোদৈহিক বিনোদনে আমার কোন আকর্ষণ নেই। অবশ্য তুমি সুন্দরী, আগুনের শীষের মতো তোমার শরীর। আমার মতো অসংখ্য যুবকের দ্বীন-ধর্ম তুমি জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পার। আমাকেও চাচ্ছ তুমি তোমার রূপের আগুনে জ্বালাতে। কিন্তু তুমি জান না, বৈষয়িক আকর্ষণ আমি অনেক আগেই নিঃশেষ করে দিয়েছি। আমার সাথীরা আমাকে দলনেতা নির্বাচন করেছে। এই সাথীদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আমার ব্যক্তিগত সুখ, আরাম-আয়েশ আমি উৎসর্গ করে দিয়েছি। দলনেতা একটি ছোট্ট কাফেলার হোক বা রাষ্ট্রের হোক তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, সুখ-আহ্লাদ প্রাধান্য পেতে পারে না। দলনেতার কাছে শত্রু-মিত্রের সংজ্ঞাও ভিন্ন। দলনেতার দৃষ্টি থাকে তার দল ও জাতির স্বার্থের প্রতি। ব্যক্তি স্বার্থ সেখানে একেবারেই গৌণ।"

'উনি একটা পাথরের মূর্তি!' ঝাঁঝাঁল কণ্ঠে বলল জামিলা। 'হিন্দুরা নিজ হাতে মূর্তি বানিয়ে এগুলোকে পূজা করে। এসব মূর্তিদের না আছে কোন জীবন, না আছে কোন অনুভূতি। তুমি কি অমন একটা কিছু!' জামিলার কথায় ইমরান হেসে ফেলল।

এভাবেই এগিয়ে চলল ইমরানের ছোট্ট কাফেলা। জামিলার মধ্যে হতাশাও বাড়তে লাগল। বঞ্চিত জীবনের যন্ত্রণা জামিলার মধ্যে আরোও তীব্রতর হয়ে উঠল। চলন্ত পথে কাসেম ইমরানের কাছ থেকে একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে চলতে লাগল। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ জামিলার ওপর। জামিলা যখন ওর দিকে তাকাত তখন তার চেহারায় ফুটে উঠত খুশীর আভা। এসব নিয়ে ঋষীর মধ্যে কোন ভাবান্তর ছিল না। ঋষী ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত। ভবিষ্যৎ নিয়ে জগমোহনের মনেও উঁকি দেয়নি কোন সংশয়, সন্দেহ। এভাবেই তারা প্রায় অর্ধেক রাস্তা চলে এল। একদিন কাসেম, নিজাম ও জামিলাকে সাক্ষী রেখে ঋষী ও জগমোহনকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান করে নিল ইমরান এবং ঋষীর নাম দিল রাজিয়া ও জগমোহন ধারণ করলো আব্দুল জব্বার নাম।

একদিন ইমরানকে নিজের কাম চরিতার্থের জন্য সরাসরি আহ্বান করল জামিলা। কিন্তু তাতেও ইমরানের মধ্যে কোন ভাবান্তর হলো না। জামিলার আহ্বানে সাড়া দিতে পূর্ববৎ উদাসীন রইল ইমরান। 'তুমি আস্ত একটা পাথর।' কামনায় উদ্বেলিত জামিলা ইমরানের পিঠে থাপ্পর দিয়ে বলল। 'তুমি একটা মাটির পিণ্ড। এমন জানলে কস্মিন কালেও আমি তোমার ফাঁদে পা দিতাম না।'

ইমরানের ছোট্ট কাফেলা পেশোয়ারের পাহাড়ি অঞ্চল অতিক্রম করছে। এই এলাকা সম্বন্ধে ইমরান ছিল অভিজ্ঞ। এখানে কোথায় কি আছে, কোথায় ঘাস পাওয়া যাবে, কোথায় পাওয়া যাবে সুপেয় পানি—এর সবই ইমরানের জানা। এজন্য পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করার আগেই একটা গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয়

পানাহার সামগ্রী সংগ্রহ করল ইমরান এবং বলল, ‘বন্ধুরা! তোমাদেরকে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমরা এখন রাজা জয়পালের সীমানা পেড়িয়ে অনেকটা নিরাপদ এলাকায় এসে পড়েছি। এখানে আমাদের গ্রেপ্তার হওয়ার কোন আশংকা নেই।’

কাফেলা থামিয়ে দিল ইমরান। তখন রাত প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। দিনের প্রচণ্ড গরমে সবাই ক্লান্ত শ্রান্ত। এলাকাটি অত্যন্ত রুক্ষ। গাছপালা নেই, নেই কোন ছায়াতরু। দিনের বেলায় সূর্যতাপে পাহাড়ের শিলায় আগুন জ্বলতে থাকে। প্রতিটি পাথরকে মনে হয় একেকটা অগ্নিপিণ্ড। ঘোড়াগুলোকে এক পাশে বেঁধে রেখে সবাই আরামের জন্য শুয়ে পড়লো। ইমরান একটু দূরে শুইলো। সবাইকে শুইয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ জেগে রইল ইমরান। ততক্ষণে শুক্লপক্ষের চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। গভীর ঘুমে হারিয়ে গেল ইমরান।

কিন্তু কাসেমের চোখে ঘুম নেই। তার বুকের ভিতরে তীব্র যন্ত্রণা। জামিলার রূপ-সৌন্দর্য তাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। সাথীরা সবাই ঘুমে অচেতন। এ সময় দেখল তাকে অতিক্রম করছে একটি ছায়ামূর্তি। ক্ষীণস্বরে মাথা উঁচু করে ডাকল কাসেম, জামিলা! তার ডাকে থেমে গেল ছায়ামূর্তি। আসলেও ছায়াটি ছিল মূর্তমান জামিলা। মুশকিল হলো, কাসেম জামিলার নাম ছাড়া তার সাথে কথা বলার মতো আর কোন কথাই জানে না। জামিলাও বুঝে না কাসেমের ভাষা। ঈশারা ইঙ্গিতে জামিলাকে আহ্বান করল কাসেম। কাসেমের ইঙ্গিতে সাড়া দিল জামিলা। জামিলাকে কাছে বসিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করে ইমরানের প্রতি তার ঘৃণা জামিলাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো। আরো বোঝাতে চেষ্টা করলো, ইমরান সত্যিই ধোঁকাবাজ, প্রতারক। কাসেম জামিলাকে এই অনুভূতি দিতে চেষ্টা করল, সোনাদানা ও টাকা-পয়সা সে ইমরানের হাতে দিয়ে ভুল করেছে।

জামিলাকে দু’হাতে জড়িয়ে নিল কাসেম। কাসেমের সান্নিধ্য পেয়ে জামিলার হতাশ হৃদয়ে আবেগের বান ডাকল। সেও নিজেকে সপে দিল কাসেমের হাতে। কাসেমের স্পর্শ, সোহাগ ও সান্নিধ্য জামিলার হৃদয় থেকে ইমরানের আকর্ষণ মুহূর্তের মধ্যে বিলীন করে দিল। ইমরানের বিপরীতে কাসেমকেই সে মনে করল ভবিষ্যৎ। কাসেম বলখী জামিলাকে জড়িয়ে ধরে একটু দূরে নিয়ে গেল এবং এক জায়গায় বসিয়ে বিড়ালের মত পা টিপে টিপে ইমরানের দিকে এগুলো। ইমরান তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। টাকা-পয়সা ও সোনার থলেটি তার পাশে রাখা। কাসেম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ক্ষিপ্ত পায়ে থলেটি হাতিয়ে নিল এবং দ্রুত জামিলার কাছে ফিরে আসল। সে জামিলাকে থলেটি দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল ঘোড়ার কাছে। ঘোড়াগুলো এদের থেকে কিছুটা দূরে বাঁধা ছিল। দু’টি ঘোড়ায় গদি এঁটে একটিতে সওয়ার হলো কাসেম, জামিলাকে ইশারা করলো অন্যটিতে সওয়ার হতে। কিন্তু জামিলা ইঙ্গিতে বোঝাল, সে সওয়ার হতে পারে না। অগত্যায় নিজের

সামনেই সওয়ার করাল জামিলাকে, আর অন্য ঘোড়াটির লাগাম বেঁধে নিল তার ঘোড়ার জিনের সাথে। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো তারা। কিছুদূর গিয়ে কাসেম এক হাতে জামিলাকে নিজের বুকের সাথে মিলিয়ে নিল এবং ঘোড়াকে এড়ি লাগালো। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ঘোড়া। নিঝুম রাতের নীরবতা ভেঙ্গে অশ্বখুরের আওয়াজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

সবার আগে ইমরানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। গভীর রাতে ঘোড়ার আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। মনে হতে থাকল খুব কাছেই কেউ ঘোড়া ছুটাচ্ছে। ইমরান চোখে মুখে হাত বুলিয়ে প্রথমেই দেখল থলেটি আছে কি-না। কিন্তু নেই। ধারে কাছে তালাশ করে থলেটির কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। ইতোমধ্যে নিজাম ও আব্দুল জব্বারও জেগে উঠল। তারা তাদের ঘোড়ার খোঁজ নিল। কিন্তু দু'টি ঘোড়া নেই। এদিকে জামিলা ও কাসেম লাপাত্তা।

"ওরা বেশীদূর যেতে পারেনি।" ইমরানের উদ্দেশে বলল নিজাম। "চলো এদেরকে আমরা পাকড়াও করব এবং নিজ হাতে এদের কতল করব।"

'না, এর দরকার নেই। যে মেয়েটিকে কাসেম নিয়ে গেছে প্রকৃত পক্ষে ও আমাদের কেউ নয়। সোনা-দানা ও টাকা-পয়সা যা নিয়েছে এগুলোই গজনী সালতানাতের সম্পদ নয়। এদেরকে পাকড়াও করা আমাদের দায়িত্বও নয়। বরং এদের পেছনে দৌড়ানো আমাদের কর্তব্য পরিপন্থী...। নিজাম ভাই! আমি তোমাদেরকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছিলাম এই জন্য যে, হতে পারত রাজা তোমাদের দু'জনকে কজা করার জন্য সুন্দরী কোন ললনা লাগিয়ে দিত। নারী ও টাকা এমনি ভয়ঙ্কর জিনিস, পাথরের মতো কঠিন হৃদয়ের মানুষকেও মোমের মত জ্বালিয়ে গলিয়ে দিতে পারে। এমনটা হলে তোমরা ভুলে যেতে তোমাদের দায়িত্ব, তোমাদের জাতিত্ব, ধর্ম, নীতি, আদর্শ। ভোগ-ঐশ্বর্যের কাছে জলাঞ্জলী দিতে ঈমান, আমল। হিন্দু রাজার ক্রীড়নক হয়ে গজনী সালতানাতের জন্য মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে তোমরা।'

ধীরে ধীরে ঘোড়ার আওয়াজ ইথারে মিলিয়ে গেল। "আমার ঘুম চলে গেছে, চল আমরা অগ্রসর হতে থাকি।" বলল নিজাম।

একটি ঘোড়ার উপর ঋষীকে এবং অন্য গোড়ার উপর জগমোহনকে সওয়ার করে ইমরান ও নিজাম দু'জনে ঘোড়ার লাগাম টেনে হেঁটে চলল। সিদ্ধান্ত নিল, তারা পর্যায়ক্রমে সওয়ার হবে।

"ও হয়তো জামিলাকে জোর করে নিয়ে গেছে।" বলল ঋষী।

"না, জামিলাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়নি। বরঞ্চ বলতে পার, জামিলাই কাসেমকে নিয়ে গেছে। যাই হোক, আপদ চলে গিয়ে ভাল হয়েছে।"

রাত পোহাল। পূর্বাকাশে উঁকি দিল লাল টকটকে সূর্য। ইত্যবসরে জামিলা ও কাসেম অনেক পথ অতিক্রম করেছে। ওরা মরণপণ ঘোড়া ছুটিয়েছে। কাসেম গজনীর সৈন্যদের নির্মিত রাস্তাধরে এগুচ্ছিল। যে রাস্তা গজনী বাহিনী তৈরী করেছিল ভারত আক্রমণের উদ্দেশে। কাসেম যখন জয়পাল বাহিনীর কাছে গ্রেপ্তার হয়েছিল, এ পথ দিয়েই জয়পালের সৈনিকেরা তাদের নিয়ে গিয়েছিল। এই একটাই ছিল মাত্র রাস্তা। যা থেকে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না। বেলা বেড়ে উঠার সাথে সাথে কাসেম অনুভব করল, "আমি অপরাধী, আমি পলাতক, ফেরারী। আমার পেছনে ধাওয়া করছে ইমরান ও নিজাম।" ধরা পড়ার আশঙ্কা ও অপরাধের তাড়না কাসেমকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। সে অভিজ্ঞ সৈনিক ও দীর্ঘ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। যে কোন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি সহ্য করা তার পক্ষে মোটেও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু অপরাধবোধ কাসেমের সহন শক্তিকে ভেঙ্গে খান খান করে দিল। সে অনুভবই করল না যে, ঘোড়াগুলো এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় দৌড়াতে পারবে না। তার সফর ছিল দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে। বারবার বাক নিচ্ছিল পথ। কখনও চড়তে হতো পাহাড়ের উপরে, কখনও নামতে হতো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে। বারবার হোঁচট খেতে হতো পাথরের সাথে। বহু চড়াই উৎড়াই অতিক্রম করে চলতে হচ্ছিল তাকে।

বিরামহীন পথ চলায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল ঘোড়া। যে ঘোড়াটায় কাসেম ও জামিলা উভয়ে আরোহণ করেছিল সেটি ঘেমে নেয়ে গিয়েছিল। হাঁ করে নিশ্বাস ছাড়ছিল। হঠাৎ পাথরে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘোড়া। জামিলা ও কাসেম দু'জন দু'দিকে ছিটকে পড়লো। পেছনের ঘোড়াটি তাল সামলাতে না পেরে কাসেমের গায়ে এসে আছড়ে পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায় চীৎকার দিয়ে উঠল জামিলা। কিন্তু কাসেমের অবস্থা শোচনীয়। কোন মতে নিজেকে টেনে তুলে জামিলার দিকে অগ্রসর হলো এবং জামিলাকে টেনে বসাল কাসেম। সওয়ার ঘোড়াটি কয়েকবার পা ঝাপটা দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। অপর ঘোড়াটির উপর কোন সওয়ারী না থাকায় সেটি অত দুর্বল ছিল না। কাসেম বলখী সেই ঘোড়াটির লাগাম হাতে নিয়ে এদিক ওদিক দেখল, কোথাও ঘাস আছে কি-না। না, যে পর্যন্ত দৃষ্টি যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। আর এ পাহাড়ি এলাকাটি এমন যে শুধুই পাথর। সামান্য দূর্বা ঘাসও কোথাও নেই। পানির তো প্রশ্নই ওঠে না। তখনো ধরা পরার আশঙ্কা কাসেমকে তাড়া করছে। সে মূল রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ভিতরের দিকে চলে গেল। জামিলাকে বগলদাবা করে কোনমতে নিয়ে বসাল একটা পাথরের উপর। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল উভয়ে।

খুব বেশী সময় বিশ্রাম করতে পারেনি কাসেম। অপরাধ তাকে তাড়া করে নিয়ে চলল সামনের দিকে। জামিলাকে নিয়ে আবার সওয়ার হলো ঘোড়ায়। টাকার

থলেটা জামিলা আঁকড়ে থাকল। একহাতে জামিলা আর অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম টেনে খুব জোড়ে তাড়া করল কাসেম।

ইমরান ও নিজাম তাড়া করতে পারে এ আশংকায় কাসেম দীর্ঘ শ্রান্তির পরও পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারেনি। ধরা পড়ার ভয়ে সে মূল পথ ছেড়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দুর্গম এলাকা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছার জন্য আবার ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করল। জামিলা অশ্বারোহণে অভ্যস্ত নয়। এ ধরনের দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতাও তার নেই। জামিলা ইঙ্গিতে কাসেমকে বোঝাল, ক্লান্তিকর বিরামহীন ভ্রমণে তার পশ্চাদদেশ ফুলে গেছে, উরুসন্ধি ছিলে গেছে। সারা শরীর ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে। পেট ধরে ইঙ্গিত করল, তার পক্ষে আর এক মুহূর্ত ঘোড়ায় বসে থাকা সম্ভব নয়।

যে স্বর্ণমুদ্রা ও রূপ সৌন্দর্যের জৌলুসে মুগ্ধ হয়ে কাসেম জামিলাকে নিয়ে কাফেলা ত্যাগ করে পালিয়ে এলো, সেই রূপ আর টাকার আকর্ষণ কাসেমের কাছে ফিকে হয়ে গেছে। কাসেম অনুভব করছে, তারও শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। তবুও মুখে কৃত্রিম শুষ্ক হাসির রেশ টেনে জামিলাকে এক হাতে জড়িয়ে বুকের সাথে মিশিয়ে নিল। কাসেম অনুভব করল, জামিলার শরীরের স্পর্শে আর আগের মত পুলক নেই। জামিলা নিষ্প্রাণ দেহের মতো। জামিলা কাসেমের আহ্লাদে শরীরটা এলিয়ে দিল কাসেমের গায়ে। জামিলার গণ্ডদেশে কাসেম ঠোঁট স্পর্শ করল, তার ঘর্মাক্ত শরীরের সবটা ভার কাসেমের উপর ছেড়ে দিল। এলো চুল কাসেমের গলায় জড়িয়ে গেল। জামিলা তার ঘাড়, গলা কাসেমের গলায় হেলিয়ে দু'হাতে উল্টোভাবে ওর গলা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ঘর্মাক্ত জামিলার শরীরটা কাসেমের কাছে দুর্গন্ধময় আবর্জনার মতো মনে হলো। আর জামিলার হেলিয়ে দেয়া শরীরটা কাসেমের কাছে বিরাট বোঝা অনুভূত হতে থাকল। কিছুক্ষণ পরেই কাসেম জামিলাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। প্রচণ্ড খরতাপ ও পাহাড়ের অগ্নি বিচ্ছুরণের কারণে ঘামে উভয়ের কাপড় ভিজে শরীরের সাথে লেপটে গেছে।

কাসেমের শরীর অবশ হয়ে আসছিল। দীর্ঘ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক হিসেবে কষ্টকর অশ্বারোহণ তার পক্ষে এতোটা অসহনীয় ছিল না কিন্তু এই পলায়নে জিহাদের ময়দানের যে আত্মশক্তি থাকে তা নেই। যে জামিলা ছিল তার পালানোর প্রেরণা সেই জামিলার প্রতি ভালবাসার পরিবর্তে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হলো। নিজের প্রতিও ঘৃণা জন্মাল।

কাসেম অনুভব করল, এ ঘোড়াটিরও দম ফুরিয়ে আসছে। জিহ্বা বের করে দিয়েছে ঘোড়া। ঘন ঘন সশব্দে শ্বাস নিচ্ছে, দৌড়ের গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। বারবার হোঁচট খাচ্ছে। যে দু'টি ঘোড়া নিয়ে কাসেম পালিয়ে এসেছে, এগুলো

সেনাবাহিনীর ঘোড়া নয়। সেনাবাহিনীর ঘোড়া দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিতে এবং পানাহার না করেও অবিরাম পাহাড় পর্বত অতিক্রমে অভ্যস্ত থাকে। এগুলো ভাড়াটে ঘোড়া। যেগুলো সাধারণত বেসামরিক লোকেরা এখানে ওখানে যাওয়ার জন্যে ভাড়ায় নিয়ে থাকে। ইমরানের কথা মতো জগমোহন এগুলোকে পাশের গ্রাম থেকে ক'জন মেহমান আনা-নেয়ার কথা বলে ভাড়া করেছিল। এগুলো দুর্গম দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে অভ্যস্ত নয়। তাই অবিরাম দানাপানি ও বিশ্রাম ছাড়া পাহাড়ী এলাকায় দৌড়ে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল ঘোড়া।

ইমরানের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য কাসেম আরো দুর্গম পথে পা বাড়াল। তালাশ করতে লাগল পাহাড়ের কোন গিরিপথ। তখন সূর্য মাথার উপরে। পাহাড়ের পাথরগুলো যেন খড়তাপে জ্বলছে। প্রচণ্ড তাপ বিকিরণ করছে পাহাড়। ঘোড়া এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, পাহাড়ের উঁচু নীচু বেয়ে আর এক কদম চলতে পারছে না। অগত্যা কাসেম ঘোড়া থেকে নামল। জামিলাকেও পাঁজাকোলা করে ঘোড়া থেকে নীচে নামাল। উভয়ে হাঁটতে থাকল হাত ধরাধরি করে। একটু হেঁটেই জামিলা ইশারা ইঙ্গিতে ঠোঁটে আঙ্গুল ধরে বুঝাল, পিপাসায় তার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে, তার পক্ষে আর এক কদম হাঁটা সম্ভব নয়। কাষ্ঠ হাসি হেসে কাসেম জামিলাকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার নিজেরও যে কষ্টে বুক শুকিয়ে আসছে। শরীরটা নিজের কাছেই ভারী মনে হচ্ছে কাসেমের। ঘোড়াটা আর এগুতে পারছে না। পা হেঁচড়ে চলছে। পাহাড়ের ঢালে একটু ছায়া পড়েছে। সেখানটায় বসে পড়ল কাসেম। জামিলা কাসেমের শরীরের উপর ধপাস করে পড়ে যাওয়ার মতো করে বসে পড়লো। স্বর্ণ মুদ্রার থলেটি জামিলা এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল যে, এটি ময়লার থলে মাত্র। ঘোড়াটি হাঁপাতে হাঁপাতে এদিক ওদিক করছিল।

আবার জামিলা কাসেমকে বোঝাল, পিপাসায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কাসেম তাকে কিছুটা বিতৃষ্ণামাখা ভাব নিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল, কষ্ট হলেও কিছু করার নেই। এখানে কোথাও পানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। জামিলা তাকে ইঙ্গিত করল এদিক ওদিক খুঁজে দেখতে। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটা কোন মতে টেনে তুলে কাসেম পানি তালাশে বেরিয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে হতাশ হয়ে ফিরে আসল এবং জামিলার কাছে এসে অনিমেষ নেত্রে নিষ্পলক করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার অসহায়ত্ব তাকে বুঝাতে চাইল।

কাসেম যতটা ভয় করছিল ইমরানকে, তার চেয়েও বেশী নির্বিকার ছিল ইমরান কাসেম ও জামিলার ব্যাপারে। ওদের পিছু ধাওয়া করার বিন্দুমাত্র আগ্রহও ইমরানের ছিল না। কাসেম ও জামিলা হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই ইমরানের মাথা থেকে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল তারা।

ইমরান ও নিজাম আব্দুল জব্বার ওরফে জগমোহন ও রাজিয়ায় রূপান্তরিত ঋষীকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছিল। রোদের তাপ বেড়ে যাওয়ায় তারা একটি ছায়াপড়া ঢালে এসে থামল। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা সেই ছায়ায় বিশ্রাম করল।

বেলা ডুবে গেল। ইমরান সাথীদের নিয়ে শুকনো খাবার খেয়ে সংগৃহীত পানি থেকে সবাইকে অল্প অল্প করে পান করতে বলল। যাতে বাকী পথ অতিক্রম করতে কোন অসুবিধার মুখোমুখি না হতে হয়। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলে মৃদু মন্দা বাতাসে পাহাড়ের পাথর কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। ইমরান সাথীদের নিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করল।

"আমরা প্রায় এসে গেছি। কিন্তু বাকী পথ খুবই কঠিন। আমাদের ঘোড়াগুলো খুবই ক্লান্ত। এদের দৌড়ানো সম্ভব নয়। পানাহার ছাড়া বিরামহীন দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ায় এগুলোর শক্তি প্রায় নিঃশেষ। তাছাড়া এ এলাকাটি খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করার মতোও নয়। পথ খুব উঁচু নীচু আর পাথরগুলো ধারালো। খুব সতর্ক পায়ে চলতে হবে। অন্যথায় পড়ে গিয়ে পা ভাঙ্গার আশংকা রয়েছে। এখন আমাদের মূল লক্ষ্য গজনী পৌঁছা। পথে কোন তাজাদম ঘোড়া পেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে সুলতানকে সংবাদ দেয়া যেতো। রাস্তায় কোন সওয়ারী পেলে ওকে হত্যা করে হলেও ঘোড়া ছিনিয়ে নিতাম। এ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে প্রয়োজন একটি তাজাদম ঘোড়া।"

"ইমরান! তোমরা না বল ইসলাম আল্লাহ্‌র ধর্ম? আল্লাহকে বল না ঘোড়াকে পানি পান করাতে?" মুচকি হেসে বলল ঋষী।

"বলার দরকার নেই। আল্লাহ্‌ সবকিছুই দেখেন।" প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলল ইমরান। "দেখবে এ ঘোড়া পিপাসার জন্যে মরবে না। তুমি বুঝতে পারোনি, আল্লাহর রহম না হলে এ পথ নিরাপদে আমরা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারতাম না। রাজা জয়পাল কাসেম ও নিজামকে পাকড়াও করার জন্যে সারা দেশ ব্যাপী লোক ছড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু তাদের ফাঁকি দিয়ে আমরা চলে আসতে সক্ষম হয়েছি। এটা আল্লাহর বিরাট বড় রহমত। ঋষী! এখন তোমাকে আমার প্রকৃত পরিচয় দিচ্ছি। তোমরা জানতে, আমি মুলতানের অধিবাসী। আসলে আমি মুলতানের অধিবাসী নই, গজনীর বাসিন্দা। গজনী সুলতানের নিয়োগকৃত গোয়েন্দা কর্মকর্তা আমি। আর আমার দুই সাথী গজনী সেনাবাহিনীর অফিসার। বিগত যুদ্ধে এরা রাজা জয়পালের বাহিনীর কাছে গ্রেফতার হয়েছিল। আমি বন্দিদশা থেকে তাদের মুক্ত করে এনেছি এবং তোমাকেও পণ্ডিতদের আখড়া থেকে উদ্ধার করেছি। উভয় কাজ করেছি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে। আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে প্রত্যেক কাজে মদদ করেছেন। আর জামিলা ও কাসেম জৈবিক তাড়নায় অসৎ উদ্দেশ্যে সবার সোনাদানা নিয়ে পালিয়েছে। দেখবে, ওদের পরিণতি হবে ভয়াবহ। আমরা

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করেছি। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেনই। সবার যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা থাকে তবে পাথর চিড়েও পানি বের হওয়া কঠিন কিছু নয়।"

বাস্তবেও পাথরের মধ্যেই পানি পেয়েছিল ইমরানের কাফেলা। তখন প্রায় রাতের দ্বিপ্রহর। পাহাড়ের গায়ে ঝিকমিক করছে চাঁদের আলো। শরীর হেলিয়ে চলছিল ঘোড়া দু'টো। একটি উপত্যকায় তারা এসে পৌঁছাল। হঠাৎ থেমে গেল ঘোড়া দু'টো। লাগাম টেনেও ঘোড়া দু'টোকে নাড়াতে পারল না ইমরান। ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখল, উভয়টি জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট চাটছে আর উপত্যকার সমভূমির দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু করে ঘাড় হেলাচ্ছে। লাগাম ছেড়ে দিল ইমরান। ছাড়া পেয়েই ঘোড়া দু'টো সমভূমির দিকে যেতে লাগল।

ইমরান ঋষীকে বলল, ঋষী! তুমি নেমে পড়। ঋষী নামতে পারছিল না। ইমরান এগিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিলে ঋষী তার কোলে ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়ল। অপর ঘোড়ায় সওয়ার ছিল নিজাম, সেও নেমে পড়ল। ভারমুক্ত হয়ে ময়দানের দিকে দৌড়ে পালাল ঘোড়া দু'টো। ইমরান বলল, আহ্! বেচারা পানির গন্ধ পেয়েছে। আমাদের মশকটা দাও। এদিকে কোথাও পানি আছে। ঘোড়ার সাথে নিজাম আর জগমোহনও দৌড়াতে লাগল। ইমরান ঋষীকে নিয়ে অনুসরণ করল তাদের। দু'টি পাহাড়ের ঢালের নীচুতে গিয়ে থেমে গেল ঘোড়া। মুখ নীচু করে দীর্ঘশ্বাসে পানিপান করতে লাগল। নিজাম ও জগমোহনও ততক্ষণে ঘোড়ার কাছে চলে গেছে। জগমোহন ইমরানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, হায় ভগবান! পানি! ইমরান তার ভগবান ডাক শুনে দূর থেকে বলল, ভগবান নয় 'আল্লাহ্' বল। আল্লাহ্ তোমাকে পাহাড়ের মধ্যে পানির সন্ধান দিয়েছেন, ভগবান পানি দিতে পারে না। সে ঋষীর দিকে তীর্যক দৃষ্টি হেনে বলল, 'দেখলে রাজিয়া। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে পাহাড়েও পানি দিতে পারেন।" কিছুটা লজ্জিত হলো ঋষী। ইমরানের আল্লাহ্ ভরসা ও দৃঢ়তার দরুন তার প্রতি সশ্রদ্ধভক্তিতে গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগল—সে যেন সত্যিকার পথের দিশারী এবং সফল মানুষকেই পেয়েছে।

দূর থেকেই ইমরান দেখতে পেল পানি। চাঁদের আলো পানিতে পড়ে ঝকমক করছে। তৃষ্ণার্ত ঘোড়া পানি পান করে ঘাস খেতে শুরু করল। অথচ গোটা এলাকায় কোথাও ঘাস নেই। শুষ্ক পাথরে ঘাস জন্মাবে কি করে! কিন্তু এখানে পানি থাকায় আশপাশে বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে ঘাস। ঘোড়া দু'টো হামলে পড়ল ঘাসের ওপর। আঁজলা ভরে পানি পান করল সবাই। শীতল পানি। তীব্র তৃষ্ণা আর গরমের মধ্যে এই ঠাণ্ডা পানিকে মনে হলো জীবনের সবচেয়ে অমৃত সুধা। সবাই নবপ্রাণ ফিরে পেল যেন। ঘোড়া দু'টোকে ঘাস খাওয়ার অবকাশ দিতে ইমরান একটি বড় পাথরের উপর বসে পড়ল সবাইকে নিয়ে।

কাসেম বলখী ও জামিলা পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে গজনী পৌঁছার জন্যে আবারো রওয়ানা হল। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ মনে গজনী পৌঁছেই বা কি করবে এ চিন্তা কাসেমকে আরো বিপর্যস্ত করে তুলছিল। দিকভ্রান্তের মত তারা আধা দিন হেঁটেও একই জায়গায় বৃত্তাকারে ঘুরল। গজনীর দিকে মোটেও অগ্রসর হতে পারল না। এলাকাটি ছিল খুবই জটিল। পাহাড় আর ছোট ছোট টিলায় ভরা। সুস্থ মস্তিষ্কের লোক ছাড়া পরিচিত পথ ছেড়ে লক্ষ্য স্থির করাও কঠিন। কাসেমের দেহমন অতটুকু স্থির ছিল না যে, সে সঠিক পথের দিক নির্ণয় করতে পারে। ঘোড়া আর চলতে পারে না। জামিলা ও কাসেম উভয়ের অবস্থাও সঙ্গীন। দীর্ঘক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। কতক্ষণ ঘোড়া ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল সেদিকেও খেয়াল নেই কারো। সম্বিত ফিরে এলে কাসেম ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, জামিলাও পড়ে যাওয়ার মতো করে গড়িয়ে পড়ল ঘোড়া থেকে।

ক্লান্ত অবসন্ন কাসেমের দু'চোখ বুজে এলো ঘুমে। তাকাতেই পারছিল না। এক পা নড়ার শক্তিও নেই দেহে। একটি চওড়া পাথরে পা টানটান করে শুয়ে পড়ল কাসেম। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাসেমের বুকটা কাঠ হয়ে গেছে। জামিলা ও ঘোড়ার দিকে তাকানোর ইচ্ছে হলো না কাসেমের। জামিলা এসে কাসেমের গায়ের উপর ঠেস দিয়ে খানিক্ষণ বসল। এরপর কাসেমের বুকের উপর মাথা রেখে ওকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কাসেম দু'হাতে জড়িয়ে নিল জামিলাকে। জামিলাও নিজেকে সোপর্দ করে দিল কাসেমের বুকে। অবসন্ন কাসেম জামিলার সংস্পর্শে অনুভব করল উন্মাদনা। মাথা তুলে জামিলাকে ইঙ্গিতে বুঝাল, পাহাড়ের ওদিকে একটু আড়াল মতো জায়গার দিকে চলো। জামিলাই উঠে ওকে টেনে তুলল। দু'জন হাত ধরাধরি করে একটি ঝোপের আড়ালে পাহাড়ের গর্তের মতো জায়গায় গিয়ে জীবনের শেষ সাধ মিটাতে প্রবৃত্ত হল। কাসেম অনুভব করল, যে জীবন থেকে সে ফেরার হয়েছে সেই জীবন আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের চিন্তা ও গন্তব্যে পৌঁছার কথা ভুলে গেল তারা। দৈহিক কামনার আগুন জ্বালিয়ে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ ঘুম শেষে কাসেম যখন চোখ মেলল তখন রাত শেষে বেলা উঠে গেছে। হৎচকিয়ে উঠল কাসেম। নিজেদেরকে এভাবে পাহাড়ের কোলে অরক্ষিত অবস্থায় দেখে ঘাবড়ে গেল। দাঁড়িয়ে জায়গাটা পরখ করে দেখল, গতকাল সন্ধ্যায় তারা যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। রাতের অধিকাংশ সময় চলেও অগ্রসর হতে পারেনি মোটেও। একই জায়গা বৃত্তাকারে ঘুরেছে।

জামিলাকে ডেকে তুলল কাসেম। পরস্পরের প্রতি এরা তাকাতেও পারছিল না। আবার যাত্রা শুরু করতে চাইল কাসেম। কিন্তু ঘোড়াটি আর দেখতে পেল না। কাসেম ভাবল, ইমরান ও নিজাম হয়তো ওদের এখানে দেখে ঘোড়াটি নিয়ে

গেছে। আর ওদের রেখে গেছে যাতে ক্ষুৎ পিপাসায় ওরা মরুপাহাড়ে ঘুরে ঘুরে মৃত্যুবরণ করে।

ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত ঘোড়া খাবারের সন্ধানে হারিয়ে গেল। বহু খোঁজাখুঁজি করেও ঘোড়ার কোন চিহ্নও পেল না। হতাশ হয়ে ফিরে এলো জামিলার কাছে। ভীত শংকিত কাসেম জামিলাকে টেনে তুলে দৌড়াতে লাগল।

কিছুক্ষণ পাথুরে উঁচুনীচু পথে দৌড়ে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলল জামিলা। সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কাসেম তাকে টেনে তুলে কাঁধে নিয়ে আবার দৌড়াতে লাগল। সোনা-মুদ্রার থলিটাও হাতে নিল। কাসেম ভাবল, ধারে কাছেই হয়তো রয়েছে ইমরান ও নিজাম। ওদের দুরবস্থা দেখলে হয়তো সোনা ও মুদ্রার থলিটা ছিনিয়ে নেবে, জামিলাকেও নিয়ে যাবে তারা। বেশীক্ষণ জামিলাকে কাঁধে নিয়ে দৌড়াতে পারল না। দীর্ঘ পথের ক্লান্তি ও ক্ষুৎ-পিপাসায় এমনিতেই শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। তদুপরি গত রাতের পাপ ও পালানোর অপরাধবোধ কাসেমের সামনে প্রেতাত্মা হয়ে দেখা দিল।

ক্লান্ত কাসেম আর জামিলাকে বহন করে অগ্রসর হতে পারল না। চোখে সর্ষেফুলের মতো চতুর্দিকে অন্ধকার ধোঁয়াটে মনে হলো। মাথা চক্কর দিয়ে উঠল কাসেমের। কাঁধের বোঝার মতো জামিলাকে ছেড়ে দিল কাসেম। জমদূত যেন দাঁত বের করে নাচতে লাগল কাসেমের সামনে। জামিলাকে পরম মমতায় জড়িয়ে নিল বুকে। জামিলার শরীর অসাড় হয়ে গেল। জামিলা চেতনা হারিয়ে ফেলল। স্বর্ণমুদ্রার থলেটা হাত থেকে পড়ে গেল।

খানিক্ষণপর জামিলার হুঁশ ফিরতে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলো কাসেম। প্রাণ ফিরে পেল সে। দু'হাতে বাজু ধরে জামিলাকে বসাল কাসেম। কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল।

আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠল কাসেম। স্বগতোক্তি করতে শুরু করল সে ঃ

"তুমি আমার ভাষা বুঝবে না জামিলা! আমরা গজনীর পথ থেকে ফেরার হইনি। আল্লাহ্‌র পথ থেকে পালিয়ে এসেছি। আল্লাহ্‌র পথ থেকে পালানোদের পরিণতি এটাই অবশ্যম্ভাবী। আমি ছিলাম অভিজ্ঞ সৈনিক। জীবনে বহুবার প্রচণ্ড তুষারপাত, আর লুহাওয়ায় মরু পাহাড়ে দিনের পর দিন বিরামহীন যুদ্ধ করেছি। দীর্ঘ সময় অনাহার, অনিদ্রা, ক্ষুধা-পিপাসায় কাটিয়েছি। সাথীদের অনেকেই শাহাদাৎ বরণ করেছে, আহত হয়েছে। হাত পা হারিয়েছে, নিজেও যখম হয়েছি, কিন্তু ধৈর্যচ্যুত হইনি, আজকের মতো সাহস হারাইনি, এমন অসহায় বোধ করিনি। আমার শরীরের রক্ত নিঃশেষ হয়ে গেলেও এমন বলহীন হওয়ার কথা নয়। এখন আমি জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। জানো, এর কারণ কি?"....উদ্বেলিত কাসেম জামিলাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'জান?' কিন্তু জামিলা তার কোন কথাই বুঝেনি।

ফ্যালফ্যাল করে হাঁ করে শুধু তাকিয়ে রইল কাসেমের দিকে। কাসেমের ভাষা না বুঝলেও জামিলা অতটুকু ঠিকই বুঝল, যে শক্ত সামর্থবান যুবককে সে দেহের কামনা পূরণের অপরিমেয় আধার মনে করেছিল সেই যৌবনের ঝর্ণা এখন শুকিয়ে গেছে, প্রেমের উত্তাপ নিভে গেছে। আবারো বলতে শুরু করল কাসেম ঃ

"যুদ্ধ ময়দানে আমাদের দেহ নয়, আমাদের আত্মা লড়াই করতো। আমরা যুদ্ধ করতাম জাগতিক কোন লোভ-লালসার জন্যে নয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। আর এখানে আমরা পালিয়েছি দেহের কামনা আর মনের বাসনা পূরণে। আমরা আদর্শবিচ্যুত অপরাধী। তাই মাত্র দু'দিনের বৈরী পরিস্থিতিতে আমি প্রাণশক্তি খুইয়ে বসেছি। নিজের শরীরটাই এখন আমার কাছে ভারী মনে হচ্ছে। তোমার রূপের জৌলুস ম্লান হয়ে গেছে, তোমাকে মনে হচ্ছে দুর্গন্ধময় একটা পঁচা মরদেহ।"

"জামিলা! আমরা অপরাধী। পাপী। পাপীর কোন ঠিকানা নেই। দুনিয়াতে পাপীরা জীবনকে পাপাচারে ভোগ করে আর পরকালে আগুনে পুড়ে ভোগের প্রায়শ্চিত্ত করে।"

"জামিলা! আমরা পথচ্যুত হয়েছি। আমাদের সাথীরা সত্যপথের উপর রয়েছে। ওই হিন্দু মেয়ে ও তার ভাই সত্যের ঠিকানা পেয়েছে। মাটির মূর্তির পূজা ছেড়ে তারা আল্লাহ্‌র পথের দিশা পেয়েছে। ওরা ঠিক তাদের গন্তব্যে পৌঁছবে, কিন্তু আমরা ভ্রষ্টতার শিকার। আমাদেরকে এই বিজনপ্রান্তরেই মরতে হবে।"

কাসেম বেদিশা হয়ে পড়েছিল। জীবনের করুণ পরিণতি আর অতীতের সুকীর্তি তাকে এতই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল যে, তার আওয়াজ চড়ে গেল। জামিলা ভড়কে গেল কাসেমের উন্মাদনা দেখে। জামিলা হাত দিয়ে কাসেমের মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করল। বাকরুদ্ধ হয়ে কাসেম হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল। জামিলাও জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা খুইয়ে ফেলেছে। তবুও কাসেমকে সান্ত্বনা দিতে নিজের ভাষাতেই বলতে শুরু করল ঃ

"কাসেম! স্থির হও। এখনও আমরা চেষ্টা করলে বাঁচতে পারব। তোমাকে সাহায্য করার সামর্থ আছে আমার। যে কোন রাজ্যে আমরা দু'জন স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারব। প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আমাদের হাতে রয়েছে। তুমি নিরাশ হয়ো না। আমার দিকে তাকাও। উঠ।"

"আমি জানি না তুমি কি বলছো জামিলা! আমি কি বলি তাও বুঝতে পার না তুমি।" নিজের মত করে বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল কাসেম। জামিলাকে হাতে ধরে টেনে তুলে বলল, "মৃত্যু ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প নেই। এসো, মরার জন্য আরো ভাল কোন জায়গা পাওয়া যায় কি-না দেখি?"

ইমরানের কাফেলা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সমতল ভূমিতে চলে এসেছিল। পথিমধ্যে তারা আরো এক জায়গায় পানির সন্ধান পেয়েছিল। তাদের কাফেলার গতি ছিল মন্থর। কেননা দু'জনকে পায়দল চলতে হতো। হঠাৎ একটি ঘোড়া দেখতে পেল নিজাম। ঘোড়ার গায়ে গদি আঁটা। কিন্তু আশেপাশে কোন আরোহীকে দেখা গেল না।

"ইমরানকে ডেকে বলল নিজাম, ইমরান! তুমি বলেছিলে কোন ঘোড়া পাওয়া গেলে আরোহীকে হত্যা করে হলেও ঘোড়া ছিনিয়ে নেবে। ওই দেখ! একটি ঘোড়া দেখা যাচ্ছে।"

নিজামের ইঙ্গিতে মরুভূমির দিকে তাকাল ইমরান। গদি আঁটানো একটি ঘোড়া আপন মনে ঘাস খাচ্ছে।

"আমি দৃষ্টভ্রম না হলে বলতে পারি ঘোড়াটি আমাদেরই।" বলল ইমরান।

তারা একটু এগিয়ে দেখল, সত্যি ঘোড়াটি তাদেরই। যে দু'টো ঘোড়া নিয়ে কাসেম পালিয়েছিল এটি সে দু'টোর একটি। কিন্তু ধারে-কাছে কোথাও মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল না।

ইমরান ও নিজাম তরবারী কোষমুক্ত করে নিল। কারণ হঠাৎ কোন আড়াল থেকে তাদের উপর কাসেমের আক্রমণ করার আশংকা রয়েছে। কিন্তু আশে পাশে বহু খোঁজাখুঁজি করেও জামিলা ও কাসেমের দেখা পাওয়া গেল না। খুঁজে না পেয়ে ইমরান ও নিজাম কাসেমকে ডাকতে শুরু করল।

"কাসেম! আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো। অতীতের সবকিছু আমরা ভুলে যাবো। তোমাকে বন্ধুর মতোই বরণ করে নেবো। কাসেম লুকিয়ে থেকো না, আমাদের সাথে চলে এসো!"

বহু ডাকাডাকির পরও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

"ইমরান! ওদিকে দেখ। শকুন উড়ছে।" বলল নিজাম।

বিস্তীর্ণ মাঠের কোথাও শকুনের ঝাঁক উড়তে দেখার মানে ওখানে কোথাও মৃতের অস্তিত্ব রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহে শকুনের আক্রমণ বহুবার দেখেছে নিজাম। ইমরানেরও রয়েছে এ অভিজ্ঞতা। কাফেলাকে দেখে ঘোড়াটি মুখ উপরে তুলে হ্রেষারব করল। কিন্তু পালাতে চেষ্টা করল না। নিজাম ধীর পায়ে এগিয়ে ঘোড়ার বাগ হাতে নিল। অমনি ইমরান এক লাফে সওয়ার হলো ঘোড়ায়। নিজামও তার পিছনে চড়ে বসল। ঘোড়াটি বেশ ফুরফুরে। বোঝা যায় পর্যাপ্ত ঘাস ও পানি খেয়েছে সে। হয়তো বিশ্রামের কাজটিও সেরে নিয়েছে ইতিমধ্যে। তারা দ্রুত অগ্রসর হল শকুনের পালের দিকে। শকুনেরা কি যেন নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে।

কাছে গিয়ে ইমরান ও নিজাম কয়েকটি ঢিল ছুঁড়ে দিল শকুনের দিকে। ঢিল খেয়ে দূরে সরে গেল শকুনেরা। কাছে গিয়ে দেখল, দু'টি লাশ অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে। মরদেহ দু'টি আর কারো নয় কাসেম ও জামিলার। শকুন দল এরই মধ্যে ওদের পেট ফেড়ে নাড়ীভুঁড়ি বের করে ফেলেছে। স্বর্ণ ও মুদ্রার থলেটি কাসেমের মুষ্টিবদ্ধ। ইমরান মুষ্টি খুলে থলেটি ছাড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই মুষ্টি খুলতে পারছিল না ইমরান। খুব বেশী আগে মরেনি এরা। শরীর এখনও তাজা। গা থেকে কোন দুর্গন্ধও ছড়ায়নি।

নিজাম ইমরানের উদ্দেশে বলল, "ইমরান! রেখে দাও ওসব। এগুলো ওদের হাতেই থাক। এই সোনা আর দেহই তো এদের মৃত্যু ডেকে এনেছে। এসব ওদের কাছে থাকুক। আমাদের এ দিয়ে দরকার নেই। গজনী সালতানাতের সম্পদ নয় এগুলো। এগুলো না নিলেও আমাদের অপরাধ হবে না। হতভাগাদের আত্মা হয়তো এতে কিছুটা সান্ত্বনা পাবে। এসো। আমরা চলে যাই।" একটা দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে করুণ দৃষ্টিতে একবার উভয়কে দেখে চলে এলো ইমরান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিরামহীন পলায়নে ক্ষুধা, পিপাসায় এদের মৃত্যু হয়েছে। যদি ডাকাতের আক্রমণে মরত তাহলে কাসেম অক্ষত থাকতো না, জামিলাকেও ডাকাতেরা রেখে যেত না। তাছাড়া স্বর্ণ ও মুদ্রার থলেটি এদের কাছে পাওয়া যেত না।" বলল ইমরান।

"আহ্! কি দুর্ভাগ্য এদের। আর একটু অগ্রসর হলেই পানি পেয়ে যেত এরা। এদের বাঁধনমুক্ত হয়ে ঘোড়া পানি ও ঘাসের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু এদের ভাগ্যে পানি জুটেনি। বন্ধুরা!.....এদের থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। এতো বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রাও এদের জীবন রক্ষা করতে পারল না। বরঞ্চ অনেক সময় টাকা ও সোনা-গয়না মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়।" ঋষীকে ইঙ্গিত করে বলল ইমরান।

"দেখো রাজিয়া! রূপের পরিণতি দেখে নাও। রূপ সৌন্দর্যের বড় গর্ব ছিল জামিলার। সে তার রূপের জালে আমাকেও বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু জামিলার মায়াজালে ধরা দিল কাসেম। আর এই রূপ আর সোনা দানাই কাল হলো ওদের।"

করুণ এ দৃশ্য ও ইমরানের কথায় অশ্রুসজল হয়ে উঠল রাজিয়া।

ওদের করুণ পরিণতি পিছনে ফেলে ইমরানের কাফেলা রওয়ানা হল গজনীর দিকে। এখন তাদের একজন সওয়ার হলো কাসেমের ঘোড়ায়।

সুলতান মাহমুদের কাছে যখন সংবাদ গেল যে, একজন মহিলাসহ লাহোর থেকে তিনজন লোক এসেছে। তারা সুলতানের সাথে দেখা করতে চায়। সুলতান হাতের কাজ রেখে তাদের ডেকে পাঠালেন। ইমরান ও নিজাম সুলতানকে সালাম দিয়ে মহলে ঢুকল। রাজিয়া ও আব্দুল জব্বারের কোন প্রয়োজন ছিল না, তাই তারা বাইরে অবস্থান করছিল।

ইমরান বিস্তারিত রিপোর্ট দিল। বাটাণ্ডার গোয়েন্দাদের তৎপরতা এবং রাজা জয়পালের সব যুদ্ধপোকরণ পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাও সবিস্তারে জানাল। সে কথাও ব্যক্ত করল, কিভাবে নিজাম ও কাসেমকে রাজার বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে এনেছে এবং কিভাবে হিন্দু মেয়েটিকে উদ্ধার করেছে পণ্ডিতদের আখড়া থেকে।

কাসেমের বিচ্যুতির কথা শুনে সুলতান খুব আফসোস করলেন। দুঃখে অনুতাপে সুলতানের চেহারা বিষাদময় হয়ে উঠল।

"নারী ও সম্পদের লিপ্সা মুসলিম জাতিকে যেভাবে পেয়ে বসেছে তা আমাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে।" বললেন সুলতান। "সম্পদ আর নারী লিপ্সায়ই আমাদেরকে গৃহযুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে। আচ্ছা, তোমরা কি সঠিক জানো, জয়পাল গজনী আক্রমণ করবে?"

"মহামান্য সুলতান! এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।" বলল ইমরান। "রাজার যুদ্ধ সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে গেলেও সেখানে রসদের ঘাটতি নেই। ইতোমধ্যে সে হয়তো ধ্বংস হওয়া সম্পদের ঘাটতি পূরণ করে ফেলেছে।"

"তোমাদের অন্য সাথীরা ওখানে কি করছে?" জিজ্ঞেস করলেন সুলতান। "জয়পালের তৎপরতা সম্পর্কে আমার নিশ্চিত হওয়ার দরকার, সে কি পরিমাণ সৈন্য নিয়ে আসছে?"

"বাটান্ডার লোকদের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাকে বলেছি। ওরা সেখানকারই বাসিন্দা। অধিকাংশই যুবক। খুব সাহসী উদ্যমী। ওয়াইস-এর তত্ত্বাবধানে তারা তৎপরতা চালাচ্ছে। ওয়াইস আমাদের এখানকার লোক। সেখানের একটি মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব নিয়েছে কাজের সুবিধার জন্যে। রাজার সেনাবাহিনী রওয়ানা হলেই সে বিস্তারিত সংবাদ আপনাকে জানাবে।"

"মহামান্য সুলতান! আপনি আর কোন সংবাদের অপেক্ষা না করে প্রস্তুতি শুরু করে দিন।" বলল নিজাম। "জয়পালের সাথে আমার সরাসরি কথা হয়েছে। তার কথাবার্তা থেকে বুঝেছি, যে কোন মূল্যে সে গজনী আগ্রাসন চালাবে। সে তার সেনা অফিসারদের সাথে যেসব পরামর্শ করেছে তাও শোনার সুযোগ আমার হয়েছে। এবার সে পরাজিত নয় বিজয়ী হতে জীবনের শেষ আক্রমণের উদ্দেশে আসবে। মোকাবেলা সমান সমান নয় দশের বিরুদ্ধে একজনের হবে এমন বিশাল হবে রাজার বাহিনী। তাই অতীতের মতো মুখোমুখি নয় গেরিলা পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে আমাদের। অবশ্য রাজা এক ধরনের নির্ভাবনায় রয়েছে যে, সুলতান সুবক্তগীনের ইন্তেকালের পর সেনাবাহিনী সামাল দেয়ার মতো দক্ষ কেউ গজনী বাহিনীতে নেই। তার এই চিন্তাই আমাদের বড় এক হাতিয়ার।"

"সৈন্য তো আমার কম ছিল না। কিন্তু বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের কারণে বহু সৈনিক বিভিন্ন উপদলে ভাগ হয়ে গেছে। যদ্দরুন আমাদের সেনাবল কমে গেছে।

আমাদের সেনা অফিসারদের মধ্যে এখন ক্ষমতার লোভ দেখা দিয়েছে। ইসলামের পক্ষে জিহাদ করার যোগ্যতা আর নেই এদের। সেনা অফিসাররা যখন ক্ষমতার মসনদ দখলের পেছনে পড়ে তখন সে জাতির ধ্বংসের সুড়ং পথ সৃষ্টি হতে থাকে। স্বজাতির ধ্বংস নিজেরাই টেনে আনে।"

তখন সুলতান মাহমূদ গজনী, বলখ ও খোরাসানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সাথে সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থাও করছিলেন। ইত্যবসরে নিজাম ও ইমরান লাহোর থেকে জয়পালের আক্রমণের খবর নিয়ে এলো। এদের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার পর সুলতান সব সেনা কর্মকর্তাকে ডেকে পরামর্শ সভায় বসলেন। সেনা কমান্ড আগেই নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন সুলতান। সেনাদের তিনি বললেন ঃ

"এটা নিশ্চিত যে, হিন্দুস্তানের সব রাজা-মহারাজাকে নিয়ে তৃতীয় বার গজনী আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে জয়পাল। সেনা কমান্ড আগের মতো রাজার হাতেই থাকছে। ওদের সৈন্যসংখ্যা কত সে সংবাদ নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়নি বটে, তবে অন্তত এক লাখের কম হবে না তা অনুমান করা যায়। লাহোরে আমাদের লোকেরা রাজার সব রসদপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে। এজন্য রাজার অভিযান কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। আপনারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের ব্যাপারটি জানেন। সব সৈন্যকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারছি না। কারণ সব সৈন্য বাইরে নিয়ে গেলে আমাদের ভাইয়েরা সুযোগের অসদ্ব্যবহার করে আমাদের পিঠে ছুরি বসাবে।

এটা আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। আপনারা কি কখনও ভেবেছেন, যদি হিন্দুদের হাতে গজনীর পতন ঘটে তবে ওইসব ক্ষমতালিপ্সুদের অবস্থা কি হবে? শুধু তাই নয়, গজনীর পতন হলে হিন্দুরা খানায়ে কা'বা পর্যন্ত পৌত্তলিক প্রভাব বিস্তার করবে। অভিজ্ঞ প্রবীণগণ আমাকে জানিয়েছেন, ভারতের হিন্দু পণ্ডিতেরা দাবী করে, পুরাকালে দজলা ফোরাত পর্যন্ত নাকি হিন্দুদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। তাই তারা কা'বা পর্যন্ত রামরাজ্য বিস্তৃত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের মনে রাখতে হবে, এরা শুধু যুদ্ধ করতে আসছে না, সাথে নিয়ে আসছে পৌত্তলিক ধর্ম আর আগ্রাসী চরিত্র। ইসলামের ধ্বংস সাধনে আমাদের প্রাণকেন্দ্রে আগ্রাসন চালাতে চায় হিন্দুরা। আপনাদেরকে শুধু সালতানাত ও নিজেদের ধনজন রক্ষার জন্যে নয় আমাদের প্রাণকেন্দ্র কা'বার সুরক্ষার জন্যে মরণপণ যুদ্ধ মোকাবেলা করতে হবে। আপনাদের সুবিধা হলো, হিন্দু সেনাদের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড ভীতি রয়েছে। লাহোর থেকে দু'জন লোক খবর নিয়ে এসেছে। তারা জানিয়েছে, গত যুদ্ধের পর পালিয়ে বেঁচে যাওয়া রাজার সৈন্যরা দেশে ফিরে গজনী বাহিনীর আতংক ছড়িয়েছে। রাজার নতুন সৈন্যদের মধ্যে গজনী সেনাদের আতংক বিরাজ করছে।

এছাড়াও আপনাদের আরেকটি সুবিধা হলো, আপনারা গজনীর বাইরে নিজ ভূমিতে সুবিধামতো জায়গায় ওদের মোকাবেলা করবেন। ময়দান আপনাদের মর্জি মতো হবে। গুপ্ত হামলার প্রচুর সুবিধা থাকবে আপনাদের হাতে। এছাড়াও লুমগানের বেশ কয়েকটি দুর্গকে ওদের ধোঁকা দেয়ার জন্য ব্যবহারের সুবিধা থাকবে আপনাদের।...

জয়পালের বাহিনীতে অনেক হাতি থাকবে। হাতির সুবিধা অসুবিধার ব্যাপারটি ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন। হাতি যেমন সুবিধাজনক, আত্মঘাতি পরিণতির জন্যে এগুলো ততোধিক মারাত্মক।"

আমরাও হাতি ব্যবহার করব কিন্তু আক্রমণাত্মক হামলায় নয় জবাবি আক্রমণে। ওদের সাথে এটা হবে আমাদের চূড়ান্ত লড়াই। পূর্বের কৌশলই অবলম্বন করতে হবে। সম্মুখ মোকাবেলা এড়িয়ে দুই প্রান্তে আক্রমণ করে দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে ওদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে হবে। দুশমনদেরকে আমাদের পিছনে তাড়িয়ে এনে সুযোগ মতো খেলিয়ে খেলিয়ে হত্যা করতে হবে.........।

শত্রুবাহিনীকে কখনও দুর্বল মনে করা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমরা যদি বিজয়ী হই তবে পেশোয়ার পর্যন্ত ওদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে এবং পেশোয়ার দখল করে নিতে হবে। আমি ওই এলাকার ভৌগোলিক মানচিত্রও আপনাদের দেখাচ্ছি। এর আগে আপনাদেরকে মনে একথা গেঁথে নিতে হবে, আপনারা ইসলামের সুরক্ষার জন্যে লড়াই করছেন, এ লড়াই হক ও বাতিলের লড়াই। যে লড়াই আমাদের নবীজী (স.)-এর যুগে শুরু হয়েছিল, সেই লড়াই আজও আমাদেরকে লড়তে হচ্ছে। এমন যাতে না হয়, আমাদের হাতে ইসলাম ও মুসলমানদের অপমান হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের নাম ঘৃণাভরে স্মরণ করবে, তাই আমাদের শ্লোগান হবে—"হয় মৃত্যু না হয় বিজয়'।"

দীর্ঘ উজ্জীবনীমূলক বক্তব্যের পর সুলতান মানচিত্রটি সেনা অফিসারদের সামনে মেলে ধরলেন। তাদেরকে বোঝালেন কোন কোন পথ অবলম্বন করে রাতের অন্ধকারে গেরিলা আক্রমণ চালাতে হবে। সবশেষে বললেন, আগামী প্রত্যূষেই আমরা অভিযান শুরু করব। সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখুন।

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মতে, ১০০১ সালের আগস্ট মাসে মাহমূদ মাত্র ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে জয়পালের মোকাবেলায় গজনী থেকে রওয়ানা হন। তার বাহিনীতে ছিল জয়পালের কাছ থেকে পাওয়া ৫০টি হাতি। সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল অশ্বারোহী। পদাতিক বাহিনী বেশী ছিল না। কারণ গজনীর নিরাপত্তা রক্ষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনা রেখে যেতে হয়েছিল। মাহমূদের যুদ্ধকৌশল ছিল সম্মুখ সমরে প্রতিপক্ষকে ঠেকিয়ে রেখে গেরিলা আক্রমণে শত্রুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করা। এজন্য পদাতিক বাহিনীর চেয়ে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল তার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন, পেশোয়ারে সুলতান মাহমূদ আক্রমণ করেছিলেন, এটা সঠিক নয়। আক্রমণের সব ব্যবস্থা রাজা জয়পালের পক্ষ থেকে হয়েছিল। গজনী আক্রমণের জন্যে জয়পাল যখন রওয়ানা করে সুলতান মাহমূদ আগেভাগেই গোয়েন্দাদের মাধ্যমে সে খবর পেয়ে গজনীর বাইরে পেশোয়ারের সন্নিকটে জয়পালের মোকাবেলা করেন। এ বিষয়টিকে কুটিল ইতিহাসবেত্তারা উল্টোভাবে উপস্থাপন করেছে।

রাজা জয়পাল ক'দিনের মধ্যে রসদ ও আসবাবের ঘাটতি পূর্ণ করে ফেলেছিল। জয়পাল খুব তাড়াতাড়ি গজনী আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে তার জেনারেলদের বলেছিল, "যে আমার আক্রমণ প্রতিহত করেছিল সেই সুবক্তগীন মরে গেছে। এবার গজনীই হবে আমার রাজধানী। দেবতার চরণে কুমারী বলি দিয়েছি। এবার দেবতাও আমার উপর সন্তুষ্ট। দেবতা আমার সহযোগিতায় থাকবেন। বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।"

* * *

এবার আগের মতো হিন্দুস্তানের অন্য রাজা-মহারাজারা সৈন্যবল বেশী দেয়নি। তাদের সন্দেহ ছিল জয়পালের বিজয়ের ব্যাপারে। এজন্য টাকা পয়সা প্রচুর দিয়েছে কিন্তু অনর্থক সেনাক্ষয় এড়ানোর জন্যে নানা অজুহাতে সেনা সাহায্য কম করেছে। তারপরও দেখা গেছে, রাজা জয়পাল যখন লাহের থেকে গজনীর উদ্দেশে রওয়ানা হয় তখন তার সাথে ছিল বারো হাজার অশ্বারোহী, ত্রিশ হাজার পদাতিক ও তিনশ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি। রসদ, যুদ্ধাস্ত্র ও আহার সামগ্রী প্রায় এক বছরের সাথে নিয়েছিল রাজা। এক মাইলেরও বেশী দীর্ঘ ছিল রসদ সরঞ্জাম বোঝাই গরুর গাড়ির বহর। এছাড়া বিজয়ের পর গজনীর বণিক শ্রেণী ও ব্যবসায়ীদের বশে আনার জন্যে প্রচুর সোনাদানা-মণিমুক্তা সাথে নিয়েছিল জয়পাল।

রাজা অভিযান শুরু করতে খুবই উদগ্রীব ছিল। তাই খুব ব্যস্ততার মধ্যেই অভিযানে বের হল। তার ধারণা ছিল, গজনী সুলতানের অজান্তে সে গজনীর নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নিবে। জয়পাল লাহোর থেকে পেশোয়ারে পৌঁছে মাত্র একরাত সেখানে অবস্থান করে। যাতে মালবাহী গরুর গাড়ীর বহর পৌঁছে যায়। এর পরদিনই গজনীর উদ্দেশে লাহোর ত্যাগ করে পথে নামে জয়পাল।

পেশোয়ার ত্যাগ করার সাথে সাথেই গজনীর গোয়েন্দারা সুলতানকে রাজার সামগ্রিক রণসজ্জার সংবাদ পৌঁছে দেয়। সুলতান জয়পালের সৈন্যসংখ্যা ও সামগ্রিক আয়োজনের খবর যুদ্ধ শুরুর অনেক আগেই পেয়ে গেলেন।

পেশোয়ার ছেড়েই রাজা জয়পাল জানতে পারে, সুলতান মাহমূদ পাহাড়ী এলাকায় তাঁবু ফেলেছেন। রাজা মাহমূদের আগমন সংবাদ বিশ্বাস করতে পারছিল

না। তবুও পাহাড়ী এলাকাতেই তার বাহিনীকে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দেয়। আর সংবাদটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। রাতে সুলতান মাহমূদের অবস্থান জানার জন্য একটি দলকে পাঠাল রাজা। কিন্তু সেই দল আর ফিরে আসতে পারল না। গজনী বাহিনী জয়পালের সাথে বোঝাপড়া ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে।।

তখনও ভোর। চারদিকে আবছা অন্ধকার। এরই মধ্যে গজনীর বীর বাহিনী গেরিলা হামলা চালিয়ে জয়পাল বাহিনীর একটি বাহুর তাঁবু ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিছু সংখ্যক নিহত ও আহত হয় রাজার সৈনিক। রাজা সংবাদ পেয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়। ততক্ষণে পূর্বাকাশে সূর্য উঠে গেছে। রণসাজে সজ্জিত হয়ে জয়পাল বাহিনী যখন সামনে বাড়ল তার বহু আগে থেকেই সুলতানের অশ্বারোহীরা তাদের স্বাগত জানাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো।

জয়পাল তার সৈনিকদের আক্রমণ হানতে নির্দেশ দিল। হিন্দুবাহিনী হস্তিদলকে সামনে বাড়িয়ে দিল। সুলতানের সৈন্যরা হস্তিবাহিনীর মোকাবেলায় অগ্রসর হয়ে এদেরকে বিক্ষিপ্ত করতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল এবং সুযোগ মতো হাতিগুলোকে আহত করতে তৎপর হল। একটু অগ্রসর হয়ে আবার পিছিয়ে আসা। আবার আগে বেড়ে পাশে ছড়িয়ে পড়া। এভাবে রাজার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল সুলতানের সৈন্যরা। ওদিকে সুলতান মাহমূদ নিজে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজার বাহিনীর পিছনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু জয়পালের সৈন্যরা মাহমূদের ঘেরাও প্রচেষ্টাকে দেখে ফেলল এবং পিছনে সরতে শুরু করল।

রাজার সৈন্যরা পিছনের দিকে মোড় নিলে সুলতান আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তুমুল লড়াই বেঁধে গেল। লড়াই যখন তুঙ্গে গজনী বাহিনী তখন পিছনে সরে আসতে থাকে। গজনী বাহিনী পশ্চাদপসরণ করছে দেখে হিন্দুরা তাদের ধাওয়া করে। এবার সুলতানের বাহিনী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় রাজার বাহিনী দু'ভাগ হয়ে গেল। ওদের একদল পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হল আর অপর দল পেশোয়ারের দিকে এগুতে লাগল।

এই সুযোগে সুলতানের কিছু সৈন্য প্রতিপক্ষের মাঝে চলে এলো এবং শত্রুবাহিনীর দুই প্রান্তে জোরদার আক্রমণ চালাল। রাজা জয়পাল ছিল দু'দলের মাঝামাঝি। পতাকা ছিল জয়পালের সাথে। কয়েকজন সৈন্য ছিল পতাকার পাহারায়। সুলতানের এই ছোট্ট দলটি রাজার পতাকা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে ঝাণ্ডা বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু তাদের কারো পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব হলো না। রাজার ঝাণ্ডাবাহিনী অক্ষত রয়ে গেল।

দিনের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রাজার দু'অংশের সাথে তুমুল লড়াই চলল। গজনী বাহিনী এদের খেলিয়ে খেলিয়ে কচুকাটা করছিল। এদিকে রাজা চাচ্ছিল সুলতানকে

এখানে ব্যস্ত রেখে সে বিরাট বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে গজনী কব্জা করে নেবে। সেজন্য রাজা গজনীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

যখনি রাজা গজনীর দিকে কিছুটা অগ্রসর হলো, লুকিয়ে থাকা সুলতান বাহিনীর গেরিলাদের টার্গেটের মধ্যে এসে গেল শত্রুসেনারা। শুরু হলো শত্রুদের উপর তীর বৃষ্টি। তীরের আঘাতে রাজার সৈন্যরা মাটিতে ছিটকে পড়ে পাথরখণ্ডের মত ভূতলে গড়াতে লাগল। ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় মাত্র ১০ হাজার মুসলিম অশ্বারোহী। সুলতানের সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতিও ছিল প্রচুর, কিন্তু লড়াই ধীরে ধীরে মুসলিম বাহিনীর অনুকূলে চলে আসছিল।

রাজা চাচ্ছিল মুসলমানরা সম্মুখ সমরে মোকাবেলা করুক। চেষ্টাও করছিল সেরূপ। তার সৈন্যদের ট্রেনিংও ছিল মুখোমুখি লড়াইয়ের। কিন্তু সুলতানের বাহিনী মুখোমুখি লড়াই এড়িয়ে বিক্ষিপ্তভাবে আকস্মিক আক্রমণ করে আবার দূরে সরে যাচ্ছিল, ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল হিন্দু-মুশরিকদের। সুলতান তার সুবিধামতো ময়দান নির্বাচন করে সেখানেই যুদ্ধের সূচনা করেন। রাজার ভাবনা ছিল ভিন্ন। ভেবেছিল, অতর্কিতে সে গজনী আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীকে নির্মূল করে ফেলবে।

সময় যতই যাচ্ছিল রাজার বাহিনী ততই পর্যুদস্ত হচ্ছিল। বিরাট সেনাবল থাকার পরও জয়পাল প্রাণপণ লড়াই করে যুদ্ধ আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হচ্ছিল। রাজা চাচ্ছিল যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে, তাতে সে বাহিনীকে নতুন করে বিন্যাসের সুযোগ পাবে, কিন্তু মুসলিম সৈনিকেরা ততক্ষণে "নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার" বলে ময়দানে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোমেলো হয়ে পড়ে জয়পালের সৈন্যরা। জয়পালের যুদ্ধ বিলম্বিত করার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলে পড়ার পর পড়ন্ত বিকেলে সুলতান মাহমূদ পঞ্চাশটি হাতি আর দু'হাজার অশ্বারোহী নিয়ে রাজার কেন্দ্রীয় বাহিনীর পশ্চাতে তীব্র আক্রমণ করেন। জয়পালের শক্তি-কেন্দ্র ঘিরে ফেলে দু'হাজার অশ্বারোহী। তুমুল লড়াইয়ে বহু হতাহত হলো, জয়পাল বহু চেষ্টা করেও ঘেরাও থেকে বেরিয়ে যেতে ব্যর্থ হলো। শীর্ষস্থানীয় পনেরজন কর্মকর্তাসহ গ্রেফতার হলো রাজা।

রাজার পতনে তার বাহিনী পালাতে শুরু করে। মুসলিম সৈন্যরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল পেশোয়ার পর্যন্ত। হিন্দু বাহিনী শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার এড়াতে ও জীবন বাঁচানোর জন্য যে যেভাবে পারে পলায়নে প্রবৃত্ত হল। অবস্থা এমন হল যে, রাজার বিশাল বাহিনীকে বকরীর পালের মতো অল্প ক'জন মুসলিম সৈন্য বাঘের মতো তাড়িয়ে নিল।

সন্ধ্যার আগেই যুদ্ধ থেমে গেল। রাজা জয়পাল জীবনের চূড়ান্ত যুদ্ধেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। অবশ্য গজনী বাহিনী এ বিজয়ে জীবন ও রক্তের যে মূল্য শোধ করেছেন তা গজনীর মানুষ কখনও শোধ করতে পারেনি। দুপুরের আগেই যুদ্ধ পরিণতির দিকে গড়ায়। তখনই পাঁচ হাজারের বেশী শত্রুসৈন্যকে হত্যা করে ফেলেছিল মুসলিম সৈন্যরা।

সুলতান তার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, মুখোমুখি সংঘর্ষে যাবে না। রাজার দু' প্রান্তে হঠাৎ করে ক'জন আক্রমণ করে আবার পালিয়ে যাবে, আবার ঘুরে এসে আক্রমণ শানাবে। এভাবে ছোট্ট ছোট্ট দলে হঠাৎ আক্রমণ করে চলে যাবে। তাতে শত্রুবাহিনী সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকবে, কোথা থেকে এসে প্রতিপক্ষ হামলা করে বসে, আর হামলা কীভাবে এবং কতোটা কঠিন হচ্ছে তা নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকবে।

এমনিতেই মুসলিম বাহিনীর আতংক বিরাজ করছিল জয়পাল শিবিরে। তদুপরি গজনী সৈন্যদের ক্ষীপ্র আক্রমণ আর আক্রমণ করে দ্রুত প্রস্থান করার ফলে পৌত্তলিকরা বুঝতেই পারলো না গজনী বাহিনীর সংখ্যা কত। প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা ছিল না জয়পাল বাহিনীর। অপর দিকে রাজার সৈন্যসংখ্যা ও শক্তি সম্পর্কে সুলতানের প্রত্যেকটি সৈনিক ছিল অবগত। যুদ্ধ শুরুর অনেক আগেই তারা গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের সহায়তায় প্রতিপক্ষের শক্তি সামর্থ ও প্রস্তুতির পরিপূর্ণ তথ্য পেয়ে গিয়েছিল। ফলে সুলতান বাহিনীর সামনে অস্ত্রসমর্পণ করতে হলো রাজা জয়পালের।

পেশোয়ার থেকে কিছুটা দূরে 'মিরান্দ' নামক স্থানে রাজা ও তার কর্মকর্তাদের হাজির করা হল সুলতানের সামনে। দোভাষির সাহায্যে শুরু হলো বন্দী ও বিজয়ীর মধ্যে সংলাপ।

"যুদ্ধ আপনি ও আমার মধ্যে হয়েছে কিন্তু জয় পরাজয় আপনি ও আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ ইসলামের বিজয়। আল্লাহ্ তাআলা এটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন— সত্যের মোকাবেলায় মাটি-পাথরের তৈরী দেব-দেবীদের কিছুই করার শক্তি নেই। ওরা মানুষের ভালমন্দ সংঘটনের মালিক নয়। মানুষকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। জন্ম-মৃত্যু জয়-পরাজয় তার ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে। এ নিয়ে আপনার তৃতীয় আক্রমণও ব্যর্থ হলো। এবার বিজয়ের জন্যে কুমারী বলিদান করেছিলেন। আপনার কল্পিত দেবতারা হয়তো আপনাকে নিরপরাধ কুমারী হত্যার শাস্তি দিয়েছে। কুরবানী আমরাও দেই তবে কাউকে খুন করে নয়। রণাঙ্গনে আমাদের সৈনিকদের লাশগুলো দেখুন! বুঝতে পারবেন, আল্লাহর জন্যে মুসলমানরা কিভাবে নিজেদের উৎসর্গ করে। আমাদের কুরবানী আল্লাহ্ পছন্দ করেন। আপনি কি আমাদের ঈমানে বিশ্বাস করেন? আপনার পঞ্চাশ হাজারের বিশাল বাহিনীকে মাত্র ১০ হাজার অশ্বারোহী ভেড়া বানিয়ে ছেড়েছে!"

“আপনার সাথে আমি ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে তর্ক করতে চাই না।” বলল রাজা। “পরাজয় আমি মেনে নিচ্ছি। আমি আপনার কাছে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি। সেই সাথে আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আর কোন দিন আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করব না।”

“হতেও পারে, চুক্তি করার পরও ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে আপনি চুক্তি ভঙ্গ করবেন। আপনার দ্বারা এমনটা হওয়া স্বাভাবিক।” বললেন সুলতান।

“না! এমনটি আমি কখনও করব না। এখন বলুন, সন্ধির জন্যে আপনাকে কি পরিমাণ মুক্তিপণ দিতে হবে?”

“মুক্তিপণের মধ্যে আমি যুদ্ধে প্রাপ্ত কোন সম্পদ গণ্য করব না। কারণ এগুলো গনিমত।” বললেন সুলতান।

রাজার বাহিনীতে ছিল বিপুল সম্পদ। আফগানদের অনুগত করতে বহু মূল্যবান মণিমুক্তা, হীরা-জহরত, স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে এসেছিল রাজা। সেই সাথে গোটা বাহিনীর এক বছরের আহার সামগ্রী।

ঐতিহাসিকদের মতে, কুড়িটির মতো মুক্তার হার ছিল জয়পালের কাছে। আর স্বর্ণ ছিল পাঁচমণ। একটি হীরার হারের তখনকার বাজার মূল্যে ছিল আশি হাজার দিনার।

চুক্তি সম্পাদনে শর্ত করা হল ঃ আড়াই লাখ দিনার ও পঞ্চাশটি সামরিক হাতির বিনিময়ে রাজাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। পণবন্দী হিসেবে তার কর্মকর্তাদের বন্দী করে রাখা হবে।

পেশোয়ার পর্যন্ত অধিকার করে নিলেন সুলতান। খায়বর ও আশপাশের সকল পাহাড়ী এলাকায়ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে, ৮ মহররম ৩৮২ হিজরী সনের ২৭ নভেম্বর ১০০১ খৃস্টাব্দের বৃহস্পতিবার এ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। আর পরাজিত রাজা শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মুক্তিপণের স্বীকৃতি দিয়ে জীবন নিয়ে ফিরে গিয়েছিল।

অধিকৃত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্যে সুলতান কিছুদিন পেশোয়ারে কাটালেন। যখন সংবাদ এলো, গজনীর আশেপাশের কুচক্রীরা চক্রান্ত করছে, তখন তিনি গজনী ফিরে গেলেন।

হিন্দুজাতির অপরিমেয় সম্পদ ও জীবন ধ্বংস করে রাজা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করল। এমনিতেই ছিল বয়স্ক-বুড়ো। পরাজয়ের যন্ত্রণা তাকে আরো কাহিল করে তুললো। রাজমহলে ফিরেই জরুরী দরবার তলব করল রাজা। দরবারে ঘোষণা করল নিজের ব্যর্থতা আর ক্ষমতা ত্যাগের কথা। রাজা বলল,

আজ থেকে আমার ছেলে আনন্দ পাল রাজা। এ কথা বলেই রাজা সিংহাসন ত্যাগ করল।

রাজমহলেই সে সবাইকে বলল তার সাথে মহলের পার্শ্ববর্তী বাগানে যেতে। ছেলে আনন্দপাল তার সহগামী হল। যেতে যেতে রাজা ছেলের উদ্দেশে বলল—

"তুমি যেভাবে ভাল মনে কর সেভাবেই রাজ্য চালাবে। এ ব্যাপারে আমার কোন পরামর্শ নেই। তবে ক'টি কথা মনে রেখো। কখনও গজনী আক্রমণে অগ্রসর হবে না। আমাদের বাহিনী মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে কোন দিন পেরে উঠবে না। ওরা ঐশী শক্তির বলে যুদ্ধ করে। এই শক্তি আমাদের সৈন্যদের নেই। মাহমূদকে আড়াই লক্ষ দিনার মূল্যের স্বর্ণ দিয়ে দিয়ো, না হয় তোমার উপর সে আক্রমণ করবে। আর আক্রমণ করলে পরিণতি যা পেশোয়ারে দেখে এসেছো তাই হবে। এই চুক্তির ব্যত্যয় করো না।"

রাজা যখন রাজমহলের পার্শ্ববর্তী বাগানে উপনীত হল তখন সবাই এটা দেখে আশ্চর্য হলো যে ওখানে চিতা তৈরী করা হয়েছে। চিতায় কাঠের স্তূপ করে রাখা হয়েছে—হিন্দু মরদেহ পোড়াতে যেভাবে রাখা হয়। কিন্তু সেদিন রাজমহলের কারো মৃত্যুর কথা কেউ জানে না। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই বিস্ময়াভিভূত। চিতায় রাজা পৌঁছার আগেই চিতায় তেল ঢেলে দেয়া হয় এবং চিতার পাশে জ্বলন্ত মশাল হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো। আরো ক'জন লোক কোন মরদেহ সৎকারে অপেক্ষা করছে।

কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই রাজা জয়পাল কাউকে কিছু না বলে চিতায় উঠে দাঁড়াল। মশালের দিকে হাত বাড়ালে লোকটি জ্বলন্ত মশাল রাজার হাতে তুলে দিল। রাজা তেলে ভেজানো কাঠের স্তূপে দাঁড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে মুহূর্তের মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। জয়পালের ছেলে দৌড়ে রাজাকে চিতা থেকে নামানোর জন্যে এগিয়ে গেল কিন্তু ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে ফেলেছে রাজাকে। প্রজ্বলিত আগুনের পাশে যাওয়া সম্ভব হলো না আনন্দ পালের।

কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় পাওয়া যায়, জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেয়ার আগে রাজা ছেলে আনন্দপালকে নির্দেশ দিয়েছিল, সে যাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ প্রস্তুতি না করে এবং সুলতান মাহমূদকে চুক্তির শর্তানুযায়ী আড়াই লাখ দিনার পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সুলতানের সমবয়স্ক আনন্দপাল উপদেশ উপেক্ষা করে বাবার জ্বলন্ত চিতার পাশে দাঁড়িয়েই চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিয়ে পিতার পরাজয় ও অপমৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিল। বলল, "গজনীবাসীদেরকে আমি এক দিনারও দেবো না এবং বাবার প্রতিশোধ আমি নেবই।"

এক রাতের স্বর্গবাস

মুলতান। উপমহাদেশের একমাত্র বসতি, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানা উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া, দখল-মুক্তির শত পটপরিবর্তনেও যা অমুসলিমদের পদানত হয়নি। উপমহাদেশ থেকে মোগল শাসনের অবসান ঘটলেও মুলতান ছিল সব সময় ইংরেজ বেনিয়াদের কব্জামুক্ত। এগারো শতকে উপমহাদেশ জুড়ে হিন্দুদের দাপট থাকলেও মুলতান ছিল পৌত্তলিক পঙ্কিলতা মুক্ত। অথচ তখন মুলতানের আশে-পাশের সব রাজ্যে ছিল হিন্দু পৌত্তলিকদের জয়জয়কার।

১০০২ খৃস্টাব্দের ঘটনা। মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর ভারতের পৌত্তলিকদের গড়া রাম-রাজ্যের ভিত্তিমূলে দ্বিতীয় বারের মতো আঘাত হানেন সুলতান মাহমূদ গজনবী। মাহমূদ গজনবীর আঘাতে কেঁপে উঠল পৌত্তলিকদের স্বর্গ-সিংহাসন। ভারতের সবচেয়ে প্রতাপশালী হিন্দু রাজা জয়পালের তিনটি হামলা প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেন। চিরতরে স্তব্ধ করে দেন জয়পালের আগ্রাসী থাবা। জয়পালকে রণাঙ্গনে বন্দী করে ফেলেন। জয়পাল আর যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার করে মোটা অংকের মুক্তিপণের চুক্তি করে মুক্ত হয়ে রাজধানীতে ফিরে ছেলে আনন্দপালকে সিংহাসন সোপর্দ করে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেয়। আনন্দপালকে জয়পাল মুক্তিপণ আদায় করতে এবং ভবিষ্যতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত থাকতে ভবিষ্যদ্বাণী করে। মাহমূদ গজনবী পেশোয়ারের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে পেশোয়ার কেন্দ্রিক শাসন ক্ষমতা নিজের কর্তৃত্বে নিয়ে নেন। যার ফলে মাহমূদের রাজধানী গজনী অনেকটা বহিঃশক্রর আক্রমণ আশংকা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

সুলতান মাহমূদ রাজা জয়পালকে বন্দী করার পর আড়াই লাখ স্বর্ণমুদ্রা মুক্তিপণের শর্তে মুক্ত করে দেন। সেই সাথে পঞ্চাশটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি যুদ্ধ খরচ বাবদ দেয়ার অঙ্গীকার করে জয়পাল। জয়পাল রাজধানীতে ফিরে যথারীতি সুলতানের কাছে পঞ্চাশটি হাতি এবং আড়াইলাখ স্বর্ণমুদ্রা পাঠানোর কথা বলে চিতায় আত্মাহুতি দেয়। কিন্তু আনন্দপাল পিতার জ্বলন্ত চিতার পাশে দাঁড়িয়েই সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আনন্দপাল সেই সামবেশেই তার পিতার প্রতিশ্রুত মুক্তিপণ ও যুদ্ধ জরিমানা দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

রাজা জয়পালের আত্মাহুতির ঘটনাটি ঘটে ১০০২ খ্রিস্টাব্দে। দেখতে দেখতে দু'বছর চলে গেল। জয়পালের প্রতিশ্রুত জরিমানা নিয়ে আসার পরিবর্তে সুলতান

মাহমূদের গোয়েন্দারা খবর নিয়ে এল, আনন্দপাল মুক্তিপণ পরিশোধের পরিবর্তে তার বাবার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে।

................"এটা আমার কাছে আদৌ আশ্চর্যের কোন খবর নয়" বললেন সুলতান।" মানসিকভাবে এমনটির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। আমি এ জন্যই জয়পালের এলাকা কব্জা করেছি যে, জয়পালের চেলা ও পরামর্শদাতাদের কাছে গজনী এখন আসমানের তারার চেয়েও দূরবর্তী মনে হবে। আল্লাহর রহমত ও আমার জানবাজ যোদ্ধাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শুধু গজনী নয় ওদের আজীবন লালিত দুঃস্বপ্ন খানায়ে কা'বাকে আমি ওদের আগ্রাসন থেকে নিরাপদ করতে পেরেছি।"

"জয়পাল পরাজিত হয়ে কাপুরুষের মতো আত্মাহুতি দিয়েছে। এখন সিংহাসনে বসেছে ওর ছেলে, ওদের আমরা মোটেও পরোয়া করি না।" বলল এক সালার।

"দুশমনকে এতোটা খাটো করে দেখতে নেই বন্ধুরা! দুশমনদের ব্যাপারে সবকিছু গভীরভাবে ভাবতে হয়।" বললেন সুলতান। "রাজা জয়পালের মৃত্যুতে পৌত্তলিকতার পূজারীরা সব মরে যায়নি। ভারত থেকে বিলীন হয়ে যায়নি মূর্তিভক্তি। এটা দু'টি আদর্শের লড়াই। হিন্দুরাজা যুদ্ধ করতে না চাইলেও ওদের ধর্মীয় পণ্ডিতেরা তাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। ওদের এলিট শ্রেণী এবং মাতাব্বররা কখনও শাসকদের নির্বিকার থাকতে দেবে না। দুশমনের শক্তিকে কখনও ছোট করে দেখবে না। বরং এখন তোমাদের ভাবতে হবে, এই জাতশত্রুদের পা কিভাবে চিরদিনের জন্যে ভেঙে দেয়া যায়।"

"আপনি যদি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে অভিমত হলো-এখনই আমাদের লাহোরের দিকে অগ্রাভিযান করা উচিত। তবে এর আগে হিন্দুস্তানে আমাদের একটি ঘাঁটি তৈরী করতে হবে, যাতে আমরা আরো অগ্রসর হতে পারি এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি।" বলল অপর এক সালার।

"ঘাঁটি আমাদের আছে।" বললেন সুলতান। "মুলতানকে আমরা ঘাঁটি মনে করতে পারি। মুলতানের শাসক আবুল ফাতাহ দাউদ বিন নসর একজন মুসলমান এবং আমাদের সুহৃদ।"

"জাঁহাপনা! দাউদ বিন নসর মুসলমান বটে, কিন্তু সে এজন কারামাতী, আপনি কারামাতীদের অতীত ইতিহাস জানেন, তাদের উপর ভরসা করা ঠিক নয়।" বলল উজীর।

"সে তো সুলতান সুবক্তগীন মরহুমের সাথে মৈত্রীচুক্তি করে প্রয়োজনের সময় একে অপরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে। সে আমাদের ধোঁকা দিতে পারে না।" বললেন সুলতান।

"আলীজাহ! চিহ্নিত দুশমনের উপর নির্ভর করা যায় কিন্তু স্বজাতির গাদ্দারদের বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।" বলল উজির।

"আগামীকাল প্রত্যূষে একজন দূত পাঠিয়ে দিন। আমার বিশ্বাস, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয় ভূমি থেকে আমরা আশানুরূপ সহযোগিতা পাব। দাউদ বিন নসর হিন্দু বেষ্টিত এলাকায় থাকে, সে হিন্দুদের মনোভাব আমাদের চেয়ে ভাল জানে। আমার মনে হয়, আমাদের অভিযানের সংবাদে সে খুশী হবে। তার সহযোগিতা আমাদের যেমন প্রয়োজন, তারও আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। আমার ইচ্ছা, সেখানে সামরিক দূত পাঠাব।"

"এ কাজে আসেম ওমর সবচেয়ে উপযুক্ত। বাহাদুর, উদ্যমী এবং চৌকস সেনা অফিসার। কথা বলার কৌশল জানে ভাল।"

"আসেম ওমর। কে যেন আমাকে বলেছিল, সে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ভদ্রলোক।" বললেন সুলতান।

"যুদ্ধ-কৌশল ও সামরিক বিষয়াদি সম্পর্কে আসেম ভাল জ্ঞান রাখে। সে একটা বিষয় যেমন বুঝে অপরকেও বোঝাতে পারে। রণাঙ্গনে শত্রুসেনাদের সামনেও সে স্বাভাবিক ভাবটা ধরে রাখতে পারে। এটা তার একটা বড় গুণ।" বলল সিপাহ্ সালার।

"আপনি যদি মনে করেন সে-ই উপযুক্ত, তবে আমার দ্বিমত নেই। ওকে ডেকে পাঠান।" বললেন সুলতান। "আমি তাকে মৌখিক পয়গাম দেবো। কোন লিখিত পয়গাম দেবো না। কারণ, তাকে শত্রু এলাকা অতিক্রম করে যেতে হবে। লিখিত পয়গাম শত্রুদের হাতে চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।"

আসেম ওমর সুলতানের পয়গাম নিয়ে মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরের দরবারে হাজির হয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দাউদ বিন নসর-এর দরবারের জাঁকজমক দেখে আসেমের মনে হলো, দাউদ বিন নসর যেন সারা ভারতবর্ষের মহারাজা। সুলতান মাহমূদ এবং সুলতান সুবক্তগীনের রাজদরবারে আসেম ওমরের মতো কর্মকর্তা কেন সাধারণ সৈনিকেরাও সুলতানের পাশাপাশি বসে কথা বলতে পারে, কিন্তু দাউদ বিন নসরের দরবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুউচ্চ রাজ আসনে বসা দাউদ বিন নসর। আসনের নীচে সব কর্মকর্তা দাঁড়ানো।

অবস্থা দৃষ্টে আসেম নিজেকে দাউদ বিন নসরের সামনে অতি নগণ্য মনে করল। কী শান-শওকাত দাউদ বিন নসরের। তার দু'পাশে পরীর মত অনিন্দ সুন্দরী যুবতীরা পাখায় বাতাস করছে। মাথার উপরে বাহারী শামিয়ানা, রং বেরঙের ঝারবাতি। নীচে সামনে অতি সাধারণ কয়েকটি আসনে মন্ত্রীপর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বসার ব্যবস্থা। ওরা দাউদ বিন নসরের সামনে পাথরের মূর্তির মতো স্থির।

"প্রজাদের ত্রাণকর্তা, মহামান্য রাজা! সুলতান মাহমূদ বিন সুবক্তগীনের দূত দরবারে উপস্থিত।" উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করল একজন ঘোষক।

আসেম ওমর এদিক সেদিক তাকাল। কিন্তু ঠাহর করতে পারল না, এ আওয়াজ কোত্থেকে এলো।

"গজনীর দূতকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।" বলল দাউদ। "কি সংবাদ নিয়ে এলে?"

"আপনার জন্যে কিছু উপঢৌকন নিয়ে এসেছি।" হতচকিত হয়ে বলল আসেম। নিজেকে সামলিয়ে বলল, "আগে আপনার খেদমতে সেগুলো পেশ করার অনুমতি চাচ্ছি।"

"সুলতান মাহমূদ কি তোমাদেরকে রাজ-দরবারের আদব শেখায়নি?" কিছুটা তাচ্ছিল্য মেশানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল দাউদ!

"আলীজাহ্! আমাদের ওখানে এমন দরবারের ব্যবস্থা নেই। সুলতানের অধিকাংশ মজলিস হয় কোন ময়দান কিংবা সাধারণ ঘরে। সেখানে আমরা সবাই একসাথে বসে কথা বলি।"

"এটা কোন যুদ্ধ ময়দান নয় সম্মানিত অতিথি! আমার এখানে কোন লোকের আমার অনুমতি ছাড়া কাশি দেয়াও বেয়াদবী।"

"সুলতান হয়তো আমাকে কোন ভুল জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে বলা হয়েছিল, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয় স্মৃতিবাহী ভূমির সর্বশেষ শাসকের কাছে আমাকে পাঠানো হচ্ছে। আমি তো মনে করেছিলাম, শত শত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে আসা আরব মুজাহিদের মতো মুহাম্মদ বিন কাসিমের স্মৃতিবাহী এ রাজ্যের শাসকও হবেন আরব যোদ্ধাদের মতো তাঁবুর অধিবাসী।"

"তোমাকে কে বলল, আমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরী। তোমরা ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। আমরা এখানকার বিজয়ী শাসক। আমার দাদা আহমদ খান লোদী এই এলাকা জয় করে শাসন ক্ষমতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন এ অঞ্চলে কারামতী আদর্শের প্রবর্তক। তবুও আজকের জন্য তোমাকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের রাজ্য বলার অধিকার দেয়া হলো। আমরা মুসলমান। আমাদের ভিন্নধর্মী মনে করার কারণ নেই। কিন্তু আমাদের রাজদরবারের একটা নিজস্ব নিয়ম কানুন রয়েছে বৈকি।"

"এসব আদব রক্ষা না করা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ এ আদব সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। আমি কি উপঢৌকন পেশ করতে পারি?" বলল আসেম ওমর।

"হ্যাঁ, অনুমতি দেয়া হলো।"

"দরবারের বাইরে আসেম ওমরের চার সাথী দাঁড়ানো। উপঢৌকন ছিল তাদের কাছে। আসেম দ্রুত পায়ে দরবার থেকে বেরিয়ে তাদের গিয়ে বলল, তোমরা এগুলো নিয়ে চল। উপহার সামগ্রীর মধ্যে কিছু ছিল খুব দামী হিরা মণিমুক্তার অলংকার এবং গজনী এলাকার দামী আসবাব। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি জিনিস ছিল রাজা জয়পালের তরবারী। এই তরবারীটি সর্বশেষ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণের সময় সুলতানের কদমে উৎসর্গ করেছিল জয়পাল এবং বলেছিল, "দয়া করে আমাকে প্রাণভিক্ষা দিন। আর জীবনে কখনও আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দুঃসাহস করব না।"

আসেম ওমর অগ্রসর হয়ে তরবারীটি দাউদ বিন নসরের পায়ের কাছে রেখে দিল।

"কোন পয়গাম আছে কি?"

"আমাকে কি একাকী কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে?"

দরবারীদের দিকে চোখ ফেরাল দাউদ। সবাই উঠে চলে গেল বাইরে। রয়ে গেল মাত্র দুটি যুবতী। এরা দাউদের কুরসীর পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে বাতাস করছিল। দাউদের ইশারায় তার সিংহাসনের কাছে রাখা একটি আসনে গিয়ে বসল আসেম।

"এই দরবারের নিয়ম কানুন আমাকে রক্ষা করতেই হয়, না হয় শাসন কাজ চালানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।" কিছুটা নমনীয় কণ্ঠে বলল দাউদ। "এসব নিয়ম রক্ষা করা আমাদের একটা সমস্যা। আর আপনার জন্যে সমস্যা হয়েছে এসব আইন-কানুন সম্পর্কে জানা না থাকা। আচ্ছা, আপনি কি লিখিত কোন পয়গাম এনেছেন?"

"জ্বী-না। পথে শত্রুদের হাতে সংবাদ হস্তগত হওয়ার আশংকায় সুলতান কোন লিখিত পয়গাম দেননি। আমি সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার। যেহেতু পয়গামটিও সামরিক কৌশল বিষয়ক, এজন্য সুলতান আমাকে পাঠিয়েছেন মৌখিক পয়গাম দিয়ে, লিখিত পয়গাম দেননি।"

"আপনি জানেন, রাজা জয়পাল পর পর তিনবার আমাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবার সে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। প্রত্যেকবারই সে মোটা অংকের জরিমানা দিয়ে আর যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার করেছে কিন্তু কোন অঙ্গীকারই সে রক্ষা করেনি। শেষ পর্যন্ত তাকে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে হলো। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত মুক্তিপণ তার স্থলাভিষিক্ত পুত্র আনন্দপাল আজো পর্যন্ত আদায় করেনি। বরঞ্চ পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তার সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেয়ার খবর পেয়েছি আমরা।"

যে দুই যুবতী দাউদ বিন নসরের পিছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিল এরা উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

"আপনি জানেন যে, আমাদের রাজধানীকে নিরাপদ করতে আমরা লুগমান ও পেশোয়ার কব্জা করে নিয়েছি। চুক্তি মতে পাঞ্জাব আমাদের শাসনাধীন। আনন্দপাল ও পাটনার শাসক বিজে রায় আমাদের নিয়োজিত শাসক। সুলতানের অনুমোদন ছাড়া তাদের কোন নির্দেশ জারি করার অধিকার নেই—এরা আমাদের সুলতানের অধীনে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করবে মাত্র। কিন্তু উভয়েই রাজা জয়পালের কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্ম দিচ্ছে। তাই অন্যান্য হিন্দু রাজাদের নিয়ে এরা যাতে আবার সেনা অভিযান চালাতে না পারে সেজন্য সুলতান ইচ্ছা করছেন লাহোরে অগ্রাভিযান করবেন। সুলতানের উদ্দেশ্য দু'টি। শাসকদের পীড়ন থেকে সাধারণ নাগরিকদের মুক্তি দেয়া এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। বহু ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম রাজ্য আজ মূর্তির বাগাড়ে পরিণত হয়েছে, সেখানে আবার তাওহীদের তাকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করাই সুলতানের উদ্দেশ্য।"

"এ পরিকল্পনায় আমরা কি করতে পারি।" জিজ্ঞেস করল দাউদ।

"যেহেতু আমি সৈনিক, এজন্য সামরিক ঢংয়ে কথা বলছি। আমরা বিজি রায় এবং আনন্দপালের অবস্থানের মাঝামাঝি স্থানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করতে চাচ্ছি। আপনি যেহেতু উভয়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছেন এজন্য আপনার এলাকাকে ঘাঁটি স্থাপনের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা বিবেচনা করছি। আমরা ঘাঁটি স্থাপন করেই মুসলমান অধিবাসীদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে শুরু করব। এতে আপনাদের যেমন ফায়দা হবে আমরাও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব। এটা হবে উভয়ের জন্যে উপকারী। আমরা এখানে এলে আপনার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাবে না পৌত্তলিকরা। প্রয়োজনের সময় আমরা একে অন্যের সহযোগিতা করতে পারব। এ ব্যাপারে সুলতানের প্রয়োজন আপনার পক্ষ থেকে নিশ্চিত আশ্বাস। আপনার কাছ থেকে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা চাই যে, আমরা যখন পেশোয়ার থেকে মুলতানের দিকে অগ্রাভিযান করে আপনার এলাকা অতিক্রম করব তখন যদি বিজি রায় কিংবা আনন্দপাল আমাদের পথ রোধ করে তবে পিছন থেকে অথবা এ পাশ থেকে আপনি ওদের উপর হামলা করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন। তাহলে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে আমাদের সুবিধা হবে। আমরা কখন-ই আপনাকে একা ছেড়ে দেবো না। প্রয়োজনে আপনার জন্য আমরা আমৃত্যু লড়ে যাব।"

"সুলতান মাহমূদ অভিযান পরিচালনা করতে চাইলে তিনি তা করতে পারেন। আমরা তো আর তাকে বাধা দিতে পারব না। কিন্তু দুই রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো সৈন্য আমাদের নেই।" বলল দাউদ বিন নসর।

"আপনার জবাবে আশ্বস্ত হতে পারলাম না। আপনার কাছ থেকে এ জবাব নিয়ে গেলে সুলতান নিশ্চিত হতে পারবেন না। সেনারা তো আপনার মতো আমার মতো সেনাপতিদের কমান্ডে অগ্রাভিযান চালাবে, কাজেই সমূহ বিপদ আশংকার বিষয়টি আমাদেরকেই ভাবতে হবে। আমি আসার সময় এ অঞ্চলের পথ ঘাট দেখে এসেছি। এলাকাটি আমাদের জন্য নিরাপদ হলেও পাহাড়ের চূড়া থেকে তীরন্দাজদের টার্গেট হওয়ার আশংকা প্রবল। কাজেই সেনাবাহিনীর জন্যে পথটি মোটেও সুগম নয়। আপনার কাজ হবে আগে থেকে আপনি আপনার তীরন্দাজ সেনা ইউনিটকে ওই এলাকায় পাহারায় নিয়োগ করবেন, যাতে আমাদের সেনারা নিরাপদে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলো অতিক্রম করতে পারে।"

"এ কাজ করতে হলে আমাদের তীরন্দাজদেরকে আমাদের প্রশাসনিক এলাকার বাইরে হিন্দুদের এলাকায় পাঠাতে হবে।" বলল দাউদ বিন নসর।

"লুগমান ও গজনী কখনও জয়পালের এলাকা ছিল না। অবশ্য লুগমান ও হিন্দ আমাদের এলাকাও নয়। কিন্তু জয়পাল আমাদের এলাকাতে সেনা অভিযান করেছে, এর জবাবে আমরা তাদের এলাকায় অভিযান চালাচ্ছি। আপনি কি একথা ভুলে গেছেন, যে এলাকা এরা শাসন করছে তা প্রকৃত পক্ষে মুসলিম সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল! আমরা আমাদের ভূমি তাদের দখলমুক্ত করতে চাচ্ছি।"

গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেল দাউদ। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "আসলে আপনার সুলতানের চাহিদার জবাব তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া মুশকিল। এজন্যে আমার ভাবতে হবে। উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা করতে হবে। আপনি এখানে চারদিন অপেক্ষা করুন। শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখুন, আমি আমার উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে নেই। আজ থেকে আপনি রাজকীয় অতিথি। আজ রাতে আপনার সম্মানে ভোজসভা হবে। সেই সভায় আপনার সম্মানে বড় ধরনের আপ্যায়ন ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে।"

সত্যিই নৈশভোজের আয়োজন ছিল রাজকীয়। অনুষ্ঠানের বিলাসী আয়োজন দেখে আসেম ওমরের চোখ ছানাবড়া।

প্রাসাদের বাগানে আয়োজন করা হলো নৈশভোজের। রং বেরঙের ঝাড়বাতি, জরিদার শামিয়ানা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে মনমাতানো প্যান্ডেল। ঝাড়বাতিগুলো দেখে আসেমের কাছে মনে হলো, সোনা ও রুপার তৈরী কতগুলো জ্বলন্ত তারা। বহু বর্ণের ফানুস এবং জরিদার কারুকার্যময় শামিয়ানার সাথে ঝুলানো ঝাড়বাতিগুলোর নীচে অবস্থানরত মানুষগুলোর গায়ের রং যেমনই হোক না কেন সবাইকে ফর্সা আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী মনে হচ্ছিল।

অভাবিত এই মজলিসের বর্ণাঢ্য আয়োজনে আসেম এমনই প্রভাবিত হয়ে পড়ল যে, সে ঘোরের মধ্যে হারিয়ে গেল। মনে হতে লাগল, সে কোন

স্বপ্নালোকে বিচরণ করছে। তবলার ও ঢোলের হাল্কা বাজনার তালে মঞ্চে একটি নর্তকী নাচের নানা মুদ্রা উপস্থাপন করছে। যেন একটি নাগিনী ফনা তুলে খেলছে শিকার নিয়ে। নর্তকী ষোড়শী যুবতী। দুই বাহু সম্পূর্ণ খোলা, পরনের কাপড় অতি সূক্ষ্ম। নাভীর নীচে কতগুলো রেশমী সূতোর পাকানো ঝালর দোল খাচ্ছে নাচের তালে তালে। এমন দোলনীতে তার উরুসন্ধি বার বার প্রকাশ পাচ্ছে। বুকের স্বল্পবসন তরুণীর যৌবনকে ফুটন্ত গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত করেছে। তরুণীটি হয়তো এমনিতেই সুন্দরী, কিন্তু আলোর বর্ণাঢ্য রং এর প্রতিবিম্ব ওকে এতোই মায়াবী ও মোহনীয় করে তুলেছে যে, ওর রেশমী চুলের বাহার আর রুপোর মতো দাঁতের মুক্তা ঝরানো হাসিতে অনুষ্ঠানের সকল পুরুষের দৃষ্টি ওর দিকে নিবদ্ধ হতে বাধ্য।

নর্তকীটি বাজনার উচ্চাঙ্গ তালে নাচতে নাচতে আসর কাঁপিয়ে হারিয়ে গেল। যেন কোন জলপরী জলতরঙ্গের মধ্যে খেলা করে হঠাৎ জলরাশির মাঝে তলিয়ে গেল। বাজনা বদলে গেল। নতুন করে শুরু হল অন্য সুর। এবারের বাজনার তাল লয় ভিন্ন, আরো উগ্র, আরো তীব্র। ঠিক এ সময়ে জলরাশির ভিতর থেকে যেন হঠাৎ করে দৃশ্যমান হলো আরেক নর্তকী। যেন কোন জলপরী পানির তলা থেকে ভেসে উঠেছে। এটি আগের তরুণীর চেয়ে আরো স্বল্পবসনা, আরো বেশী উদ্দীপক। এর নাচ ও তাল আরো মোহনীয়।

আসেম বিন ওমর দাউদ বিন নসর থেকে দূরে। শত শত মেহমানের সাথে উপবিষ্ট। সবাই জানে, আজকের এ আয়োজন সুলতান মাহমূদের বিশেষ দূতের সম্মানে। কিন্তু কে কোথায় আর মেহমানই বা কে সে খবর নেয়ার খেয়াল নেই কারো। সবার দৃষ্টি মঞ্চের নৃত্যরত কিশোরীদের দিকে। ওদের নাচ আর যন্ত্রীদের বাজনা সমবেত সবাইকে আবেগের শৃঙ্গে পৌঁছে দিল। যুবতীদের নাচের মুদ্রা আর শারীরিক কসরত থেকে চোখ ফেরানো কারো পক্ষেই সম্ভব হলো না। আসেম ওমর অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নর্তকীর প্রতি। এতো সুন্দর, এতো আকর্ষণীয় হতে পারে নারী, সে তা কখনও ভাবতেই পারেনি। নর্তকীর নিক্কনের ঝংকারে কোথায় যে হারিয়ে গেল আসেম তার খবর কে রাখে।

এর আগে শরীরের কাঁপুনি ঝাঁকুনি আসেম দেখেনি তা নয়, তবে সেই কাঁপুনি ঝাঁকুনি নর্তকীর নয়। যুদ্ধ ময়দানে আহত মৃত্যু পথযাত্রী সৈনিকদের, যুদ্ধরত সিপাহীদের—যারা আহত হয়ে মাটিতে-মরুতে কিংবা পাহাড়ী পাথুরে যমীনে তরফাতে তরফাতে নিস্তেজ হয়ে চিরদিনের জন্যে স্থির হয়ে গেছে। গত বিশ বাইশ বছর যাবত আসেম দেখেছে যুদ্ধাহত সৈনিকের মৃত্যু যন্ত্রণার ছটফটানি। সেখানে দোস্ত-দুশমনের একই রং, একই কাতর ধ্বনি।

মাটি আর খুন এই দু'য়ের সাথে ছিল আসেমের মিতালী। রণাঙ্গনের ভয়াবহ দৃশ্য আসেমের প্রিয়। মরা এবং মারা এই ছিল আসেমের নেশা, ভালবাসা। আসেম তার সুলতানের চরিত্রেও এই রং-ই দেখে আসছে। সুলতানের দরবারে আসেম ধুলোবালির যে আস্তরণ দেখে, সেই ধুলো মাটির চরিত্র-আদর্শ সে সুলতানের মাঝেও দেখেছে। সুলতানের দরবারে এ ধরনের রঙ্গিন ফানুস কল্পনা করাও মুশকিল।

দাউদ বিন নসরের দরবারে আসেম নৃত্যরত নর্তকীদের যে নাচের মুদ্রা দেখেছে, উদ্ভিন্ন যৌবনা উর্বষী তরুণীদের স্নায়ু উদ্দীপক যে অঙ্গভঙ্গি আসেম প্রত্যক্ষ করল, তাতে তার মধ্য থেকে যোদ্ধার আদর্শ বিলীন হয়ে মনের ভিতরে ভোগবাদী লিপ্সা জেগে উঠেছে। ভিতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আসেমের ঘুমিয়ে থাকা কাম প্রবৃত্তি। যুদ্ধ ময়দানের বীভৎস রক্তাক্ত রূপের প্রতি তার মনে জন্ম নিতে লাগল প্রচণ্ড ঘৃণা। যুদ্ধাহত সৈনিকের রক্ত-রাঙা চেহারা আর তপ্ত খুনের গন্ধ তার মনের মধ্যে তীব্র বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করল, তদস্থলে জন্ম নিল ভোগের উন্মাদনা। দাউদ বিন নসরের এই কামোদ্দীপক রগরগে আয়োজন আসেমের ভিতরকার যোদ্ধাকে অল্প সময়ের মধ্যে আমূল বদলে দিল। সে অনুভব করল যুদ্ধের ক্লান্তি, ক্ষুধা-পিপাসার যাতনা। তার দু'পা এখন রণাঙ্গনের অশ্বারোহণে অক্ষম। তার তাবৎ সাহস, শক্তি ও প্রশিক্ষণ বিলীন হয়ে সেখান উঁকি দিল ভীরুতা এবং যুদ্ধাবেগের স্থান দখল করল যৌবনের উন্মাদনা।

তরুণী দু'টি নৃত্য প্রদর্শন করে চলে যাওয়ার পর এলো চৌদ্দ পনেরো বছরের এক বালক। বালক হলেও তার চেহারা তরুণীদের চেয়ে আরো বেশী মোহনীয়। বালকটি আরো বেশী যৌন উদ্দীপক নৃত্য প্রদর্শন করতে শুরু করল। বালকের সাথে সমান তালে সহযোগী হলো অন্য দু'টি তরুণী। এরা প্রত্যেকেই স্বল্পবসনা। এদের যৌথ নৃত্য উপস্থাপনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল আসেম। তার দৃষ্টি ওদিকেই নিবদ্ধ। আশেপাশের কোন খেয়াল নেই, কে কোথায় কি করছে।

ঠিক এ মুহূর্তে তার কানের কাছে রিনঝিন শব্দ। উপরের দিকে চোখ তুলল আসেম। দেখল, নর্তকীদের মতোই এক উর্বষী যুবতী শ্বেত শুভ্র রুপালী তশতরী হাতে তার সামনে দণ্ডায়মান। হাতে একটি পানপাত্র। তরুণীর ঠোঁটে ঈষৎ মুচকী হাসি, এমন মোহনীয় হাসি কখনও প্রত্যক্ষ করেনি আসেম। তরুণীর স্বলজ্জ গ্রহণের আবেদন আর আপ্যায়নের মাদকীয় ভঙ্গি আসেমকে মর্তে নামিয়ে দিল।

আসেম তরুণীকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, "এটা হয়তো শরাব। আমি শরাব পান করি না। আমি মুসলমান।"

"শরাব নয় শরবত।" আসেমের সামনের টেবিলে তশতরী রেখে শৈল্পিক ভঙ্গিতে পানপাত্র সুরাহী থেকে ভরে দিল তরুণী।

একটা শংকা মনে চেপে রেখেই পানপাত্র হাতে নিল আসেম। চুমু দিল পান পাত্রে। মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করল এক অজানা ভাল লাগার অনুভূতি। আসেম ওমর অনুভব করল এক অভাবিত স্বাদ-তৃপ্তি। সে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল তরুণীর দিকে—আহ্! কি স্বাদ! এ কি শরবত না জান্নাতের নেয়ামত! কিন্তু জিজ্ঞেস করার অবকাশ হলো না। তরুণীর চোখে চোখ পড়তেই ওর মাদকীয় হাসিতে হারিয়ে গেল আসেমের কণ্ঠ। আরো গভীর আবেশে তলিয়ে গেল আসেম। পুনরায় সোরাহী থেকে পানপাত্র পূর্ণ করে দিল তরুণী। অব্যক্ত ভঙ্গিতে নিবেদন করল, পান করুন সম্মানিত মেহমান! আপনাকে পান করিয়ে মাতাল করাই আমার কাজ। ভেসে চলুন স্বপ্নময় আগুনের দিকে। ইত্যবসরে আসেমের সামনে হাজির হল আরো বড় ধরনের একটি তশতরী নিয়ে অনিন্দ্য সুন্দর বালক। এ তশতরিতে ভুনা করা পাখি। তশতরী থেকে ভাপ উঠছে। মন ভুলানো স্বাদের গন্ধ। সে গন্ধে যে কোন ভোজনবিমুখ মানুষও আহারে প্রলুব্ধ হতে বাধ্য।

আশে পাশে একবার চোখ বুলাল আসেম। সমবেত প্রত্যেক মেহমানের সামনে এ ধরনের পাখি ভুনা করা পাত্র রাখা হচ্ছে।

তরুণী ও বালক চলে গেছে। এবার সাগ্রহে আসেম তশতরী থেকে তুলে নিল একটি ভুনা পাখি। এক লোকমা মুখে পুরে চুমু দিল পেয়ালায়। পাখির স্বাদ আর শরবতের তৃপ্তি বিস্মৃত করে দিল আপন কর্তব্য। একের পর এক পাখি আর পানপাত্র ভরে গলাধঃকরণ করতে থাকল আসেম। তৃপ্তির সুখে ভাসতে লাগল অন্য এক আসেম।

এই ফাঁকে বার কয়েক তার কাছে এলো সেই তরুণী ও বালক। খালিপাত্র তুলে নিল আর ভর্তি পাত্র রেখে দিল। সেদিকে খেয়াল ছিল না আসেমের। কতগুলো পাখি আর কত গ্লাস পানীয় পেটে চালান করেছে সে আন্দাজও ছিল না তার। চোখ দুটো গোল হয়ে এলো। মাথা কিছুটা ভারী ভারী মনে হল। খাবার পরিবেশনকারিণী তরুণী তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল একটি কক্ষে। অস্বাভাবিক সুন্দর পরিপাটি সাজানো কক্ষ। বিশাল এক পালঙ্ক। তুলতুলে তোষকের উপর রেশমী গালিচা। আসেম ঠিক মতো পা ফেলতে পারছিল না। কক্ষের দরজায় গিয়ে অনুভব করল, সে হয়তো ভুল করে শাহী কক্ষে ঢুকে পড়েছে। এমন বিলাসী বিছানা সে কল্পনা করতে পারছে না। কিন্তু তরুণী তাকে হাত ধরে বসিয়ে দিল পালঙ্কের উপর। মাথা থেকে পাগড়ী খুলে রেখে দিল পাশের টেবিলে।

"আহ্! যা পান করালে সেটাতো শরবত নয় শরাব!" জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল সে তরুণীর দিকে।

আমরাও মুসলমান। এখানে ওই ধরনের শরাব পান করা হয় না, কাফের বেঈমানরা যেসব শরাব পান করে। আমরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরী। আমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি।" বলল তরুণী।

"আবারো পানপাত্র থেকে গ্লাস ভরে মুখের কাছে ধরল তরুণী। তরুণীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারল না আসেম। পান শেষে যখন গ্লাস রেখে দিল তখণ তরুণী আসেমের গণ্ডদ্বয় হাতে নিয়ে আদুরে স্পর্শে চোখে চোখ রাখল।

"এটাই জীবন জনাব! এটাই ইসলাম! এতে কোন সাজাও নেই কোন দেনাও নেই।" মাদকতা মেশানো ভঙ্গিতে বলল তরুণী।

আসেমের সামনে অর্ধনগ্ন তরুণী। সে তার ভুবন ভুলানো মোহিনী হাসি আর শরীরের মিষ্টি গন্ধে আপ্লুত। আরো ঘনিষ্ঠ হলো তরুণী। আসেম তরুণীর উষ্ণতায় ভুলে গেল নিজের অবস্থান, কর্তব্য ও আত্মপরিচয়। তার মাথা গুলিয়ে গেল কাম তৃষ্ণায়। তার ঈমানের প্রদীপ নিভে গেল মদ, নারীর দমকা ঝাপটায়। ভেসে চলল আসেম আদিমতার নেশায়, জীবনের রঙীন ভেলায়।

সন্ধ্যায় যে সময়টায় মেহমানরা ভোজসভায় আসতে শুরু করে তখন রাজপ্রাসাদে দাউদকে বাতাসকারিণী দুই তরুণীর একজন নির্জন কক্ষে এক প্রৌঢ়কে বলছিল—"মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিশেষ দূত দাউদ বিন নসরকে কি পয়গাম দিয়েছে। সেই তরুণীই নৃত্য চলার সময় আসেম বিন ওমরকে আপ্যায়নে সহযোগিতা করছিল আর প্রৌঢ় লোকটি দাউদের পাশে বসে সবকিছু প্রত্যক্ষ করছিল, আপ্যায়নও গ্রহণ করছিল।

সেই লোকটি দাউদকে বলল, "সুলতান মাহমূদের পয়গামে আপনার ভয় পাওয়ার কি আছে! রাজা আনন্দপাল এবং বিজি রায় মহাশয়দ্বয় আপনার রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাদের প্রতিনিধি হিসেবেই আপনার এখানে রয়েছি আমি। যে কোন সমস্যায় আপনার জন্যে রাজাদের ভরপুর সহযোগিতা নিতে পারব আমি। সুলতান মাহমূদ একজন সাম্রাজ্যবাদী। রাজ্য বিস্তারে হিন্দু মুসলমান তার কাছে সমান। আপনার লাভ ক্ষতিতে তার কিছু যায় আসে না। সে তার নিজের স্বার্থে আপনাকে ব্যবহার করতে চায় মাত্র।"

"আপনি কি আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না?" প্রৌঢ়কে প্রশ্ন করল দাউদ। "আপনাদের সাথে যে মৈত্রীর বন্ধন যে কোন মূল্যে তা অক্ষুণ্ণ রাখতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আপনি কি খেয়াল করেননি, ইসলামের আত্মশক্তিকে আমি কিভাবে বিদায় করেছি আমার প্রশাসন থেকে? আপনি খেয়াল করেননি, মুসলমানদের হৃদয় থেকে আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়াদি আমি কত কৌশলে নির্মূল করছি? আপনাকে কে ধারণা দিল যে, আমি সুলতান মাহমূদের প্রত্যাশা পূরণ করব? দেখুন না ওর জন্যে কি ব্যবস্থা আমি করেছি! যে মেয়েটিকে আমি দূতের সেবায় নিয়োগ করেছি, যে কোন কঠিন আদর্শের অধিকারী পরহেযগার মু'মেনকেও সে তার যাদুকরী কৌশলে ঈমানহারা করতে সক্ষম। তাকে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দিয়ে সেভাবেই তৈরী করেছি। দেখবেন সে দূত বেচারাকে ভেড়া বানিয়ে ছাড়বে।"

“এটাই যথেষ্ট নয় জাহাঁপনা! এই ব্যক্তি যেমন সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা, আমিও সামরিক বাহিনীর অফিসার। আমিও আপনাকে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেই পরামর্শ দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, আপনি সুলতান মাহমূদকে মোটেও পছন্দ করেন না। আপনি এটাও আশা করেন যে, সুলতান মাহমূদের মতো আপদকে দূরে রেখেই যাতে ঠাণ্ডা করে দেয়া যায়। এজন্য আপনি এই দূতকে ব্যবহার করতে পারেন। আপনি দূতকে বলে দিন, সুলতান মাহমূদের অগ্রাভিযানে তার সৈন্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন আপনি। এ আশ্বাসের ভিত্তিতে ওরা যখন এগিয়ে আসবে, তখন আনন্দপালকে বলে তার সৈন্যদের আমি সুবিধা মতো জায়গায় বসিয়ে রাখবো। ধারণাতীতভাবে আনন্দপালের সৈন্যরা ‘খেল খতম’ করে দেবে।”

“দূতের ব্রেন ওয়াশের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। দেখেননি, শরবত মনে করে কতো গ্লাস খাঁটি মদ গিলেছে বেটা। এরপর যেটুকু হুঁশ-জ্ঞান থাকবে সেটুকুও দূর হয়ে যাবে মেয়েটির কৌশলী পরিচর্যায়।” বলল দাউদ।

আসেম ওমরের চার দেহরক্ষী দাউদ বিন নসরের দেহরক্ষীদের সাথে আহার করল। ওরা ঘুর্ণাক্ষরেও জানল না, তাদের দূত দাউদ বিন নসরের বালাখানায় এক রাতের স্বর্গবাসে মত্ত।

যে আসেমের ঘুম ভাঙতো অতি প্রত্যুষে, সেই আসেম সূর্যোদয়ের সময়ও গভীর ঘুমে তলিয়ে রইল। বেলা অনেক উপরে উঠার পর চোখ মেলল আসেম। চোখ মেলেই ঘাবড়ে গেল সে। গত রাতের ঘোর কেটে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠল তার কাছে। ঠিক এ সময়ে ঘরে প্রবেশ করল সেই তরুণী। তার মুখে স্মিত হাসি আর হাতে তশতরী।

আসেম তাকে লক্ষ্য করে বলল, “গত রাতে তুমি আমাকে গোনাহগার করে দিলে। এখানে আমি বিশেষ এক কাজে এসেছিলাম।” কিছুটা আতংকিত কণ্ঠ আসেমের।

তরুণী তশতরী টেবিলের উপর রেখে দুধের একটি গ্লাস আসেমের হাতে ধরিয়ে দিল কিন্তু আসেম টেবিলে রেখে দিল গ্লাস। বলল, “গত রাতে কি ঘটেছিল তা না বলা পর্যন্ত তোমার হাতের কিছুই আমি স্পর্শ করব না।”

“তুমি জাহান্নাম থেকে জান্নাতে এসেছো! বুঝলে? এটার নাম জীবন, এটাই জিন্দেগী। বেঁচে থাকার সার্থকতা এখানেই।” বলল তরুণী।

এমন সময় এক শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রুধারী দীর্ঘ জুব্বা পরিহিত সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ প্রবেশ করল সে কক্ষে। স্বগতোক্তি করতে লাগল—“হতভাগ্য তোমাদের বাদশা! যাকে তোমরা সুলতান বলে থাকো। তার প্ররোচনায় জীবনের এই স্বাদ এই প্রাপ্তিকে তোমরা পাপ বলছো। অথচ জীবনে এতটুকু ভোগ করার অধিকার তোমাদের প্রাপ্য। কিন্তু সে তোমাদের জীবনকে বিষাদময় করে দিয়েছে। জীবনের

স্বাদকে তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অগণিত প্রাণের বিনিময়ে নিজের স্বর্গবাসকে নিশ্চিত করতে চায় সে। এজন্য তোমাদের দিয়ে সে যুদ্ধ করায়, রক্তের হোলি খেলে। আর নিজে থাকে নিরাপদে। কে তোমাদের বলেছে যে, ইসলামে আরাম-আয়েশ, এতটুকু বিনোদন হারাম?" বৃদ্ধের বলার ঢং এবং ভাষার কারুকাজ এতো নিপুণ এবং কণ্ঠ এতো মধুর যে, আসেম ওমর রাতের তরুণীর মতো বুড়োর কাছে নিজেকে কখন সপে দিল টেরই পেল না। সে এতোটাই বুড়োর কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়ল যে, বুড়োর প্রতিটি কথাকে তার মনে হচ্ছিল জীবনের প্রতিচ্ছবি, সত্য ও বাস্তবতার প্রতীক।

আসলে এটা মানুষের সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা। পাপ যখন পূর্ণ অবয়বে মানুষকে গ্রাস করে ফেলে তখন তার সাধারণ বোধটুকুও লোপ পেয়ে বসে, পাপকাজকেই তখন আকর্ষণীয় মনে হতে থাকে। পাপ কাজের পক্ষে তখন যুক্তি খুঁজে ফিরে মানুষের মন। অপরাধকে যৌক্তিকতার লেবেল এঁটে আরো অপরাধের গভীরে তলিয়ে যেতে যুক্তি সংগ্রহ করে মানুষ। আসেম ওমরের মন থেকেও ইসলামের বিধি-নিষেধ লোপ পেয়ে গেল। ভোগবাদিতায় গা ভাসানোর জন্যে তার পক্ষে দরকার ছিল কিছু যৌক্তিক সাপোর্ট। কিন্তু তা আসেমের মাথায় ছিল না। এই পণ্ডিত লোকটি সেই হারামকে হালাল করণের যৌক্তিক ভিত্তিগুলোই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছিল। আসেমের এ মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল ভোগবাদের পক্ষে এ ধরনের যৌক্তিক বিশ্লেষণ। বুড়ো তাই পরিবেশন করছিল। আরো নিবিড়ভাবে গ্রহণ করতে শুরু করল আসেম বুড়োর যুক্তিগুলো।

আসেম ওমর ছিল সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর অন্যতম সেরা কমান্ডার। তাকে বিপথগামী করতে পারলে সহজেই সুলতান বাহিনীর বড় একটি অংশকে যুদ্ধবিমুখ করা সম্ভব। সে লক্ষ্যকেই সামনে রেখে হিন্দু রাজা আনন্দপাল ও বিজি রায়ের নিয়োজিত প্রতিনিধির সাথে পরামর্শ করেছিল দাউদ।

আসেম ওমর কুচক্রীদের ফাঁদে ফেসে গেল। তার কাছে দাউদ পয়গাম পাঠাল, আজ রাজকীয় মেহমান হিসেবে গজনীর বিশেষ দূতকে শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলোতে নিয়ে যাওয়া হবে। আসেমের জন্যে রাজকীয় ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। যে গাড়িতে স্বয়ং দাউদ চড়ে থাকে। গাড়িটি চারটি বিশেষ ঘোড়া টেনে নেবে। সাথে দেয়া হলো দাউদের বিশেষ নিরাপত্তা রক্ষীদের ক'জন। বিশেষ পোশাকে সজ্জিত এরা। আসেমকে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম হলো সমুদ্রতীরের মনোরম দর্শনীয় জায়গায়।

রাজকীয় বিলাসী ব্যবস্থাপনায় আসেম ভুলে গেল নিজের কর্তব্য কাজ। সে এখন নিজেকে বিশেষ সম্মানিত বোধ করতে লাগল। তার মধ্যে জন্ম নিল রাজারাজা মনোভাব। সাথীদের খোঁজ-খবর নেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করল না

সে। তারা কোথায় আছে, কিভাবে আছে, সে খবর নেয়ার সুযোগ তার নেই। ওদেরকেও রাজপ্রাসাদ থেকে জানিয়ে দেয়া হলো, আজ তাদের দূতের ভ্রমণের প্রোগ্রমা করা হয়েছে। ইচ্ছে করলে তারাও এই সুযোগে শহর ঘুরে দেখতে পারে। সুযোগ পেয়ে তারাও শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ল।

* * *

একজন ভাবগম্ভীর, সুদর্শন বুযুর্গ লোকই মনে হচ্ছিল তাকে দেখে। পরিধেয় পোশাক, মুখের দাড়ি আর কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল, লোকটি বড় ধরনের আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি। একটি উঁচু দেয়াল ঘেরা বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে থেমে গেল, যখন তার চোখে পড়ল চারজন সৈনিক ধরনের লোকের আগমন। ওদের পোশাক দেখেই তিনি আন্দাজ করেছিলেন, এরা মুসলমান সৈনিক এবং এখানে নবাগত। এদের মুলতানের অধিবাসী মনে হলো না, ভারতীয় মনে করাও কঠিন। বুযুর্গ লোকটি চারজনের পথ রোধ করে দাঁড়াল। মুচকি হেসে বলল, "আপনারা গজনীর অধিবাসী?"

তারা চারজন থেমে গেল এবং হেসে হ্যাঁ সূচক জবাব দিল।

"আপনারা কি একটু সময়ের জন্যে আমার ঘরে আসবেন?" আমাকে আপনাদের মেহমানদারী করার সুযোগ দিয়ে ধন্য করবেন?" ফারসী ভাষায় বললেন তিনি।

"পরবাসে নিজের মাতৃভাষার আহ্বানের কালবিলম্ব না করে সবাই তার অনুগামী হল। আপ্যায়নের ফাঁকে অতিথিরা জানাল তারা কমান্ডার আসেম ওমরের নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে গজনী থেকে এখানে এসেছে। কমান্ডার আসেম ওমর সুলতানের বিশেষ বার্তা নিয়ে দাউদ বিন নসরের এখানে এসেছেন।

"আসেম ওমর এ মুহূর্তে কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন বুযুর্গ।

"আমরা তাকে শাহী গাড়িতে সওয়ার হয়ে ভ্রমণে বের হতে দেখেছি।" জবাবে বলল এক নিরাপত্তারক্ষী।

"আমি আসেম ওমরের সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলাম কিন্তু জানতে পারলাম, সে এখন তার নিরাপত্তারক্ষীদের সাথেও সাক্ষাতের প্রয়োজন বোধ করছে না।" বলল লোকটি।

"কেন? কি হয়েছে?" বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জানতে চাইল এক নিরাপত্তারক্ষী। "এমন কিছু ঘটেনি তো যে তাকে বন্দী করে ফেলা হয়েছে? আর বন্দিশালায় না খেয়ে কষ্ট যাতনায় মৃত্যুবরণ করতে হবে তাকে!"

"সে বন্দিদশা অনেক ভাল যে বন্দিদশায় মানুষ কষ্ট দুর্ভোগ পোহায়, কষ্ট যাতনায় মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু যে জিঞ্জিরে আপনাদের কমান্ডারকে বাধা হয়েছে, তা খুব জটিল। এই জিঞ্জিরে মানুষ কষ্ট পায় না বটে কিন্তু তার ভিতরের বিবেক

বোধ, ঈমানী শক্তি মরে যায়, সৈনিকের মধ্যে জন্ম নেয় ভীরুতা। এটা এমন এক জিঞ্জির যা হলো নারীর রেশমী চুল আর ষোড়শী যুবতীদের দেহবল্লরীর মাদকতার বাঁধন। যে কোন সৈনিক এ ধরনের বন্দিদশার শিকার হলে সে সৈনিকের আর যুদ্ধ করার মুরোদ থাকে না, সে হয়ে পড়ে নারীর আঁচলে বাধা পোষা জন্তু। আচ্ছা, গতরাতের নৈশভোজে কি আপনারাও অংশগ্রহণ করেছিলেন?"

"না। আমাদেরকে ভিন্নভাবে খাবার দেয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে আমাদের নেয়া হয়নি।" বলল এক নিরাপত্তাকর্মী।

"ওকে গতরাতে শরাব পান করানো হয়েছে এবং গতরাত সে এমন এক যাদুকন্যার বাহুডোরে ছিল যাকে এক কথায় আমরা মায়াবিনী বলে জানি।" বললেন বুযুর্গ।

"আপনিও কি সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন?"

"না, আমি ওখানে যাইনি। দাউদ শাহীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার কান ও চোখ সময় সময় শাহী মহলের দিকে তাক করা থাকে। ভিতরের সব খবর আমার জানা। দাউদের কাছে আসেম কি পয়গাম নিয়ে এসেছে সে খবরও আছে আমার কাছে।"

"তাহলে ভয়ের ব্যাপারটি কি?"

"আশংকার ব্যাপার হলো, আসেম সুলতানের বিশেষ দূত হিসেবে এসেছে বটে, কিন্তু সে দাউদ ও হিন্দুরাজাদের কাছে আত্মবিক্রি করে তাদের চর হিসেবে গজনী ফিরে যাবে। আসেম সুলতানের জন্যে এক কঠিন প্রতারণার ফাঁদে পরিণত হবে। আমি ভাবছিলাম, কি করে আসেম অথবা আপনাদের সাথে সাক্ষাত করি। কোন সুযোগই করতে পারছিলাম না। সৎ উদ্দেশ্য থাকলে যে কোন কাজে আল্লাহ্ সাহায্য করেন। আপনারা শহর দেখতে বের হলেন, আর এই সুযোগে আল্লাহ্ আপনাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ করালেন। আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা এখন দূর হয়ে গেল।"

"আমাদেরকে বলা হয়েছে, মুলতান একটি ইসলামী রাজ্য।" বলল একজন নিরাপত্তারক্ষী। অপর একজন বলল, "মুসলমান হওয়ার কারণে সুলতান সুবক্তগীনের সময় থেকেই দাউদ বিন নসর আমাদের সুহৃদ।"

"আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি এই ভেবে যে, সবকিছু জানা থাকার পরও সুলতান মাহমূদ কি করে আপনাদের এখানে পাঠালেন এবং প্রকৃত অবস্থা গোপনে রাখলেন!"

"তো আমার কাছ থেকে জেনে রাখুন। যাতে আপনারাও আপনাদের কমান্ডারের মতো ওদের জালে আটকা না পড়েন।"

“........মুলতানের শাসন ক্ষমতা কেরামতীদের হাতে। এরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে বটে কিন্তু তাদের আকীদা বিশ্বাস সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। যেমন এরা আখেরাত বিশ্বাস করে না। এরা বিশ্বাস করে, বেহেশত দোযখ দুনিয়াতেই। আখেরাতে শাস্তি-পুরস্কার বলতে কিছু নেই। এরা ইসলামের হারাম হালালকে অস্বীকার করে। ব্যভিচার ও মদপানে উৎসাহিত করে। তারা মনে করে, মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিই করেছেন ভোগ-বিলাসের জন্যে এবং ইসলামের হারাম হালালের বিষয়টি সম্পূর্ণ অবান্তর। এরপরও মুসলমানদের ধোঁকা দিতে এরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে। প্রকৃত পক্ষে এরা হিন্দু, খ্রীস্টান ও ইহুদীদের চেয়েও জঘন্য, ছদ্মবেশী ভয়ংকর দুশমন। আব্দুল্লাহ এবং মাইমুন নামের দু' আরব এ মতবাদের উদ্ভাবক। কোন আরব দেশ থেকে তৃতীয় হিজরী শতকে এদের উত্থান শুরু। তবে এই মতবাদের মূল জনক এক খ্রিস্টান যাজক। ইহুদীদের সমর্থন ও সহযোগিতাও রয়েছে এদের পিছনে। কারো মতে ইরানের এক বড় অংশ এই কেরামতী মতবাদের অনুসারী।...

এ থেকেই বোঝা যায়, এই বাতিল ফেরকা কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলাম যখন রোম সাগর পেরিয়ে অর্ধেক পৃথিবী তৌহিদের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলে, তখন খ্রিস্টান ও ইহুদী পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের টনক নড়ে। এরা বুঝেছে, কোন সত্য ধর্মকে তার অনুসারীদের হত্যা করে নিঃশেষ করা যায় না। তারা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছে, সত্য ধর্মের অনুসারীদের যদি ধর্মের আবরণে বিভ্রান্ত করা যায় তবেই তাদের ঈমানী শক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়া সহজ। এ হলো একটা পদ্ধতি। অন্য পদ্ধতি হলো, সেই ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও শাসকবর্গকে ধর্ম-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করা। শাসকদেরকে ভোগবাদী ও বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলা।......

মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো দৈহিক চাহিদা। যৌন চাহিদা মানুষের সহজাত বিষয় এবং তা পবিত্র বিধিমালার আওতায় প্রশংসনীয় বটে কিন্তু এটাই আবার বিধি-নিষেধের পরিপন্থী পন্থায় চরিতার্থ হলে চরম কদর্য হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্র কাছে তা মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। তাই আমাদের চির শত্রুরা আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও শাসকবর্গকে বিপথগামী করতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করেছে নারী, মদ ও বিত্ত-বৈভব।

ইহুদী খ্রিস্টানরা আব্দুল্লাহ্ ও মাইমুনকে অপরিমেয় ধন-সম্পদ ও তাদের প্রশিক্ষিত নারী সরবরাহ করে ভৃত্যে পরিণত করে। এরা এদেরকে ব্যবহার করে মুসলিম শাসকবর্গকে বিলাসী ভোগবাদিতায় অভ্যস্ত করতে সক্ষম হয়। ওদের কাজকর্ম সম্পূর্ণ ইসলাম বিবর্জিত হলেও সব বিষয়ে ইসলামের লেবেল এঁটে দেয়। যার ফলে মুসলমানরা বিভ্রান্তির শিকার। দৃশ্যত এরা ইসলামের নাম ব্যবহার করে

ভিতরে ভিতরে ইসলামের মৌল আকীদা, হারাম-হালাল, পরকালের আযাব-গযব ও জবাবদিহিতার অনুভূতিটুকুও মানুষের মন থেকে মুছে দিতে তৎপরতা চালায়। আর প্রচার করে, এটাই প্রকৃত ইসলাম। ধর্মান্ধ মুসলমানরা নাকি ইসলামের প্রকৃত রূপ বদল করে মানুষের কাছ থেকে ভোগবাদিতার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। কত জঘন্য এদের কর্মকাণ্ড। কারামাতীরা প্রচার করে, মৃত্যুর পর জান্নাত জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। এই সবই নাকি আলেমদের মনগড়া বিষয়। প্রত্যেক মুসলমানের মৌলিক অধিকার রয়েছে দুনিয়াতে সবকিছুর স্বাদ নেয়া এবং ভোগ করার। দুনিয়াতেই জান্নাত জাহান্নাম। যে কেউ ইচ্ছে মতো তার জীবনকে জান্নাতী সুখে ভরে নিতে পারে।......

স্বভাবতঃ মানুষ ভাল কাজের দিকে ধীর লয়ে অগ্রসর হয়, কখনও পিছিয়েও আসে। কিন্তু মন্দ কাজের প্রতি মানুষ খুব দ্রুত অগ্রসর হয়। কারামাতীরা মানুষের এই সহজাত শক্তিটাকে কৌশলে ব্যবহার করছে। ২৯০ হিজরী সনে কারামাতীরা সিরিয়ার ব্যাপক জনসংখ্যাকে বিভ্রান্ত করে সেখানে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটাতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে সেখানে তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। ৩১১ হিজরী সনে এরা বসরা ও কুফা শহরে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালিয়ে শহর দু'টিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। আবু তাহের নামের এক কুখ্যাত দস্যুকে তারা সে সময় ক্ষমতায় বসিয়ে মক্কা মুয়াজ্জিমাকেও দখলে নিতে সক্ষম হয়েছিল এই কেরামতী গোষ্ঠী।

কারামাতীরা এক পর্যায়ে পবিত্র হাজরে আসওয়াদকে কা'বা গাত্র থেকে সরিয়ে বসরায় স্থানান্তরিত করে। প্রায় বিশ বছর হাজরে আসওয়াদ বসরায় ছিল ওদের কব্জায়। এরপর আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দিতে শুরু করেন। হালাকু খান ওদের মৃত্যুদূত হিসেবে আভির্ভূত হন। হালাকু খানের আক্রমণে কারামাতীদের অধিকাংশ অনুসারী নিহত হয়। যারা বেঁচে থাকে তারা পালিয়ে ইরানে পাড়ি জমায়। ইরানেও ওরা স্থির থাকতে পারেনি। ইরানী স্থানীয়দের তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে এসে বসতি স্থাপন করে। ওই বিতাড়িত কারামাতীদের উত্তরসূরীদেরকেই আজ আপনারা দাউদ বিন নসরের সুরতে দেখছেন।

দাউদ বিন নসরের দাদা আহমদ খান কারামাতী মুলতানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। সে ইসলামের সহীহ আকীদায় বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে হত্যা করে, জুলুম অত্যাচার চালিয়ে এমন ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে, ওদের মোকাবেলায় দাঁড়াবার মতো কেউ আর বেঁচে ছিল না। সকল প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তিকে নিঃশেষ করে কারামাতীরা প্রচার করতে শুরু করে, আমরা যে ইসলাম প্রচার করি সেটিই সত্যিকার ইসলাম। অত্যাচার উৎপীড়ন ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আহমদ খান একটি অনুগত গোষ্ঠী তৈরি করে নেয় এবং মুলতানে কারামাতী শাসন

প্রতিষ্ঠা করে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের স্মৃতিবাহী এই মুলতান। সারা দুনিয়ার ইহুদী খ্রিস্ট শক্তি এদের সহযোগী। কিন্তু বাইরে থেকে মুসলমানরা এদের অপকর্ম ততোটা অনুধাবন করতে পারে না বলে এদেরকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পদাঙ্ক অনুসারী মনে করে বিভ্রান্তির শিকার হয়। প্রকাশ্যে এরা হিন্দুদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখলেও নেপথ্যে দাউদ বিন নসর হিন্দুদের প্রধান সহযোগী এবং হিন্দু পৃষ্ঠপোষকতাই তার প্রধান শক্তি। কারামাতীদের দীর্ঘ ইতিহাস আপনাদেরকে এজন্য শুনাচ্ছি যে, যদি দাউদ সুলতানকে সহযোগিতার ওয়াদা করে তবে তা মারাত্মক প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনারা যাতে এদের ভালভাবে চিনতে পারেন এজন্যই আমার এতোসব বলা।"

"আসেম ওমর কি পয়গাম নিয়ে এলেন এ ব্যাপারে আপনি অবগত হলেন কিভাবে?" প্রশ্ন করল এক নিরাপত্তাকর্মী। "আপনি কি করে জানলেন, রাতের বেলায় সে মদ পান করেছে? আপনি কি এখানে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করছেন?"

"না। আমি কোন গোয়েন্দা নই। আমি সুলতান মাহমূদেরও নিয়োগকৃত গোয়েন্দা নই। আমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের আত্মার সন্তান। তাঁরই উত্তরসূরী। আমরা সেই মহান ব্যক্তিদের বংশজাত মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে যারা এখানে এসে সত্যিকার ইসলাম প্রচারে আত্মনিবেদন করেছিলেন। আমরা কারামাতীদের বিপরীতে সত্যিকার ইসলাম প্রচারে গোপন সংগঠন গড়ে তুলেছি। আমাদের নিজস্ব লোক রাজমহলের ভিতরে কাজ করে। ভিতরের সকল সংবাদ তাদের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি। দাউদ বিন নসর ব্যক্তিগতভাবেও জানে, তার বিরুদ্ধে একটি গোপন শক্তি সক্রিয় রয়েছে, কিন্তু সে আমাদের কখনও চিহ্নিত করতে পারেনি। আমরা খুবই সতর্কভাবে কাজ করি। আমাদের প্রত্যেক সদস্য সুশিক্ষিত, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। পুরুষ ছাড়াও অনেক মহিলা রয়েছে আমাদের সংগঠনে। তারা প্রত্যেকে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী। তারা সৎ, আমানতদার ও পরহেজগার। দাউদ যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযানের পরিকল্পনা করে তবে আগেই আমরা এর খবর পেয়ে যাই, তার পক্ষে আমাদের কার্যক্রম চিহ্নিত করা মোটেই সহজ নয়।"

"এখন আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?"

"আগে আপনাদেরকে এ বিষয়টি বুঝতে হবে, দাউদ আপনাদের সুহৃদ নয়, সে হিন্দুদের সুহৃদ। সেই সাথে আপনাদের দূতবেশী কমান্ডারের উপরও ভরসা ত্যাগ করতে হবে। সে যদি সুলতানের কাছে মুলতানে সেনা অভিযানের পরিকল্পনা পেশ করে তবে আপনারা সুলতানকে দাউদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে বলবেন। তিনি যদি হিন্দুদের পদানত করতে সেনা অভিযানে আগ্রহী হন তবে সর্বাগ্রে মুলতানের কারামতী আখড়াকে নির্মূল করতে হবে।

আমি আপনাদের এ আশ্বাস দিচ্ছি, ইসলামের নামে প্রতারণা করে কেউ রক্ষা পায়নি। দাউদেরও শেষ রক্ষা হবে না। যারাই ইসলামের নামে প্রতারণা করেছে ধ্বংস হয়েছে। দাউদের ধ্বংসও অনিবার্য।"

"তাহলে আমাদের আগে দেখতে হবে, কমান্ডার আসেম ওমর কি করেন।" বলল এক নিরাপত্তারক্ষী। "তিনি তো দাউদের ফাঁদে পা নাও দিতে পারেন। যদি দেখি তিনি দাউদের ফাঁদে পা দিয়েছেন, তাহলে আপনি যা বলেছেন সে তথ্য সুলতানকে জানাব।"

* * *

দাউদ বিন নসরের সামনে উপবিষ্ট আসেম ওমর। তাদের সামনের টেবিলে একটি মানচিত্র।

"এ মানচিত্র আপনি সাথে নিয়ে যেতে পারেন।" বলল দাউদ। "আমি আপনাকে সুলতানের সেনাবাহিনীর জন্যে নিরাপদ পথ বলে দিলাম। চুন্নাব নদী পার হওয়ার জায়গাটিও বলে দিয়েছি।"

"আপনি যে পথের কথা বললেন, সে পথে আনন্দপাল ও বিজি রায়ের সৈন্যরা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। আমার কাছে তো পথটি অনিরাপদ মনে হচ্ছে। এ জটিল পথে আপনি কিভাবে আমাদের নিরাপত্তা দেবেন?" বলল আসেম।

দাউদের উত্তরে আশ্বস্ত হতে পারল না আসেম। দাউদের কথা ও তার প্রতিশ্রুতিকে সামরিক দৃষ্টকোণ থেকে যাচাই করতে শুরু করল আসেম। আসেমের মনে দাউদের কথায় সন্দেহ উঁকি দিল। সন্দেহ নিরসনকল্পে বহু প্রশ্ন করল আসেম। আসেমের অভাবিত জিজ্ঞাসায় দাউদ ভেবাচেকা খেয়ে গেল।

"আর কদিন কি এখানে আছেন না আপনি?"

"কর্তব্যের খাতিরে আমাকে যেতে হচ্ছে। নয়তো আমার আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছিল না।"

"কর্তব্যের ব্যাপার হলে সেই কর্তব্য আমি যেভাবে বলি সেভাবে পালন করুন। আপনি সুলতানকে এ পথে এনে আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। আপনি আমাদের এখানে এলে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব সোপর্দ করা হবে আপনাকে। আর আরাম-আয়েশ যা পাচ্ছেন সেসব সব সময়ের জন্যে স্থায়ী করে দেয়া হবে।"

"আপনি যদি মাহমূদকে আমাদের পাতানো ফাঁদে আটকে দিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে এ অঙ্গীকার দিচ্ছি, আমার রাজ্যের কিছু এলাকা ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন শাসন কাজ চালানোর ব্যবস্থা করে দেবো আপনাকে। যুদ্ধ ময়দানে এতো কৃতীত্ব অর্জনের পর জীবনে কিছুটা আরাম-আয়েশ করার অধিকার অবশ্যই আপনার আছে। মানুষতো আর দুনিয়াতে বার বার আসে না!"

শ্বেত শুভ্র শ্মশ্রুধারী লোকটি যে ধরনের কথা বলেছিল দাউদের মুখেও সে ধরনের কথা শুনতে পেল আসেম। দাউদ বলল, "হিন্দুদের চেয়ে পরোপকারী কোন সুহৃদ আপনি ইহজগতে পাবেন না। আপনি হিন্দুদের সাথে মিশে দেখুন না! সুলতানের ইচ্ছার বলি হয়ে জীবনটাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে কি লাভ? আগামীকাল সকালেই চলে যান। সুলতানকে গিয়ে বলুন—দাউদ বিন নসর আপনাকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছে এবং অগ্রাভিযানের পথও বলে দিয়েছে।"

সেই দিন বিকেলের ঘটনা। আসেম ওমর তার কক্ষে চার নিরাপত্তারক্ষীকে ডেকে পাঠাল। তাদের বলল, "আগামীকাল সকালেই আমি রওয়ানা হবো।" আসেম তাদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়ে বিদায় করল।

তারা মহলের একটি গলিপথে নিজেদের থাকার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। এমন সময় পিছন দিক থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারা একটি মহিলাকে তাদের দিকে আসতে দেখল। মহিলাটি তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দিকে না তাকিয়েই অনুচ্চ আওয়াজে নিজের ভাষায় ও ইঙ্গিতে বলল, "তোমাদের একজন এখনই ওই বুযুর্গ ব্যক্তির বাড়িতে চলে যাও, যার বাড়িতে তোমরা মেহমান হয়েছিলে।" মহিলাটি আর কোন কথা না বলে তার মতো করে ওদের অতিক্রম করে চলে গেল।

তাদের একজন তখনই গিয়ে সেই বুযুর্গ ব্যক্তির দরজায় কড়া নাড়ল। তিনি নিজেই দরজা খুলে তাকে ভিতরে নিলেন।

"আসেম ওমর কেরামাতীদের ফাঁদে আটকে গেছে।" বললেন বুযুর্গ। "সে দাউদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তি মতো তাকে একটি মানচিত্র দিয়ে দেয়া হয়েছে, যে পথে সুলতানের বাহিনী নিয়ে আসবে সে। আপনারা আগামী কাল সকালেই এখান থেকে রওয়ানা হচ্ছেন। আপনারা সুলতানকে গিয়ে বলবেন, যাকে আপনি মুসলমান ও সুহৃদ মনে করছেন সে শত্রুতায় হিন্দুদের চেয়েও জঘন্য। কোন অবস্থাতেই আসেমের বলা পথে সেনাভিযানের চিন্তা যেন সুলতান না করেন। আপনি জলদি এ দেশ থেকে চলে যান। পথে কোন সময় নষ্ট করবেন না।"

"আচ্ছা ওই মহিলাটি কে? যিনি আমাদের একজনকে আপনার সাথে দেখা করার সংবাদ দিলেন?" জিজ্ঞেস করল নিরাপত্তারক্ষী।

"সে এক ভাগ্য বিড়ম্বিতা নারী।" বললেন বুযুর্গ।

"আপনারা হয়তো তার সৌন্দর্য দেখে থাকবেন। তাকে তার মা বাবা মোটা অংকের পণ্যের বিনিময়ে এক চরিত্রহীন ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে বিয়ে দেয়। লোকটি দাউদের সাথে সুসম্পর্ক অটুট রাখার স্বার্থে নিজের স্ত্রীকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেয়। দাউদ দু'বছর তাকে হেরেমে রেখে রাজকর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে।

মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই বুদ্ধিমতি, পড়া লেখাও জানে। সে ছিল আমার মেয়ের সহপাঠিনী। এই সুবাদে সে আমার বাড়িতে প্রায়ই আসে। আমার মেয়ের সাথে সময় কাটায়, কথাবার্তা বলে। ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য প্রথম দিকে সে খুব কান্নাকাটি করতো, কিন্তু আমার মেয়ের মাধ্যমে আমি তাকে যখন বলেছি, এই জাহান্নামের ভিতরে থেকেও তুমি ইচ্ছে করলে ইসলামের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পার, তখন সে দুঃখ বুকে চেপে আমাদের সহযোগিতা করতে শুরু করে। এর মাধ্যমে সব ধরনের শাহী ফরমান ও পরিকল্পনা আমরা আগেই জানতে পারি। সে যথাসময়ে আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছে দেয়। প্রশাসনিক কাজে সে খুবই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে এবং নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তা হিসেবে রাজমহলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ দাউদ বিন নসর যখন আসেমকে ডেকে একান্তে হিন্দুদের তৈরী মানচিত্র দিয়ে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকাতে রাজ্যদানের টোপ দিল তখন এই মেয়েটি তাদেরকে পানীয় ও শরাব পরিবেশন করছিল। দাউদের একান্ত সচিব হিসেবে কাজ করে এই মেয়ে। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল তাদের কথাবার্তা। ওখানকার কাজ শেষ হলেই সে আমার এখানে এসে সব বলে গেছে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সুলতানকে আপনার আস্থায় নেয়া যে, আসেম ওমর যে প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছে তা প্রতারণার ফাঁদ আর আপনি যা বলবেন তা সঠিক।"

"এই মহিলা কি নিয়মিত আপনার নিকট যাতায়াত করে?" জিজ্ঞেস করল নিরাপত্তারক্ষী। "সে কি রাজমহল থেকে বের হওয়ার সুযোগ পায়? তাকে কোথাও পাঠিয়ে দেয়ার কথা কি আপনি কখনও ভেবেছেন? কোন মুসলমান যদি ওকে নিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চায় এবং বিয়ে করে। তা কি সম্ভব?"

"অনেকবার ওকে এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার কথা ভেবেছি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য এমন কোন মুসলিম যুবক পাইনি যে তাকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সংসার গড়তে পারে। আজকেও সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনাদের কেউ যদি সাহস করেন তবে সে আপনাদের কারো সাথে গজনী চলে যেতে আগ্রহী। ওকে কেউ বিয়ে না করলেও কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সেবা করেও জীবন কাটিয়ে দিতে রাজী।"

"আমরা ওকে সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু সবার গোচরে ওকে নিয়ে পথ চলা মুশকিল হবে। ওকে যদি আমাদের যাত্রা পথের কোন জায়গায় শহর থেকে দূরে কোথাও আমাদের সাথে মিলিত করা যায় তবে সাথে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। অবশ্য আসেম ওকে সাথে নিয়ে যেতে বাঁধ সাধবে। সে দিকটা আমরা সামাল দেবো।" বলল নিরাপত্তারক্ষী।

"পরদিন খুব ভোরে সূর্যোদয়ের অনেক আগেই কমান্ডার আসেম চার সঙ্গীকে নিয়ে গজনীর পথে রওয়ানা হল। তাদের সাথে নতুন যোগ হলো দাউদ বিন নসরের

উপঢৌকন বোঝাই করা একটি উট। এক সৈনিকের বর্শার সাথে বেঁধে দেয়া হল সাদা পতাকা। যা শাসকদের পক্ষ থেকে দেয়া তাদের জন্যে নিরাপত্তার প্রতীক।

আসেমের কাফেলা শহর অতিক্রম করে নদী পেরিয়ে গেল। আসেম ওমর আসার সময় সাথীদের সাথে নানা খোশগল্পে পথ অতিক্রম করেছিল। সঙ্গীরা ও তার মধ্যে তেমন কোন আভিজাত্যের বিভেদ ভাব ছিল না তখন। কিন্তু ফেরার পথে সেই আসেম অন্য মানুষ। এখন সে সবার থেকে আগে আগে চলছে। কারো সাথে কোন গল্প করার মনোভাব তার নেই। কথা দু'চারটি যা বলছে, সেগুলোর সবই হয়তো সঙ্গীদের প্রতি নির্দেশ নয়তো দিক নির্দেশনামূলক। তার মধ্যে এখন রাজকীয় ভাব। মাথাটা যেন আগের চেয়ে উঁচু হয়ে গেছে এক হাত। আচরণে স্পষ্ট অহমিকার ছাপ।

সূর্য প্রায় ডুবুডুবু অবস্থা। একটা ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার ভিতর দিয়ে তারা যাচ্ছে। আসেম তাদের থেকে অনেকটা আগে। হঠাৎ এক সাথী অন্যদের ইশারায় বলল, দেখো তো ঝোঁপের আড়ালে দু'টি লোকের অবস্থান মনে হয় কি-না। ওদের চোখ এবং দেহের কিছু অংশ আবছা অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল। অন্যরাও তাকে সমর্থন করল এবং বলল, মনে হয় বুযুর্গ ব্যক্তি সেই মহিলাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

তারা গত রাতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ হলো। তাদের একজন ঘোড়া থামিয়ে ধীরে ধীরে ঘনজঙ্গলের দিকে অগ্রসর হল। বাকীরা আসেমের অনুগামী হল। সৈনিক একটু অগ্রসর হলেই সেই যুবতীকে দেখতে পেল। সে একটি ঘোড়ায় আরোহিত। সাথে একজন পুরুষ। লোকটি যুবতীকে সৈনিকের কাছে সোপর্দ করে নীরবে চলে গেল। যুবতীকে নিয়ে সৈনিক কিছুক্ষণ সেখানেই বসে রইল। এরা চোখের ভাব বিনিময় ও মুচকি হাসি ছাড়া কেউ কারো কথা পরিষ্কার বুঝতে পারে না। যুবতী ও সৈনিকের ভাষা ভিন্ন। যুবতী যখন ইঙ্গিতে সৈনিককে বলল চলুন, তখন সৈনিক তাকে চুপ করে বসে থাকতে অনুরোধ করল।

সূর্য ডুবে চারদিকে অন্ধকার নেমে এলো। সাথীদেরকে তাঁবু টাঙ্গিয়ে বিশ্রামের নির্দেশ দিল আসেম। আসেম যখন দেখলো, লোক একজন কম তখন অন্যদের জিজ্ঞেস করল, সে কোথায়? সবাই বিস্ময় প্রকাশ করল এবং অবজ্ঞাও দেখালো কিছুটা। বলল, সব সময় পিছনে পিছনে থেকেছে। বলছিল তার কাছে নাকি মুলতান খুবই ভাল লেগেছে। সে থেকে যাবে। আরেকজন বললো, কে জানে কোন বারবণিতাকে নাকি ভাল লেগেছে তার। ওখানেই ফিরে গেছে হয়তো।

আসেম ওদের প্রতি খুবই ক্ষোভ প্রকাশ করল। ওরাও আসেমের কথায় দৃশ্যত অনুতাপ করল। একজন বলল, "ওকে খোঁজা অর্থহীন। পশ্চাদ্ধাবন করেও কোন লাভ নেই। কে জানে কখন পালিয়েছে। আমরা তো স্বপ্নেও ভাবিনি ও এমন করে পালাবে।"

দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল আসেমের চেহারা। বহুক্ষণ পর বলল, "ঠিকই বলেছ, ওকে খোঁজা অর্থহীন। তার চেয়ে বরং ও যেখানে যেতে চাইছে সেখানেই চলে যাক।"

এতো গুরুত্বপূর্ণ একজন সাথীর হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিও খুব বেশী প্রভাবিত করতে পারেনি আসেমকে। কারণ তার নিজের প্রাণইতো পড়ে রয়েছে দাউদের প্রাসাদে। তার তনু মনে এখনও পেয়ালা আর রমণীর উষ্ণতার অনুভব।

নিরাপত্তারক্ষী যদি কোন রমণীকে মন দিয়ে থাকে তো আর বেশী কি দিয়েছে। আসেম নিজেকেই তো বিক্রি করে দিয়েছে দাউদের কাছে। ঈমান বিলীন করে দিয়েছে তরুণীর দেহের উষ্ণতায় মদের পেয়ালায়। শরীরটা শুধু যাচ্ছে গজনীর দিকে, আসেমের মনটা বাঁধা মুলতানের প্রাসাদে। তাই সাধারণ একজন সৈনিকের পালিয়ে যাওয়ার বাপারটা তাকে কতটুকু আর প্রভাবিত করবে। নিজের কাছেই আসেমকে রাজা রাজা মনে হচ্ছে। সৈনিক তো দূরের কথা খোদ সুলতানেরই কোন গুরুত্ব নেই তার কাছে।

কল্পনাও করতে পারেনি আসেম—সে যখন তিন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে বিশ্রাম করছে, তখন তার হারিয়ে যাওয়া সৈনিক এক যুবতীকে নিয়ে গজনীর পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

* * *

বিজিত রাজ্য পেশোয়ারে সুলতান মাহমূদ অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন দূত আসেমের আগমন প্রত্যাশায়। কিন্তু দু'সপ্তাহ কেটে গেল আসেমের কোন খবর পাচ্ছেন না। প্রত্যাশা এখন হতাশায় রূপান্তরিত হল সুলতানের। আশংকাও দেখা দিল তার মনে—আসেম সাথীদের নিয়ে শত্রুসেনাদের হাতে বন্দী হয়নি তো! দরবারীদের কাছে তিনি আশংকার কথা বারকয়েক ব্যক্ত করেছেন। তিনি শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে এ ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন, "যদি শুনি আসেম ও তার সাথীদের ওরা বন্দী করেছে তাহলে আমি মুলতানের রাজপ্রাসাদের প্রতিটি ইট খুলে ফেলবো। ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া কাউকে জ্যান্ত রাখবো না।"

এর দু'দিন পর সুলতানকে সংবাদ দেয়া হলো, আসেমের এক সাথী এক যুবতী মহিলাকে নিয়ে গজনী ফিরেছে। দীর্ঘ সফর, ক্ষুধা পিপাসা আর কষ্ট যাতনায় ওদের অবস্থা খুবই করুণ।

"ওদেরকে এক্ষুণি আমার এখানে নিয়ে এসো।" কিছুটা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে নির্দেশ করলেন সুলতান। "কোন অঘটন ঘটেনি তো?"

সৈনিক সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করল। মুখ ব্যাদান। তার দু'চোখ কোটরাগত। শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে ঘনঘন। যুবতীর অবস্থা ওর চেয়েও করুণ। সুলতান ওদের পানি দিতে নির্দেশ করলেন। পানি নিয়ে এলে উভয়ে কয়েক ঢোক পান করল।

"সুলতানে আলী মাকাম! ঘোড়াকে বিশ্রাম দেয়া ছাড়া আমরা পথে কোথাও এক মুহূর্ত দেরী করিনি। কমান্ডার আসেমের এখানে পৌঁছার আগেই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। সম্ভবত সে এখনও পৌঁছেনি।" বলল সৈনিক।

"জাহাঁপনা! আসেম আপনার পয়গামের যে জবাব নিয়ে আসছে তা সম্পূর্ণ প্রতারণা। মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর হিন্দুদের চেয়ে আরো বেশি ভয়ংকর শত্রু আপনার। সে হিন্দুদের পক্ষ থেকে আপনাকে হত্যা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছে। সেই সাথে আমাদের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্যে মারাত্মক চক্রান্তের জাল বিছিয়েছে। সে আনন্দপাল ও বিজি রায়ের পক্ষে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে নীলনক্সা এঁকেছে। সেই নীলনক্সার অংশ হিসেবেই ওরা আসেমকে হাত করে নিয়েছে। আসেম আপনার কাছে যে মানচিত্র নিয়ে আসছে, সেটি হিন্দুদের সরবরাহকৃত। বিজি রায় ও আনন্দপালের সৈন্যরা দাউদের হয়ে ওঁৎ পেতে থাকবে আমাদের গমন পথে নিরাপত্তা দেয়ার কৌশল করে। কিন্তু সুযোগ মতো ওরা আপনার উপর হামলা করবে এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে। আসেম তার অধীনস্থ সৈনিকদের নিয়ে ওদের ক্রীড়নক হিসেবে আত্মসমর্পণে প্ররোচনা দিবে।"

"দাউদ যে এই নীলনক্সা এঁকেছে, আসেম কি তা বুঝতে পারেনি?"

"সে নিজেই তো বিক্রি হয়ে গেছে। সে এখন দাউদের ক্রীড়নক। "

সৈনিক যুবতী সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করল সুলতানকে। কিভাবে ভাগ্য বিড়ম্বিতা এই যুবতী ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে এবং তার সাথে পালিয়ে এসেছে। সুলতান এক দোভাষীর মাধ্যমে যুবতীর কাছ থেকে জানলেন দাউদের অভ্যন্তরীণ হালত। এও জানলেন, আসেমের এতদিন ওখানে কিভাবে কেটেছে, কি করেছে, কি কি কথা হয়েছে দাউদ ও আসেমের মধ্যে। যুবতী দাউদ বিন নসরের কার্যক্রম, ওদের ধর্মীয় আচার ও আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানাল সুলতানকে। সে এ কথাও বলল, "আমি নিজের কানে এসব শুনেছি এবং নিজের চোখে দেখেছি ও নিজের হাতে আসেমকে মদ খেতে দিয়েছি।"

"এই মেয়েটিকে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দাও। এর সেবা-যত্নে কোন ক্রটি হয় না যেন। আর এই সৈনিকেরও খানা-দানা ও বিশ্রামের সুব্যবস্থা কর। ওকে শাহী মেহমানখানায় থাকতে দাও। এরা যে আসেমের আগেই পৌঁছে গেছে সে কথা প্রকাশ হয় না যেন।"

ওদের পৌঁছার চার পাঁচদিন পর আসেম ওমর সুলতানের দরবারে পৌঁছাল। আসেম সুলতানকে বলল, "দাউদ বিন নসর আপনার জন্যে দামী দামী উপঢৌকন পাঠিয়েছে এবং অধীর আগ্রহে আপনার আগমন প্রত্যাশা করছে। সে আপনাকে মুলতানে স্বাগত জানাতে উদগ্রীব। দাউদের দেয়া ষড়যন্ত্রের মানচিত্র সুলতানের কাছে মেলে ধরে সে বলল, এটা দাউদের বলে দেয়া পথ। এ পথে আমাদের সৈন্যরা অতিক্রম করলে সে সব ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। আসেম আরো বলল, দাউদ বিন নসর আমাদের খুব নির্ভরযোগ্য দোস্ত।"

"মুলতান পর্যন্ত সৈন্য নিয়ে যাওয়ার পথ আমি দেখে ফেলেছি। তবে তুমি আমাকে বল, বিজি রায় ও আনন্দপালের সৈন্যরা কোন কোন জায়গায় ওঁৎ পেতে থাকবে এবং রাতের আঁধারে কীভাবে গুপ্ত হামলা করবে?"

"বিস্ময়ে ভরা চোখে সুলতানের দিকে তাকাল আসেম। নির্দেশ দিলেন সুলতান, "ওদের দু'জনকে নিয়ে এসো।"

একটু পরেই আসেম ওমরের হারিয়ে যাওয়া নিরাপত্তারক্ষী আর সেই তরুণী এসে দাঁড়াল তার সামনে।

"এই যুবতীকে চেনো?" গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান। "তোমার কি মনে আছে, দাউদের প্রাসাদে বসে যখন তুমি তোমার ঈমান আর আমার জীবন বেচাকেনা করছিলে তখন এই যুবতী তোমাদের মদ পরিবেশন করছিল। তুমি কি আমার মুখেই তোমার কৃতকর্মের বিস্তারিত শুনতে চাও, না ওর মুখে শুনবে? এর চেয়ে কি এটাই ভাল নয় যে, কৃতকর্মের বর্ণনা তুমি নিজের মুখেই দাও।"

উঠে দাঁড়াল আসেম ওমর। কৃত অপরাধ আর পাপাচারের বোঝা ওর ঈমানী শক্তিকে বিলীন করে দিয়েছে। সত্যের মুখোমুখি হতে সাহস হলো না তার। আস্তে করে তরবারীটা কোষমুক্ত করে আগাটা বসিয়ে দিল পেটে এবং দু'হাতে তরবারীর বাট ধরে এমন জোরে চাপ দিল যে পিঠ ফুরে বেরিয়ে গেল। একটা চাপা চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর। তরফাতে লাগল ওর দেহ।

প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন সুলতান। "ওর দেহকে শহরের বাইরে খোলা জায়গায় ফেলে এসো। ঈমান সওদাকারী দাফন কাফনের হকদার নয়।"

সেনাপতিদের ডেকে পাঠালেন সুলতান। নির্দেশ দিলেন, "এখনই সেনাদের তৈরী হতে বলুন। আমি আজই মুলতানের উদ্দেশে রওয়ানা হবো। ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে। পথে কয়েক জায়গায় যুদ্ধ করতে হবে আমাদের। পৌত্তলিকদের পাশাপাশি কেরামাতী চক্রান্তও এবার খতম করব ইনশাআল্লাহ্।"

জনকের প্রায়শ্চিত্ত

নিজের তরবারী নিজের পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করল আসেম ওমর। তরবারী বিদ্ধ আত্মঘাতক আসেমকে শহর প্রাচীরের বাইরে ফেলে আসতে নির্দেশ দিলেন সুলতান। প্রখর রৌদ্রতাপে তরফাতে তরফাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল সে। কারো অনুমতি ছিল না যে আসেমের মুখে এক কাতরা পানি দেবে। অতীত কৃতিত্বের জন্যে অনুগ্রহ করে সুলতান আসেমের উত্তরসূরীদেরকে অনুমতি দিলেন মরদেহ তুলে নিয়ে যথারীতি দাফন করতে।

সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় একজন অধিনায়ক ছিল আসেম ওমর। যুদ্ধবিদ্যায় সে ছিল খুবই দক্ষ, সাহসী এবং বিচক্ষণ। কিন্তু জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে এসে নারীদেহ, মদের নেশা আর সামান্য জমিদারীর লোভ তাকে এমনই আদর্শচ্যুত করল যে, দূরতিক্রম্য শত্রু দুর্গ বিজয়ী আসেম, হাজারো শত্রু নিধনকারী বাহাদুর আসেম, সেনাধিনায়ক, বিচক্ষণ কূটনীতিক আসেম জবাবদিহির মুখোমুখি হতে না পেরে নিজের তরবারী পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করল। অথচ আসেম ছিল সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর একজন আদর্শ সৈনিক। তার খ্যাতি ও যশ ছিল সর্বত্র আলোচিত। প্রধান সেনাপতি আসেমের কার্যক্রমের উপর ছিলেন আস্থাবান। তার প্রতি প্রধান সেনাপতির প্রশ্নাতীত আস্থা ও বিশ্বাসই সুলতানের ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও এতো গুরুত্বপূর্ণ মিশনে তাকে সুলতানের বিশেষ দূত হিসেবে গুরু দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল।

কাসেম ওমর। টগবগে যুবক। সুলতানের সেনাবাহিনীর ইউনিট কমান্ডার, দুর্ধর্ষ, বিচক্ষণ, সিদ্ধান্তে অবিচল, লক্ষ্যে স্থির। ছোট বেলা থেকেই পিতার কাছে কাসেম শুনতো যুদ্ধের কাহিনী। অল্প বয়সেই পুত্র কাসেমকে ভর্তি করে দিয়েছিল সুলতানের সেনাবাহিনীতে। রণাঙ্গনে সে ছিল বাবার যোগ্য উত্তরসূরী। আসেমের মৃত্যুকালে পুত্র কাসেম পূর্ণ যুবক। সেনাবাহিনীতে সে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান করে নিয়েছে নিজের যোগ্যতা বলে।

বাবার মৃত্যুসংবাদ যখন কাসেমের কাছে পৌঁছাল তখন সে এই ভেবে অনুতাপ করল যে, সেনাবাহিনীর একজন কৃতি অধিনায়কের পদে শূন্যতা সৃষ্টি হলো। দুঃখ পেল কাসেম এই ভেবে যে, তার বাবা বিশেষ দূত হিসেবে মুলতান গিয়েছিলেন; হিন্দুরা হয়তো তাকে শহীদ করেছে। বাবা হিসেবে শুধু নয়, সেনাবাহিনীর জন্য একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির শূন্যতা তাকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল। তার বিশ্বাস ছিল, তার বাবার মরদেহ হয়তো মুলতান থেকে নীত হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদবাহক কাসেমকে সাথে করে নিয়ে এলো আসেমের লাশের পাশে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে, বালির মধ্যে, রক্তাক্ত পিতার লাশ দেখে কাসেম হতবাক। একি! তার পিতার মরদেহ তরবারী বিদ্ধ!

কাছের একটি ইমারতের বহিরাঙ্গণে সুলতান মাহমূদের প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ আত্‌তায়ী দাঁড়ানো। কাসেম বিন ওমরকে পিতার লাশের পাশে বিষণ্ন মনে দাঁড়ানো দেখে আব্দুল্লাহ্ পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। যুবক কাসেমের প্রতি তার ভীষণ মায়া হলো। তিনি তার কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে নিজের দিকে ফেরালেন। বললেন, তোমার বাবার কাহিনী শুনলে তা তোমাকে এই করুণ দৃশ্য থেকে আরো বেশী দুঃখ দেবে। পিতার মায়া-মমতা, তার কৃতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মন থেকে দূর করে দাও। বরং এর জায়গায় তোমার দ্বীন, ঈমান, কর্তব্য ও দেশপ্রেমকে স্থান দাও।

"তাজা রক্ত দেখে মনে হচ্ছে, তাকে এখানেই কিছু আগে হয়তো হত্যা করা হয়েছে।" বলল কাসেম বিন ওমর। "কি অপরাধে তাকে এমন নির্মম হত্যার শিকার হতে হলো। আমি জানি, তিনি সুলতানের বিশেষ দূত হিসেবে মুলতান গিয়েছিলেন। কিন্তু তার এমন অবস্থা হলো কেন?"

"তোমার পিতা আত্মহত্যা করেছে। তাকে কেউ হত্যা করেনি। এখানে তার কোন শত্রু নেই, ছিলও না। সে নিজেই নিজের সাথে দুশমনি করেছে। সে তার দ্বীন-ঈমান, দেশ, জাতি ও সেনাবাহিনীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর সেই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতিতে আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করেছে তোমার পিতা।" বললেন আবু আব্দুল্লাহ্।

আবু আব্দুল্লাহ্ কাসেম বিন ওমরের উদ্বেগ নিরসনের জন্যে তার পিতার পূর্বাপর ইতিবৃত্ত সবিস্তারে জানালেন। বললেন, কি কারণে কোন্ প্রেক্ষিতে সে আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করেছে।

"পিতার অপরাধের শাস্তি কি আমাকেও ভোগ করতে হবে" মাননীয় সেনাপতি!" বিনীতভাবে জানতে চাইল কাসেম। "আমাকে কি সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করা হবে?"

"এখনও পর্যন্ত সুলতান এমন কোন নির্দেশ দেননি। সুলতানের পরে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমার হাতে। আমিও এমন কোন সিদ্ধান্ত নেইনি। আমার দৃষ্টিতে তুমি সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ কমান্ডার। আমি আশা করি, দায়িত্বের প্রতিক্ষেত্রে কর্তব্যনিষ্ঠায় তুমি আমার পদ পর্যন্ত পৌঁছবে। সবেমাত্র শুরু। এখনও গোটা জীবন তোমার সামনে রয়েছে। আমি আশা করি, তুমি তোমার পিতার ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিবে। বুঝতে চেষ্টা করবে, পাপের কতো আকর্ষণ, কীভাবে অপরাধ একজন নিষ্ঠাবান সেনাধ্যক্ষকে পথভ্রষ্ট করে!

ভাবতে পারো, ভোগ আর জাগতিক লিপ্সা আসেম ওমরের মতো কর্তব্যনিষ্ঠ সেনাধ্যক্ষকেও নিজের দেশ, সেনাবাহিনী আর দ্বীন-ধর্ম থেকে কিভাবে বিচ্যুত করেছে! সুলতান মাহমূদের মতো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে পরাজিত করতে, নিজের

গড়া মুসলিম মুজাহিদদেরকে বেঈমানদের হাতে পরাজিত করে গোলাম বানানোর কি ভয়ংকর জালে পা দিতে পারে! সেই চিন্তা করো, অপরাধ যখন মানুষকে তাড়া করে তখন আসেম ওমরের মতো বীর বাহাদুর যোদ্ধাও কাপুরুষের মতো আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করে। তুমি যুবক। যুবকদের জীবনে সবচেয়ে আশংকার বিষয় হচ্ছে, গোনাহর আহবান তাদের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হয়ে পড়ে। যৌবনের যন্ত্রণায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।"

"মাননীয় সেনাপতি! আমাকে কি পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেয়া হবে?"

"তোমাকে অবারিত সুযোগ দেয়া হচ্ছে। চল। লাশের পেট থেকে তরবারী বের করে আনো। তোমার বাবার মৃতদেহ সমাধিস্থ কর। কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর।"

"আমি কি সেই মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবো, যিনি মুলতান থেকে এসেছেন এবং যে আমার পিতার অপরাধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী?"

"তুমি লাশ বাড়িতে নিয়ে যাও। সেই মহিলাকে আমি তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে তোমার আম্মুকেও সব ঘটনা বলবে। তুমি ইচ্ছে করলে, সেই সৈনিকের সাথে কথা বলতে পারবে যে সৈনিক এই মহিলাকে সাথে করে নিয়ে এসেছে।" বললেন প্রধান সেনাপতি।

পিতার দেহ থেকে তরবারী বের করে আনলেন কাসেম বিন ওমর। প্রধান সেনাপতি আসেমের লাশ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

স্ত্রীকে নিজের সাথে পেশোয়ার নিয়ে এসেছিল আসেম। আসেমের স্ত্রী ছিল পেশোয়ারেরই মেয়ে। ৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে রাজা জয়পাল যখন প্রথম সুলতান সুবক্তগীনের বিরুদ্ধে সেনাভিযান চালায় তখন সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে জয়পাল পালিয়ে যায়। তার সাথে ছিল অনেক মুসলিম বন্দী নারী ও বেসামরিক লোক। এরা সুবক্তগীনের সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়। সেই বন্দিনীদেরই একজন আসেমের স্ত্রী কাসেমের মা। এর পূর্বে রাজা জয়পালের বাহিনী পেশোয়ার অঞ্চলের অধিবাসীদের বাড়িঘর লুটপাট ও তরুণীদের অপহরণ করে সেনাবাহিনীর সেবিকা হিসেবে নিয়ে এসেছিল। এদেরই একজনকে বিয়ে করেছিল আসেম। আসেমের স্ত্রী পেশোয়ারের আঞ্চলিক ভাষা জানতো। তাই আসেম যখন পেশোয়ার যাওয়ার নির্দেশ পেল তখন আঞ্চলিক ভাষাভাষী হিসেবে স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিল সহযোগিতার প্রয়োজনবোধে। সেই পৌত্তলিক বাহিনীর হাতে অত্যাচারিতা মহিলার উদরে জন্ম নিয়েছে কাসেম। সৈনিক বাবার ঔরসজাত আর অত্যাচারিতা মায়ের উদরজাত কাসেম স্বভাবগতভাবেই পৌত্তলিকতা বিরোধী এক দ্রোহ। ইসলামী চেতনার এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। কাসেম মায়ের কাছেই শিখেছিল তার মাতৃভাষা। আর অবস্থানগত কারণে গজনীর ভাষাতো জানতই।

আসেমের লাশ দেখে তার বিধবা স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিন্তু কাসেমের হাতে রক্তমাখা তরবারী দেখে কান্না থেমে গেল তার মায়ের। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে।

"মা! আপনি যেভাবে রোদন করছেন, আপনার মতো মহিলার পক্ষে তার জন্যে শোক-তাপ করা খুবই বেমানান। হাতের তরবারীটা ছুঁড়ে মেরে কাসেম মায়ের উদ্দেশে বলল, তাকে কেউ হত্যা করেনি। নিজের তরবারী দিয়েই সে আত্মহত্যা করেছে।"

কাসেম উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল—"মা! সত্যি করে বলুন তো, আমি কি প্রকৃতপক্ষে তারই সন্তান? আপনি কি আগে হিন্দু ছিলেন? আমি কোন হিন্দুর ঔরসজাত নই তো? আমি কি লালিত পালিত হয়েছি কোন গাদ্দারের ঘরে?"

"কাসেম!" আর্তচিৎকার করে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন মা। "এসব তুমি কি বলছো? কি ঘটেছে! কি দেখছি আমি! তুমি কাকে গাদ্দার বলছো! বোখারা বলখের বিদ্রোহীদের পরাভূতকারী কমান্ডার, আজীবন পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে জিহাদকারী অকুতোভয় সৈনিক, যুদ্ধের ময়দানে পাহাড়ের মতো অবিচল যোদ্ধা, দ্বীনের সেবক মুজাহিদ বাবাকে তুমি গাদ্দার বলছো! তিনি তো সুলতানের দূত হয়ে মুলতান গিয়েছিলেন। কবে ফিরেছেন? তিনি গাদ্দার হবেন কি করে? কি হয়েছে বাবা বল! আমাকে খুলে বল!"

"আমি বলতে পারবো না মা! আপনাকে মুলতানের এক মহিলা সব বলবে। সে আসছে। এছাড়াও দূতের দেহরক্ষী হিসেবে যে কয়জন সৈনিক আব্বুর সহযাত্রী হয়েছিল তাদের একজনও আসছে। তার কাছ থেকেই আপনি সব জানতে পারবেন। এইতো এসেছে তারা!"

প্রথমেই ঘরে প্রবেশ করল মুলতানের মহিলা। প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ তাকে কাসেমদের বাড়িতে পাঠিয়েছেন। কাসেম খেয়াল করল, মহিলাটির বয়স বেশী নয়, যুবতী। কিন্তু যৌবনের কান্তি-কোমনীয়তা নেই তার চেহারায়। নির্যাতন, নিপীড়নের ছাপ স্পষ্ট তার চোখে-মুখে। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, বহু ঝড়-ঝাপটা গেছে এই মেয়ের জীবনে। তার পরও মেয়েটির চেহারায় একটা মোহনীয় ভাব, বিচক্ষণতা ও দ্বীপ্তিময়তা বিদ্যমান। যা যে কোন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম।

মেয়েটি কাসেমদের ঘরে প্রবেশ করেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "আমার নাম রাবেয়া, আমাকে আপনাদের ঘরে পাঠানো হয়েছে।

"আমার স্বামী মুলতানে কি করেছিলেন?" জিজ্ঞেস করল আসেম ওমরের স্ত্রী।

"ওই ধরনের পরিবেশে শরীফ ধরনের লোকেরা যা করে থাকে, তিনিও তাই করেছেন।" জবাব দিল রাবেয়া। রাবেয়া বলে চলল, আসেম ওমরকে দাউদ বিন

নসর কী ভাবে মদ নারী আর সুরা নর্তকীর মায়াজাল এবং ক্ষমতার মোহ দিয়ে ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। রাবেয়া সবিস্তারে বলল—"মদ, নারী, গান-বাজনা, আয়েশ-উপভোগ ছাড়া দাউদের ওখানে নীতি-নৈতিকতার কি আছে? আপনার স্বামীর প্রতি আমার বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি কে তা আমি আগে জানতামও না। কিন্তু দাউদ বিন নসর সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীকে সহযোগিতার ধোঁকা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিলেন আপনার স্বামী। আমি তখন তাকে জানতে পারি, যখন আমাকে তাদের মদ আপ্যায়নের নির্দেশ দেয়া হলো। আমি নিজ হাতে উভয়কে মদ ঢেলে দিয়েছি। তারা উভয়ে আকণ্ঠ পান করেছেন। তাদের বৈঠকে আমাকে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আমি তাদের কথোপকথনের সময় উপস্থিত ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমিও এই চক্রান্তের অংশে পরিণত হয়েছিলাম। আমার বাবা এক কাপুরুষের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছিল। সেই ব্যক্তি আমাকে দাউদ বিন নসরের কাছে উপহার হিসেবে রেখে যায়।

করুণ পরিণতির শিকার হয়ে মানসিকভাবে আমি ভেঙে পড়েছিলাম। গোনাহ্ আর পাপক্লিষ্ট জীবন-যাপনে বাধ্য হওয়ায় মনের দিক থেকে আমি মরেই গিয়েছিলাম। বেঁচে থাকা আমার কাছে অভিশাপ মনে হতো। কিন্তু একজন জ্ঞানী ও সাধক ব্যক্তি আমার মৃতপ্রায় হৃদয়টিকে সজীব করে তুলেছেন। তিনি আমার এক বাল্যবান্ধবীর পিতা। তিনি আমাকে বোঝালেন, দাউদ বিন নসর ইসলামের দুশমন। তুমি ওর হেরেমের অভ্যন্তরের ঘটনাবলী গভীরভাবে জেনে ওর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে দ্বীন ও মিল্লাতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পার। বাহ্যত তোমার জীবন কষ্টকর হলেও আল্লাহ্ হয়তো তোমার অসহায়তাকে ক্ষমা করে দ্বীন ও ইসলামের জন্য তোমার খেদমতে সন্তুষ্ট হবেন। তার কথায় আমি সান্ত্বনা পেলাম। অল্প দিনের মধ্যে দাউদের হারেমে সবচেয়ে আস্থাভাজন ও কর্তব্যপরায়ণ সেবিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমি সক্ষম হলাম। আর বান্ধবীর পিতাকে দাউদের কার্যক্রম সম্পর্কে যথারীতি অবহিত করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিলাম।"

রাবেয়া বলল, "কেরামতী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সীমাহীন জঘন্য। তেমনি ওদের কাজকর্ম ও চালচলন। কেরামাতীরা নিজেদের মুসলমান দাবী করে বটে কিন্তু এমন কোন গোনাহর কর্ম নেই যা ওরা বৈধ মনে করে না। মুলতান কেরামাতীদের প্রধান কেন্দ্র। ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ওদের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে দলে দলে কেরামাতী হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কেরামাতীদের বিরুদ্ধেও কিছু সংখ্যক লোক সক্রিয় রয়েছে কিন্তু তারা প্রকাশ্যে নয় অতি গোপনে। ওখানে কারো পক্ষে কেরামাতীদের বিরুদ্ধাচরণ করে টিকে থাকা অসম্ভব। আমার বান্ধবীর পিতা কেরামাতী বিরোধী

দলের নেতৃত্বে রয়েছেন। তিনি বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী, আমলদার খাঁটি মুমিন ব্যক্তি। তিনি সব সময় বলেন, তাঁর সামর্থ নেই এজন্যে তিনি গজনী আসতে পারছেন না। তিনি বলেন, সাক্ষাৎ হলে সুলতান মাহমূদকে তিনি মুলতান অভিযানের জন্যে অনুরোধ করতেন, কারণ, কেরামাতীরা মুসলমানদের জন্য হিন্দুদের চেয়েও ভয়ংকর ও বিপজ্জনক।........

তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত ছিল আমার। দাউদের ওখানে যা কিছু ঘটতো, যেসব চক্রান্ত করা হতো, সব কিছুই হতো আমার জ্ঞাতসারে। এসবের খবর আমি যথারীতি তাকে জানিয়ে দিতাম। দাউদের হারেমেই আমি সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে জেনেছি। দাউদের কাছে রাজা আনন্দপাল ও বিজি রায় ক'দিন পরপর আসতো। ওরা সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করতে এবং তার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে নিয়মিত শলা-পরামর্শ করতো।

আপনার স্বামী সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, তিনি সুলতানের সেনাবাহিনীর এক শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা। এজন্যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু দাউদের হারেমের সুন্দরী কিশোরী আর মদ শুরার ফাঁদে পড়ে নিজের কর্তব্য ভুলে গেলেন। এমন কি নিজের বাহিনীকে ধ্বংস করার চক্রান্তে নিজেই জড়িয়ে পড়লেন।

একথা আমি বান্ধবীর পিতাকে জানানোর পর তিনি আপনার স্বামীর একজন দেহরক্ষীকে ডেকে তাকে সব কথা বুঝালেন এবং হারেম থেকে আমাকে পালানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই রক্ষীর সাথে আমি গজনী এসেছি। আমরা আপনার স্বামীকে ভ্রান্তিতে রেখে তার আগেই গজনী পৌঁছে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করি। কয়েকদিন পর দেহরক্ষীদের নিয়ে আপনার স্বামী গজনী পৌঁছে দাউদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্যে সম্পূর্ণ প্রতারণাপূর্ণ তথ্য সুলতানকে অবহিত করেন। সুলতান তার প্রতারণা প্রমাণের জন্যে আমাকে ও সেই দেহরক্ষীকে তার সামনে হাজির করেন। আমি আপনার স্বামীর প্রতারণা ফাঁস করে দিলে তিনি নিজের পরিণতি বুঝতে পেরে কোমর থেকে তরবারী বের করে আচমকা পেটে বিদ্ধ করেন।"

কাসেম ও তার মা নীরবে রাবেয়ার কথা শুনছিল। রাবেয়ার কথা শেষ হলে তার মা উঠে আসেমের তরবারীটি হাতে নিয়ে কাসেমের দিকে বাড়িয়ে বললেন—"আমি তোমার পেটে শত্রুবাহিনীর তরবারী বিদ্ধ দেখতে চাই। তবে এর আগে ঐ তরবারী দিয়ে অন্তত একশ শত্রু তোমাকে নিধন করা চাই।"

"এ তরবারী আমাকে দিয়ো না। এ তরবারীতে যে রক্ত লেগে আছে তাতে শরাবের প্রভাব রয়েছে, এ তরবারী নাপাক, এ নাপাক তরবারী দিয়ে কি জিহাদ করা যায়?" বলল কাসেম।

আসেম ওমরকে অতি সাধারণ মানুষের মতো দাফন করা হলো। তার স্ত্রী আসেমের মৃত্যুতে অনুতাপ করল বটে কিন্তু মোটেও আর কান্নাকাটি করল না, যেমনটি একজন কৃতি সেনাপতির মৃত্যুতে তার প্রেয়সী স্ত্রী করে থাকে। আসেমের স্ত্রীর মনে হিন্দুদের প্রতি পাহাড়সম ঘৃণা। সে যৌবনে হিন্দুদের অপহরণের শিকার হয়। তার বিশ্বাস, নিরীহ্ অবলা কিশোরীদের অভিশাপের কারণেই প্রতাপশালী জয়পালের পরাজয় ঘটেছে। আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সে আসেম ওমরের মতো দক্ষ সৈনিককে পেয়েছিল স্বামী হিসেবে। বিয়ের পর অল্পদিনের মধ্যেই আসেম অধিনায়ক পদে উন্নীত হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, ইসলাম ও মুসলিম বাহিনীর জন্যে নিবেদিত প্রাণ সেই কৃতি স্বামীকে হিন্দুরা চক্রান্তের ফাঁদে ফেলে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করল। কাসেমের আম্মা পেশোয়ারে সুলতানের অভিযানের কথা শুনে খুশী হয়েছিলেন। এজন্যে তিনি স্বামীর কাছে সফরসঙ্গী হওয়ার বায়না ধরেছিলেন। স্বামী আসেমও পেশোয়ারের আঞ্চলিক ভাষাভাষী হিসেবে কাজে লাগতে পারে মনে করে স্ত্রীকে পেশোয়ার নিয়ে এসেছিল। কাসেমের মায়ের মন ছিল প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষে অগ্নিকুণ্ড। সে কোনদিন তার মতো অসংখ্য যুবতীদের উপর হিন্দুদের নির্যাতনের কথা বিস্মৃত হতে পারেনি। কিন্তু প্রতিশোধের আগুন নিভানোর যে স্বপ্ন নিয়ে কাসেমের মায়ের পেশোয়ার আগমন সেই মায়ের হৃদয় এখন আত্মগ্লানি ও বিষাদে ভরপুর। অসহনীয় কষ্ট তার সাহসী মনটাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিচ্ছে। কাসেমের মা জীবনের সব স্বপ্ন স্বামীর পরিবর্তে পুত্রকে সপে দিল। ছেলেটিকে সে এখন অত্যাচারী হিন্দুদের বিরুদ্ধে সাহসীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট। রাবেয়াকে এক বঞ্চিতা ভাগ্য বিড়ম্বিতা অবলা মেয়ে হিসেবে নিজের কাছেই রেখে দিল। ভয়াবহ ক্ষতির মুখোমুখি থেকে সুলতানের বাহিনীকে বাঁচানোর জন্যে রাবেয়া যে কঠিন দায়িত্ব পালন করেছে, এজন্য তিনি রাবেয়াকে সাধুবাদ জানালেন। তার জন্যে প্রাণ খুলে দু'আ করলেন।

আসেম ওমর যেদিন ষড়যন্ত্রের নকশা নিয়ে গযনীর উদ্দেশে রওয়ানা হল এর পরদিনই দাউদ বিন নসর বেরায় গিয়ে বিজি রায়কে জানাল, সুলতানকে পরাজিত করতে সে কি ফাঁদ পেতেছে। কিভাবে সুলতানের প্রেরিত দূতকে বিভ্রান্ত করে ধোঁকা দিয়ে চক্রান্ত বাস্তবায়নের ক্রীড়নক বানিয়েছে। বিজি রায় দাউদের সংবাদ নিয়ে সেদিনই লাহোর চলে গেল আনন্দপালের কাছে। আনন্দপালকে সে বলল, অল্প ক'দিনের মধ্যে দুশমন আমাদের জালে ধরা দিচ্ছে। আপনার কাজ দাউদের নকশা অনুযায়ী পথিমধ্যে মাহমূদের সৈন্যদের নাস্তানাবুদ করে দেয়া। আনন্দপাল বিজি রায়ের কথা শুনে বলল, "আপনি কিভাবে দাউদের কথায় আশ্বস্ত হলেন? দাউদ নিজেওতো একজন মুসলমান। দাউদ চক্রান্ত করে আমাদের সর্বনাশ ঘটাবে না এমনটা কি করে বিশ্বাস করা যায়? মুসলমানদের উপর এতোটা ভরসা করা কি ঠিক হবে?"

"আপনি এখনও জানেন না, দাউদ আসলে মুসলমান নয়! আপনারতো কেরামতীদের সম্পর্কে জানা নেই। ওরা আবার মুসলমান হলো কি করে? ওরা যত অপকর্ম করে তা তো কোন অমুসলমানও করে না। ওদেরকে ধর্মহীন বললে ভুল হবে না। ওরা নামমাত্র মুসলমান। আসলে ওরা চরম ইসলাম বিরোধী। তারপরও যদি দাউদ আমাদের সাথে কোন ধরনের প্রতারণ করে তবে তার পরিণতি হবে খুবই কঠিন। সে তো চতুর্দিকে আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রতারণা করলে ওর রাজ্য আমরা দখল করে ওকে হত্যা করব, না হয় জীবনের জন্যে জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করব।

আপনি একথা মনে করবেন না যে, মাহমূদের সৈন্যরা এই মুহূর্তে আমাদের উপর হামলা করতে আসছে। মাহমূদ চাচ্ছে মুলতানকে ওদের সেনা ঘাঁটি বানাতে। মুলতানকে কেন্দ্র বানিয়ে মাহমূদ আপনার ও আমার এলাকা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিতে চাচ্ছে।

আমি দু'জন গোয়েন্দা পেশোয়ারে পাঠিয়েছি। যখনই মাহমূদের সৈন্যরা মুলতান থেকে রওয়ানা করবে তখনই ওরা দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে আমাকে আগাম খবর দিবে। আমি ঝটিকা বাহিনীকে পাহাড়ী এলাকায় পাঠাচ্ছি। যখনই মাহমূদের বাহিনী সংকীর্ণ পথে এসে ঢুকবে ওরা পাহাড়ের উপর থেকে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করে ওদের নাস্তনাবুদ করে ছাড়বে। তাছাড়া ওরা মাহমূদের প্রত্যেক ছাউনীতে রাতের অন্ধকারে ঝটিকা আক্রমণ করে পালিয়ে আসবে। এভাবে ক্রমাগত হামলার শিকার হয়ে ওদের অগ্রসর হতে হবে। মাহমূদের বাহিনী যদি মুলতান পৌঁছতে সক্ষমও হয় তবে তাকে অর্ধেক সৈন্য পথে হারাতে হবে। এরপর মাহমূদকে হত্যার ব্যবস্থাও করে রেখেছি আমি।"

দীর্ঘ সময় আনন্দপাল ও বিজি রায় সুলতান মাহমূদকে চক্রান্তের বেড়াজালে আটকানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করল। জনকের তিনবার ধারাবাহিক পরাজয়ের কারণে আনন্দপাল ছিল সুলতানের আনুগত্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সর্বশেষ যুদ্ধে জয়পালের পরাজয়ের পর মুক্তিপণ ও চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জয়পাল সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এখন থেকে আর কোনদিন তার সেনাবাহিনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করবে না এবং যুদ্ধ খরচ আদায় করা ছাড়াও বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর সে সুলতানের কোষাগারে জমা দিবে। কিন্তু জয়পালের ছেলে আনন্দপাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আত্মঘাতক বাবার প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে চললো। সে জন্যে আনন্দপালের মনে সুলতানের আক্রমণ আশংকা ছিল প্রবল। সে কিছুতেই সুলতানকে ঘাটাতে চাচ্ছিল না। কিন্তু সুলতানের বাহিনী এদিকে অগ্রসর হোক এটাও ছিল তার কাছে আতংকের ব্যাপার। আনন্দপাল ভাবছিল, মাহমূদের বাহিনীকে ক্ষতি করতে গিয়ে বিজি রায় না আবার তার জন্যে বিপদ ডেকে আনে।

“ঝটিকা অভিযানের যে শক্তি মুসলিম সেনাদের রয়েছে, আমাদের সৈন্যদের তা নেই। ঝটিকা অভিযানের জন্যে সৈনিকদের মেধাবী, সাহসী, কৌশলী ও ত্যাগী হতে হয়। আমাদের সৈন্যদের মধ্যে এসবের অভাব আছে।” বলল আনন্দপাল। “আপনি ঝটিকা বাহিনী পাঠান, তাতে আমার সমর্থন থাকবে কিন্তু আমার পক্ষে সরাসরি কোন সেনাবাহিনী পাঠানো সম্ভব নয়।”

“পেশোয়ার থেকে এদিকে আসতে হলে মাহমূদকে সিন্ধু নদ পেরিয়ে আসতে হবে। সিন্ধু নদের উপরে আমরা নৌকার যে পুল তৈরী করে রেখেছি ওখানে আমি ওদের ঠেকানোর ব্যবস্থা করব, যাতে তারা নদ পেরিয়ে আসতে না পারে। পুলের আশেপাশে আমি সৈন্য মোতায়েন করব যাতে ওরা নদ পেরিয়ে আসার সুযোগ না পায়, তারপরও যদি ওরা নদ পার হতে সক্ষম হয় তাহলে ওদের পথ রোধ করার দায়িত্ব আপনার। আমাদের সবার চেষ্টা হওয়া উচিত, ওরা যদি এদিকে এসেই যায় তবে যেন আর জীবিত ফিরে যেতে না পারে।” বললো বিজি রায়।

ওদের ভাবনার চেয়েও দ্রুতগতিতে সুলতানের বাহিনী মুলতান অভিযানের প্রস্তুতি নেয়। সুলতান কেরামতীদের শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য খুব দ্রুত অভিযানের নির্দেশ দিলেন। তার কাছে তখন রসদের কোন ঘাটতি ছিল না, তাই প্রস্তুতি নিতেও তেমন ভাবতে হয়নি। সুলতান সেনাপ্রধান ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের ডেকে তাদেরকে অভিযানের কৌশল বলে নিলেন। তিনি এও বলে দিলেন, “পথিমধ্যে যথাসম্ভব কম ছাউনী ফেলতে হবে। ছাউনী যেখানেই ফেলা হোক রাতের পাহারা জোরদার রাখতে হবে। গুপ্ত হামলার শিকার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছাউনীর আশেপাশে ঝটিকা বাহিনী নিযুক্ত রাখতে হবে। কেননা মুলতান পর্যন্ত পৌঁছতে প্রতি ক্ষেত্রে গেরিলা আক্রমণের আশংকা রয়েছে। এই আশংকা থেকে বাহিনীকে নিরাপদ রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।”

অগ্রণী দল নির্বাচনে সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ্ আত্তায়ীকে নির্দেশ দিলেন সুলতান। বললেন, “এমনটা মনে করোনা যে, অগ্রগামী দল পথ পরিষ্কার করে দিবে আর বাকী সৈন্যরা মানুষের ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল আর আচার খেতে খেতে নির্বিঘ্নে মুলতান পৌঁছে যাবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি, পথের প্রতিটি গাছ, প্রতিটি শস্যদানা, প্রতি ইঞ্চি মাটি আমাদের প্রতিপক্ষ। এ পথের প্রতিটি পাহাড়, টিলা ও ঝোপঝাড় আমাদের জন্যে মৃত্যুফাঁদ। অগ্রণী বাহিনীকে মেপে মেপে পা ফেলতে হবে। ঈগলের মতো সতর্ক দৃষ্টি আর হরিণের মতো সদা জাগ্রত থাকতে হবে। গতি হবে ক্ষীপ্র, লক্ষ্যভেদী। মনে রেখো, অগ্রণী দলকে প্রতিক্ষেত্রে প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে। প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের সামনে এগুতে হবে। মূল বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকেও সার্বক্ষণিকভাবে শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে।”

সাধারণ কমান্ডাররা বুঝতেই পারছিল না,সুলতান এ অভিযানে অগ্রণী দলকে কেন এত সতর্ক থাকতে বলছেন। সবার অজানা থাকলেও কাসেম বিন আসেমের জানা ছিল সুলতানের সতর্কবাণীর মর্ম-রহস্য। জানা থাকার কারণে সুলতানের নির্দেশনার পর সে দাঁড়িয়ে বলল—

"সুলতানে আলী মাকাম! আমার প্রস্তাব যদি আপনার হুকুমের বরখেলাপ এবং আপনার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের অপরাধ হিসেবে বিবেচিত না হয় তবে আমার অনুরোধ, আমার ইউনিটকে অগ্রণী দলের দায়িত্বে দেয়া হোক।"

"তোমার কি নাম?" জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"ওর নাম কাসেম বিন ওমর।" কাসেমের পরিবর্তে জবাব দিলেন সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ। "সে আসেম ওমরের ছেলে।"

কাসেমের দিকে তাকিয়ে সুলতানের চেহারায় ভাবান্তর ঘটল। তিনি একটু নীরব থেকে বললেন, "অগ্রণী দল পরে নির্বাচন করা হবে, তুমি পাশের ঘরে বস, তোমার সাথে পরে কথা বলব।"

অভিযানের সময়, কৌশল ও প্রস্তুতির নির্দেশনা দিয়ে সবাইকে বিদায় করে দিলেন সুলতান। সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ ও কাসেমকে ডেকে একান্ত বৈঠকে কাসেমকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি অগ্রণী দলের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী কেন?"

"এ অভিযানে পথে পথে যে সব কঠিন বিপদের মুখোমুখি সুলতানের বাহিনীকে হতে হবে তা সবই আমার পিতার তৈরী। তাই পিতার তৈরী বিপদের মোকাবেলা সবার আগে ছেলেরই করা উচিৎ বলে আমি মনে করি।" বলল কাসেম।

"মুহতারাম সুলতান! ওর আম্মা আমার কাছে এসেছিল। স্বামীর আত্মহত্যায় তার কোন অনুতাপ নেই। সুলতানের জন্যে তার স্বামীর এতো বড় বিপদাংশকা সৃষ্টির জন্যে সে অত্যন্ত দুঃখিত। সে আমাকে বলেছে, তার ছেলেকে সে আল্লাহ্‌র পথে কুরবান করতে চায়। তাকে যেন অগ্রণী বাহিনীতে সুযোগ দেয়া হয়, যাতে সে তার বাবার অপরাধের কাফফারা করার সুযোগ পায়।"

"তুমিও কি তোমার আম্মার মতো আত্মবিশ্বাসী না তোমার পিতার মতো তুমিও বেঈমানদের শিকারে পরিণত হবে?" কাসেমকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"শপথ করা ছাড়া আপনাকে আশ্বস্ত করার আর কোন উপায় আমার নেই—মহামান্য সুলতান! আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি, মায়ের উদ্দীপনাই আমি ধারণ করি, পিতার দুর্বলতা নয়। সৈনিক হিসেবে আমি পিতার উত্তরসূরী। আমি আমার পিতাকে একজন বিচক্ষণ, সাহসী ও বুদ্ধিমান সেনাপতি হিসেবেই দেখেছি, শুনেছি, কিন্তু তার করুণ পরিণতি দেখার পর বেঈমানদের চক্রান্তের উচিৎ শিক্ষা দিতে আমি শপথ গ্রহণ করেছি।"

“তুমি হয়তো জানো না, তোমার মায়ের বুকে বেঈমানদের প্রতি কি আগ্নেয়গিরি জ্বলছে। যৌবনের শুরুতেই সে বেঈমানদের দ্বারা অপহৃত হয়ে হিন্দু নরপশুদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে। তোমার মায়ের মতো তখনকার বহু তরুণীর সৌভাগ্য যে, হিন্দুরা পরাজিত হয়ে ওদের ফেলে চলে যায়। আমরা ওদের উদ্ধার করে সেনাবাহিনীর লোকদের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেই।”

“কাসেম! তুমি তরুণ। তুমি হয়তো জান না, হিন্দুরা মুসলমান তরুণীদের সম্ভ্রমহানীকে ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে। অথচ মুসলমানরা নারীর মর্যাদা রক্ষা আর ইসলামের জন্যে জীবন দিতে কত আন্তরিক ও অকুণ্ঠ! একজন মুসলমান অমুসলিম নারীর সম্ভ্রমকেও পবিত্র আমানত মনে করে জীবন দিয়ে তার সম্ভ্রম রক্ষা করে। ইসলাম নারীর গায়ে হাত দেয়াকে কবীরা গোনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, আর বেঈমানরা নারীর সম্ভ্রমহানীকে পুণ্যের কাজের মতো উৎসাহিত করে। কাসেম! বিশ্বের কোন মুসলিম তরুণী লাঞ্ছিত হলে সারা বিশ্বের মুসলিম তরুণদের ঘুম হারাম হয়ে যাওয়া উচিত। মুসলিম তরুণী লাঞ্ছিতের সংবাদে প্রতিশোধ স্পৃহায় বিশ্ব মুসলিমের ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। তাই আমাদের মুসলিম বোনদের লাঞ্ছিতের প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে। নরপশুদের কালো হাত ভেঙে গুড়িয়ে দিতে হবে। না হয় আমাদের সন্তানরা ওদের পাশবিকতা ও দন্তনখরাঘাতে বারবার রক্তাক্ত হবে।”

“প্রতিশোধ! কন্যা জায়াদের লাঞ্ছিত করার প্রতিশোধ!”

“আমি সেই প্রতিশোধ নিতেই প্রস্তুত।” সুলতানে আলী মাকাম!

“কাসেম! তারুণ্য এক ধরনের অন্ধত্ব।” বললেন সুলতান। “ছোট বেলায় আমি আমার শাইখ ও মুর্শিদের কাছে শুনেছি, মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার চেয়ে নেক কাজ করার প্রবণতা বেশী শক্তিশালী। কিন্তু সেই প্রবণতা মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি নিজ ইচ্ছা শক্তিকে নেক কাজ করার প্রতি ধাবিত করে তখনই সে পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আহ্! তোমার পিতার মৃত্যু আমাকে অতটুকু কষ্ট দেয়নি, যতটুকু কষ্ট দিয়েছে তার নৈতিক অবনতি। সারা জীবনের জিহাদ, ইসলামের খেদমতে নিজের অবদানকে সে মুলতানের ক'দিনের রং তামাশা আর আমোদ-আয়েশে জলাঞ্জলি দিয়ে দিল। এখানে ফিরে এসেছিল সে শুধু শরীরটি নিয়ে; তার হৃদয়কে মুলতানের নাচঘরেই সে হত্যা করে এসেছিল। এই মাটির পাপ পঙ্কিল দেহের মায়া ত্যাগ কর কাসেম, রূহকে পঙ্কিলতা মুক্ত রাখতে চেষ্টা কর। আমার মুর্শীদ শাইখ আবুল হাসান খিরকানী বলেছেন, মানুষের হৃদয় বা আত্মা আল্লাহ্‌র পবিত্র আমানত। যে এ পবিত্র আমানতে কালিমা লিপ্ত করল, সে আল্লাহ্‌র আমানতে খেয়ানত করল। কাসেম! আত্মাকে পবিত্র রাখতে চেষ্টা কর! তোমার পিতা তার রূহকে নাপাক করে ফেলেছিল-যার ফলে একজন

খ্যাতিমান কৃতি ব্যক্তিত্ব হওয়ার পরও তাকে অপমানজনক মৃত্যুবরণ করতে হলো। তার এই লজ্জাজনক পরিণতির জন্য আমার মনে খুবই কষ্ট কাসেম ....।

দেখো-মুলতানের সেই মেয়েটি পাপের সাগরে নিমজ্জিত থাকার পরও সে তার আত্মাকে নেক কাজে নিয়োজিত রেখেছিল। ইসলামের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল। যার ফলে আল্লাহ্ তাকে পাপপঙ্কিল জগৎ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সে-ই তোমার পিতার অধঃপতন ও চক্রান্তে জড়ানোর কথা আমাকে অবহিত করেছে। দেখো! ইসলামের জন্যে নিবেদিতা এক অবলা মহিলার দ্বারাও আল্লাহ্ তা'আলা কতো বড় কাজ নিতে পারেন। সে যদি আমাকে যথা সময়ে অবহিত না করতো, তবে না জানি আমাদের কতো কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতে হতো। কাসেম! তুমি হয়তো আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য জানো! এটাও হয়তো বুঝতে পেরেছো, পথে পদে পদে কঠিন বাধা ডিঙাতে হবে।"

"আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য কি এবং পথিমধ্যে কি কি বিপদ হতে পারে তা আমি জানি-সুলতানে আলী মাকাম। মেহেরবানী করে আপনি আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি নিজের পছন্দমতো সহযোদ্ধা নির্বাচন করতে পারি। আশা করি, বেঈমান গুপ্তঘাতকরা আমাদের অগ্রযাত্রা রুখতে পারবে না।"

সুলতান মাহমূদ সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহকে বললেন, "কাসেমকে তার পছন্দমতো সহযোদ্ধা নির্বাচনের সুযোগ দিন।"

অগ্রগামী দলে নির্ভীক, সাহসী ও পারদর্শী পাঁচ'শ যোদ্ধা বেছে নিলো কাসেম। তারা পেশোয়ার থেকে সবার আগে রওয়ানা হলো। এই দলের অধিনায়ক কাসেম বিন ওমর। কাসেমের অশ্ব সবার আগে। তার পাশাপাশি অন্য একটি ঘোড়ায় আরোহী এক মহিলা। কাসেম জানতো, নিকাব পরিহিতা সহযাত্রী কে। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর কাসেমের ঘোড়া থেমে গেল। থেমে গেল কাফেলা। কাসেম নিজ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে নিকাব পরিহিতার মুখোমুখি হয়ে বললো, "এখন আমাকে আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করে দাও মা!" মহিলার কদমবুচি করে বলল কাসেম।

মাও ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন। কাসেমের ডান বাহুতে তাবিজের মতো একটা ছোট্ট পুটলী বেঁধে বললেন—"এটা পবিত্র কুরআনের সেই আয়াত যার বরকতে সকল বাঁধা পায়ে দলে তোমরা মঞ্জিলে পৌঁছে যাবে সাফল্যের সাথে। শর্ত হলো, তোমার ঈমানদারীর উপর অবিচল থাকতে হবে। মানুষের শারীরিক সামর্থ অটুট রাখতে হলে ঈমানী শক্তি মজবুত থাকা অপরিহার্য। আলবিদা হে প্রিয় পুত্র! যদি তুমি জীবিত ফিরে এসো তাহলে খুশী হবো, তবে সবচেয়ে খুশী হবো যদি তোমার লাশ ফিরে আসে আর তোমার শাহাদাতের বিনিময়ে মুসলিম বাহিনী

বিজয় লাভ করে।” এতটুকু বলার পর মায়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। আবেগে তার শরীর কাঁপতে শুরু করল। দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর অঝোর ধারা।

কাল বিলম্ব না করে কাসেম এক লাফে অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসে ঘোড়ার বাগে টান দিল। চলতে শুরু করল অগ্রগামী কাফেলা। অনেক দূরে গিয়ে পিছনে ফিরে তাকাল কাসেম। একটি টিলার উপরে ছায়ার মতো অস্পষ্ট একজন অশ্বারোহী গোচরীভূত হলো। কাসেম অনুমান করল, তার মা হাত নাড়িয়ে তাকে আলবিদা জানাচ্ছেন। ঘোড়া সামনে চলতে লাগল। একটি উঁচু টিলা মা ও ছেলেকে অদৃশ্য করে দিল।

পেশোয়ারের এক বিশাল প্রান্তরে সেনাবাহিনীর সামনে এসে সুলতান মাহমূদ যখন দাঁড়ালেন তখন ভোরের অন্ধকার ভেদ করে পূর্বাকাশে সূর্য উঠছে। রসদপত্র বোঝাই করা দীর্ঘ সারি ধীরলয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সৈন্যরা সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

“মুজাহিদ ভাইয়েরা! আজ তোমরা আমার নির্দেশে নয়, আল্লাহ্‌র নির্দেশে অভিযানে বের হচ্ছো। তোমরা আজ এমন এক ভূখণ্ডে যাচ্ছো, যে ভূখণ্ড মুহম্মদ বিন কাসিম ও তাঁর সহযোদ্ধাদের আযানের ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল। কিন্তু বেঈমানেরা এখন আর সে দেশে উচ্চকিত হতে দেয় না সুমধুর আযানের আওয়াজ। সেখানে আজ ইসলামের নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম। মসজিদগুলো আজ পরিত্যক্ত। কাফের বেঈমানেরা অপবিত্র করছে আল্লাহ্‌র ইবাদতখানাগুলো, দুঃশাসন চলছে জালেমদের। তোমাদেরই বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হচ্ছে সে দেশের ঘরে ঘরে। সেই নির্যাতিতা মা বোনেরা তোমাদের আগমন অপেক্ষায় অধীর নেত্রে তাকিয়ে রয়েছে।

পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে যদি একজন মুসলিম নারীও নির্যাতনের শিকার হয় তবে সেই নির্যাতিতাকে রক্ষা করার জন্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা সক্ষম প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্যে অবশ্যকর্তব্য। পবিত্র কুরআন নির্দেশ দিয়েছে— “বেঈমানদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না জুলুমের অবসান হয়।” পৌত্তলিক বাহিনী তোমাদের উপর তিনবার আক্রমণ করেছে, প্রত্যেকবার তোমরা তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছো। হিন্দুরাজারা তোমাদেরকে পদানত, পরাজিত করে ইসলামের শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর। আজ যে অভিযানে তোমরা যাচ্ছো, এটা মামুলী দু'টি বাহিনীর যুদ্ধ নয়, দু'টি চির প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের সংঘাত।

ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম এবং মানবতার মুক্তির সনদ—এই অমোঘ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং পুনর্বার বেঈমানদের জানিয়ে দিতেই পরদেশে আজকের এই অভিযান। মুলতানের পথঘাট অপরিচিত হলেও তোমরা সেটিকে

পরদেশ মনে করো না, ওখানকার মাটি মুসলমানদের বরণ করতে উন্মুখ। মুলতানের বৃক্ষ-তরুলতা, মুলতানের যমীন বিন কাসিমের জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত, মুজাহিদ কাফেলার অশ্ব পদচারণায় ধন্য হতে উদগ্রীব। সেখানকার আলো-বাতাস, বৃক্ষ-তরুলতা পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষায় অধীর। তোমাদের স্বাগত জানাতে প্রতীক্ষায় রয়েছে মুলতানের প্রতি ইঞ্চি মাটি। মুলতানের আকাশ তোমাদের তকবীর ধ্বনিতে তৃপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় ব্যাকুল।"

সুলতান মাহমূদের আবেগ আপ্লুত ভাষণ দীর্ঘতর হতে লাগল। কমান্ডার ও অধিনায়কদের যুদ্ধকৌশল ও করণীয় সম্পর্কে অফিসিয়াল নিদের্শনা তিনি আগেই দিয়েছিলেন। অভিযান শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি সৈনিকের মনে এ প্রত্যয় তিনি জন্মানো জরুরী মনে করলেন যে, "তোমাদের এ যুদ্ধাভিযান দেশের ভৌগোলিক সীমানা বৃদ্ধির জন্য নয়, রাজত্ব প্রসারের উদ্দেশে নয়, এটি জিহাদ। মজলুম মুসলমানদের মুক্তির জিহাদ, ইসলামী ভূখণ্ডকে পুনর্দখলের জিহাদ। মুসলমানদের হৃত গৌরব উদ্ধারের জিহাদ, মুছে দেয়া ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করার জিহাদ।"

সুলতানের আবেগঘন অগ্নিঝরা বক্তৃতায় সৈনিকদের মধ্যে মনোবল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো বেঈমানদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিশোধ স্পৃহা, আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল প্রত্যেক সৈনিকের বুকে। গোটা বাহিনী প্রচণ্ড আক্রোশে বেঈমানদেরকে তুলোর মতো উড়িয়ে দিতে উদ্যত, সবাই তীব্র গতিতে শত্রুর মুখোমুখি হতে অস্থির হয়ে উঠল।

ওদিকে কাসেম বিন ওমরের অগ্রগামী দল বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সিন্ধু নদপারের নৌকাগুলোর কাছে পৌঁছে গেল। কাসেমের সেনা ইউনিট যখন পুলের মাঝামাঝি পৌঁছাল তখন এক ঝাঁক তীর এসে তার ঘোড়ার সামনে নৌকার পাটাতনে বিদ্ধ হলো। কাসেম সকলকে সতর্ক হতে বললো। ইত্যবসরে অপরদিক থেকে আওয়াজ ভেসে এলো—"সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে না, তাহলে তোমাদেরকে তীরের আঘাতে চালুনী বানিয়ে ফেলব।"

"তোমরা কে আমাদের পথ রোধ করার?" উচ্চ আওয়াজে বলল কাসেম। "আমরা সুলতান মাহমূদের সৈনিক। রাজা আনন্দপাল আমাদের রায়ত। এ পুল দিয়ে অতিক্রমে আমাদের কেউ বাধা দিতে চাইলে তার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ।"

"মহারাজা আনন্দ পালের হুকুম। এ পুল পেরিয়ে কোন যবনকে এদিকে আসতে দেয়া হবে না। তোমরা ফিরে যাও।"

কাসেম খেয়াল করল, ওপারের কোল ঘেঁষে উঁচু টিলা, ঘন বনবীথি। টিলার উপরে মাত্র ক'জন লোককে কাসেম দেখতে পেল। তার আন্দাজ করতে অসুবিধা হলো না, পুলের নিরাপত্তা ও মুসলিম বাহিনীকে রুখে দিতে আড়ালে আরো বহু সৈনিক লুকিয়ে রয়েছে।

মাত্র একজন সাথীকে নিয়ে দ্রুত গতিতে ওপারে পৌঁছে গেল কাসেম। টিলার উপরে দাঁড়ানো হিন্দু সৈনিক কাসেমকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—"কেন তুমি পুল পেরিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে এদিকে আসতে চাচ্ছো?"

"আমরা কারো উপর আক্রমণ করতে আসিনি।" জবাব দিল কাসেম। "আক্রমণ ও যুদ্ধের প্রশ্নই এখানে অবান্তর। কেননা এ ভূখণ্ডের রাজা আমাদের করদাতা। আমরা শুভেচ্ছা সফরে এসেছি, আমাদের পুল পার হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।"

"তোমাদের করদাতা রাজাইতো আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে, মুসলিম ফৌজ আসছে, ওদেরকে পুলের ওপর রুখে দিতে হবে।" বলল হিন্দু সৈনিক।

"তোমাদের রাজাতো এখানে থাকার কথা নয়। তিনি লাহোর বা বাটান্ডায় থাকার কথা।"

"মহারাজা এখান থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে তাঁবু ফেলেছেন।" বলল হিন্দু সৈনিক। "যদি তার কাছ থেকে পুল পার হওয়ার অনুমতি নিতে চাও, তাহলে তোমার সুলতান নয়তো উজীরকে পাঠাও।"

"আমিই সুলতান আমিই উজীর। আমাকেই তোমার রাজার কাছে নিয়ে চলো।" বলল কাসেম। "আমি কিছুতেই ফিরে যাবো না। তুমি যদি আমাকে আড়ালে লুকিয়ে থাকা তীরন্দাজদের মাধ্যমে বাধা দিতে চাও, তবুও তোমার বাধা আমি মানবো না। আমরা পুল ছাড়াও নদী পেরিয়ে আসতে পারবো। তবে তোমাদের জন্য রাজার অন্যায় নির্দেশ পালন করতে গিয়ে জীবন বাজী রাখা ঠিক হবে না।"

হিন্দু সেনারা তাকে সাথে করে রওয়ানা হল। কাসেম চতুর্দিক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেল, টিলার আড়ালে বহু সৈন্য লুকিয়ে রয়েছে। টিলা অতিক্রম করে একটু অগ্রসর হতেই তার নযরে পড়ল রাজা আনন্দপালের শিবির। কাসেম এলাকাটির ভৌগোলিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কাসেমের বুঝতে অসুবিধা হলো না, রাজা আনন্দপাল নিজে কেন সেনাবাহিনী নিয়ে শিবিরে অবস্থান করেছে!

রাজা আনন্দপালের শিবিরটি ছিল সবুজ শ্যামল ময়দানে। কাসেমকে একটি চৌকোণা উঁচু তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। কয়েকটি কক্ষ পেরিয়ে যাওয়ার পর সে দেখল, বিশাল একটি ঘরের মতো সাজানো গোছানো তাঁবুতে শাহী মসনদে রাজা আনন্দপাল উপবিষ্ট। তার পিছনে দাঁড়িয়ে অনিন্দসুন্দরী দু'তরুণী বাতাস করছে। রাজাকে আগেই অবহিত করা হয়েছিল, তার সাথে কে সাক্ষাৎ করতে আসছে। ফলে রাজার চেহারা ছিল ভাবগম্ভীর। তার চারদিকে রাজার শীর্ষ কর্মকর্তারা ও সেনাপতি দণ্ডায়মান।

"তোমাদের সুলতান কি নদী পার হতে চায়? তার এইদিকে আসার উদ্দেশ্য কি? কোথায় যেতে চায় সে?" কাসেমকে জিজ্ঞেস করল রাজা আনন্দপাল।

"আপনি আমাদের করদাতা। এখনও পর্যন্ত আপনি চুক্তির শর্তানুযায়ী কর পরিশোধ করেননি। চুক্তি মতে আপনি আমাদের অধীন। অতএব সুলতান কেন নদী পেরিয়ে এদিকে আসতে চান একথা জিজ্ঞেস করার অধিকার আপনার আছে কি? তবুও আমি আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সুলতান আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন না। আমরা নির্বিবাদে এইপথ অতিক্রম করার সুযোগ চাই।"

"তোমার ঔদ্ধত্যপনা ক্ষমা করে দিলাম। জেনে রাখো, আমি কারো করদাতা নই। তোমাদের সাথে চুক্তি করেছিল আমার পিতা, আমি কোন চুক্তি করিনি। তিনি মরে গেছেন। তোমাদের সুলতান আমাকে কখনও পরাজিত করেননি। কাজেই আমি কেন বাবার জরিমানা দিতে যাবো? তোমাদের সুলতানকে বলে দিও, সে কোথায় যেতে চায় তা আমরা জানি। আমরা কিছুতেই সুলতানকে মুলতানে সেনাঘাঁটি স্থাপন করতে দেবো না। পাহাড়ের ওপাশে কি ঘটছে তাও আমি জানি। এ মুহূর্তে তোমাদের সুলতান কোথায় আছে, তার সাথে কতো সৈন্য রয়েছে সবই আমি তোমাকে বলে দিতে পারব। তাকে ফিরে যেতে বলো। আমি তার অধীনতা অস্বীকার করছি। কেন তাকে কর দেবো। সে যদি একান্তই নদী পার হতে চায় তবে অনুমতির জন্যে তাকে আমার দরবারে আসতে বলো।"

"আমরা এমন অহংকারী কোন রাজার দরবারে সুলতানকে যেতে দেই না। আত্ম অহংকারে যে রাজা ঘাড় উঁচু করে রাখে আমাদের সুলতান তার নিকট আসার প্রয়োজনবোধ করেন না।। তিনি যদি এখানে আসতেও চান তবুও তাকে আমি আসতে দেবো না।" বলল কাসেম।

"ভদ্রভাবে কথা বল। তুমি আমাদের রাজদরবারের অপমান করছো।" হুংকার দিয়ে বলল এক আমলা। সে রাজার দিকে প্রতিশোধ আজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল। রাজা মুচকি হেসে বলল, "তুমি যেতে পার। তুমি তরুণ। এবার তোমার যৌবনের প্রতি দয়া করে ক্ষমা করে দিলাম। আর কখনও পুলে কদম রাখার দুঃসাহস করো না। তোমাদের সুলতান যদি যুদ্ধ করার ইচ্ছায় এসে থাকে, তবে তাকে বলো, আমরা প্রস্তুতই রয়েছি, সাহস থাকলে সে পুল অতিক্রমের চেষ্টা করে দেখুক।'

"আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি।" ক্ষোভ চেপে ফেলল কাসেম। "ফিরে যাচ্ছি।"

কাসেম ফিরে গিয়ে আনন্দপালের সেনাদের বাঁধা এবং সাক্ষাতের ঘটনা বিস্তারিত সুলতানকে জানাল।

"তোমার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ কাসেম। তুমি চমৎকার কূটনৈতিক চাল দিয়েছো। ওকে এমনই একটা সংশয়ের মধ্যে ফেলা দরকার ছিল।

দেখবে, আজ রাতেই আমি নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করব। তোমার অগ্রগামী ইউনিট পুলের কাছে অপেক্ষা করবে, আরেকটি অশ্বারোহী ইউনিট তোমার পিছনেই থাকবে সহযোগী হিসেবে। অন্য সৈন্যরা ভিন্ন পথে নদী পেরিয়ে আনন্দ পালের শিবিরে আক্রমণ শানাবে। তুমি আমার পয়গামের অপেক্ষা করবে। খবর পৌঁছার সাথে সাথে সহযোগীদের নিয়ে ঝড়ের বেগে পুল পেরিয়ে যাবে।

শত্রুবাহিনী তোমাদের মুখোমুখি থাকবে না-তোমাদেরকে ওরা পিছনে রাখবে তা বলা কঠিন। বুদ্ধি খাটিয়ে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে কাজ করবে। এখন পুলের পিছনে চলে যাও। খেয়াল রাখবে, কোন বাহিনী যাতে তোমাদের অবস্থান নির্ণয় করতে না পারে।"

"আরেকটা বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে খেয়াল রাখবে, কোন সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা দরবেশ ধরনের মানুষ বা সৈনিক যদি পুল পার হয়ে তোমাদের দিকে আসে তাকে অবশ্যই বন্দী করবে। এ সময়ে অপরিচিত যে কোন ব্যক্তিই শত্রুচর হওয়ার আশংকাই বেশী।"

সুলতান মাহমূদ সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহকে জানালেন, "রাজা আনন্দপাল নদীর ওপারে সেনাবাহিনী নিয়ে অপেক্ষমাণ। সে আমাদেরকে নদী পার হতে বারণ করে দিয়েছে। মাছ শিকারীর বেশ ধরে এখনই নদী তীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে যান, নয়তো দূরদর্শী কোন কমান্ডারকে পাঠান। আজ রাতেই নদী পার হয়ে আনন্দপালের শিবিরে আক্রমণ করতে হবে।" সুলতান মাহমূদ কাসেমের কাছ থেকে নদী তীরের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং ভৌগোলিক প্রকৃতি জেনে নিয়েছিলেন, যাতে নদী পেরিয়ে ওপারে উঠে নিজেদের গতি নির্ণয় সহজ হয়।

অপর দিকে রাজা আনন্দপাল সেনাবাহিনীর অর্ধেককে সিন্ধু নদের পুল পাহারায় নিযুক্ত করে, যাতে সুলতানের বাহিনীকে ওরা ওখানেই রুখে দিতে পারে।পুলটি ছিল কাবুল নদী ও সিন্ধুনদের মোহনা থেকে একটু উজানে। সুলতান মাহমূদ নদীর পরিস্থিতি জেনে আরেকটু উজানে অগ্রসর হয়ে সিন্ধু নদ পার হলেন। এখানে নদী ছিল চওড়া কিন্তু অগভীর। বেলা উঠার আগেই সুলতানের সকল সৈন্য নদী পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে গেল। তখন এক হাজার ছয় খ্রীস্টাব্দের বসন্তকাল।

রাজা আনন্দপাল ভাবতেও পারেনি, সুলতানের বিশাল বাহিনী পুল ছাড়াই এতো অল্প সময়ে নদী পার হয়ে যাবে। আনন্দপাল শংকাহীন ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। সুলতানের সরাসরি কমান্ডে যখন আনন্দপালের শিবিরে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল তখন তাদের পক্ষে প্রতিরোধ করার কোন সুযোগ নেই। আনন্দপালের যে সৈন্যরা পুলের পাহারায় ছিল ওরা ছিল সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত। রাজার শিবিরে আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ওরা প্রতিরোধে অগ্রসর হল, ইত্যবসরে বেলা উপরে উঠে এসেছে। এদিকে কাসেম সাথীদের নিয়ে সুলতানের পয়গামের জন্যে অধীর অপেক্ষায়

রয়েছে। সে একটি উঁচু টিলার উপর থেকে ওপারের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে দু'জনকে নিয়োগ করে রাখল। যারা সুলতান ও আনন্দপালের যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখছিল। ওরা যখন দেখল, পুল পাহারায় নিয়োজিত রাজার বাহিনী পাহারা তুলে নিয়ে ময়দানের দিকে দৌড়াচ্ছে, তখন তারা কাসেমকে ইঙ্গিতে ব্যাপারটি বোঝাল। কাসেম সঙ্গীদেরকে ঝড়ের গতিতে পুল পার হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে পুলের ওপারে পৌঁছে গেল। সবাইকে এক সাথে করে কাসেম আনন্দপালের পুল প্রহরী বাহিনীর পিছন দিক থেকে তীব্র গতিতে আক্রমণ করল।

রাজা আনন্দপাল প্রতি-আক্রমণের অবকাশই পেল না। পরিস্থিতি এমন হলো যে, রাজার পালানোই একমাত্র বিকল্প পথ। রাজা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। তার সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ল। অধিকাংশকে সুলতানের বাহিনী বন্দী করল, কিছুসংখ্যক পালাতে সক্ষম হলো আর বাকীরা নিহত হলো। সুলতানের বাহিনী আনন্দপালকে বর্তমান অজীরাবাদ পর্যন্ত তাড়া করেছিল। কিন্তু আনন্দপাল গরীব মাঝিদের মোটা অংকের বখশিশ দিয়ে পাঞ্জাব নদী পার হয়ে প্রাণে বেঁচে যায়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'সিন্ধু নদ' যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত।

পশ্চাদ্ধাবনকারী সুলতানের সৈন্যরাও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সুলতান দ্রুত দূত পাঠিয়ে বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে ঝিলাম নদীর পূর্বতীরে একত্রিত করেন। অবশ্য শত্রু বাহিনীর পিছনে পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলিম সৈন্যদের একত্রিত ও সমগ্র বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে এক মাস সময় লেগে যায়।

সুলতান মাহমূদ সেনাধিনায়ক ও কমান্ডারদের বললেন, "আমরা বিজি রায়ের অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। এই মুহূর্তে বিজি রায়ের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে চেষ্টা করা উচিৎ। আমাদের সৈন্যরা রণক্লান্ত। এছাড়া আমাদের আসবাব পত্র ও শত্রুবাহিনীর থেকে প্রাপ্ত বিপুল সম্পদও যুদ্ধাবস্থায় আগলে রাখা কষ্টকর হবে। এখন আমাদের লক্ষ্য দাউদ বিন নসর। আগে আস্তিনের কাল সাপটিকে খতম করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।"

এবার মুলতানের দাউদ বিন নসরের মসনদের দিকে যাত্রা করল সুলতানের বাহিনী। এবারও কাসেম বিন ওমরের ইউনিট অগ্রগামী। মুলতান যাত্রার তৃতীয় দিন। কাসেম বিন ওমর সবার আগে। তার পাশাপাশি দু'জন অশ্বারোহী আঞ্চলিক গাইড। হঠাৎ কাসেম চার পাঁচশ গজ দূরে একজন অশ্বারোহীকে দেখল। লোকটি ঘোড়া থামিয়ে কাসেমের বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করছিল। অগ্র পশ্চাৎ দেখে লোকটি দ্রুত একদিকে অশ্ব হাঁকালো।

অন্যরা ভাবলো, লোকটি হয়ত সৈন্যদলকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কাসেম মনে করল, লোকটি বিজি রায়ের চর হতে পারে, সে বিজি রায়কে মুসলিম বাহিনী আগমনের আগাম সংবাদ দিতে দৌড়াচ্ছে। কাসেম গাইডকে জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে বেরা কত দূর এবং কোনদিকে?"

গাইড বললো, “বেরা বেশী দূরে নয়, ঐ লোকটি তো বেরার দিকেই ঘোড়া দৌড়াচ্ছে।”

কাসেম বিন ওমর দু’জন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে পালায়নপর অশ্বারোহীর পশ্চাদ্ধাবন করল। লোকটি অনেক দূর চলে গেছে কিন্তু কাসেম ও সাথীদের ঘোড়াগুলো ছিল দ্রুতগামী। তারা দৌড়াচ্ছে। এক পর্যায়ে তাদের চোখে পড়ল বেরা দুর্গের উঁচু মিনার। পলায়নপর ও পশ্চাদ্ধাবনকারীদের মধ্যে ক্রমশঃ দূরত্ব কমে এলে কাসেম সাথীদের বলল—“তীর বের কর। ওকে জীবিত যেতে দেয়া যাবে না।” এক সাথী ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে বসেই তীর চালাল। একটি তীর লোকটির পিঠে আর একটি তীর ঘোড়ার পশ্চাদ্দেশে বিদ্ধ হলো। এতে পলায়নকারীর ঘোড়ার গতি আরো বেড়ে গেল। কাসেমের সাথীরা আরো দু’টি তীর নিক্ষেপ করল, “কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।”

ইতিমধ্যে শহরের সীমানা প্রাচীর তাদের গোচরীভূত হলো। সীমানা প্রাচীর দুর্গের মতোই উঁচু। পলায়নপর অশ্বারোহী শহরের প্রবেশদ্বারে ঢুকে পড়লে কাসেম ও সাথীরা ঘোড়া ফিরিয়ে নিল।

বিজি রায় দরবারে উপবিষ্ট। তার প্রধান সেনাপতি তাকে রিপোর্ট শুনাচ্ছিল। গুপ্ত বাহিনী দেড় মাস হয়ে গেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা মাহমূদের কোন সৈনিকের দেখা পায়নি। বিজি রায়ের সামনে ছিল ষড়যন্ত্রের সেই নকশা যা দাউদ বিন নসর আসেম ওমরকে দিয়েছিল। বিজি রায় তাদের তৈরী পথে সুলতানের বাহিনীকে গুপ্ত আক্রমণে পর্যুদস্ত করার জন্যে বহু সংখ্যক ঝটিকা বাহিনী নিয়োগ করে রেখেছিল। আর প্রতিদিন আশা করতো, ঘুম থেকে উঠে সে শুনবে, তার গুপ্ত বাহিনীর হাতে মাহমূদের বাহিনী পর্যুদস্ত হতে শুরু করেছে। এরপর প্রতিদিন তাকে তার সৈন্যদের সাফল্য গাঁথার ফিরিস্তি জানানো হবে। কিন্তু দেড় মাস অতীত হয়ে গেল, সংবাদ তো দূরে থাক তার বাহিনী মুসলিম সৈন্যদের দেখাই পেল না। এটা ছিল বিজি রায়ের জন্যে এক চরম হতাশাজনক বিষয়।

আচ্ছা, “তাহলে মুসলিম বাহিনী গেল কোথায়?” ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সেনাপতির কাছে জানতে চাইল বিজি রায়। “পেশোয়ার থেকে খবর পাওয়া গেল, ওখান থেকে মাহমূদের বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেছে; তাহলে ওরা গেল কোথায়? উধাও হয়ে গেল?”

“আমার মনে হয়, দাউদ আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে, নয়তো সুলতান মাহমূদের দূত আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে। মুসলমানকে বিশ্বাস করা আপনার ভুল হয়েছে মহারাজ!” বলল সেনাপতি।

এমন সময় বিজি রায়কে খবর দেয়া হল, এক সৈনিক পিঠে তীরবিদ্ধ হয়ে দুর্গে ফিরে এসেছে। বিজি রায় কিছু বলার আগেই তীরবিদ্ধ সৈনিক দরবারে প্রবেশ করল। তার পিঠে তখনও তীর বিদ্ধ , সারা শরীর রক্তাক্ত।

আহত সৈনিক বলল, "আমি পর্যবেক্ষণের এক পর্যায়ে সেনাবাহিনীর ছোট একটি ইউনিট দেখে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে দাঁড়াই। ওরাও এগুতে থাকে। যখন বুঝতে পারি, ওরা সুলতান মাহমূদের সৈনিক, তখন ফিরে আসতে ঘোড়া দৌড়াই। কিন্তু ওদের দুই অশ্বারোহী আমার পিছনে অশ্ব হাঁকায়। ওরা পরপর কয়েকটি তীর ছুঁড়ে। একটি আমার পিঠে বিদ্ধ হয় আরেকটি আমার ঘোড়ার কোমরে আঘাত হানে। আমার বিশ্বাস, এরা মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দল।"

"হ্যাঁ, ওরা সেই বাহিনীর অংশ যাদের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।" বলল বিজি রায়। সেনাপতিকে বিজি রায় বলল, "আমরা মাহমূদকে শহর ঘিরে ফেলার সুযোগ দেব না। ওরা দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত। আমরা ওদেরকে শহর থেকে দূরে আমাদের সুবিধা মতো জায়গায় লড়তে বাধ্য করব। এক্ষুণি তোমরা শহর ছেড়ে বাইরে অবস্থান নাও।"

একটু পরেই বেজে উঠল যুদ্ধ নাকারা! বেরার সৈন্যদের মধ্যে রণপ্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। জঙ্গী হাতির চিৎকার, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি আর সৈন্যদের শোরগোলে মুখর হয়ে উঠল বিজি রায়ের রাজধানী। একদল সৈন্যকে আগে পাঠিয়ে দেয়া হলো, মুসলিম বাহিনী কতদূর এসেছে তার খবর নিতে। একটু পরেই সংবাদ এলো, মাহমূদের সেনাবাহিনী শহর থেকে দশ মাইল দূর দিয়ে অতিক্রম করছে। বিজি রায় নির্দেশ দিল, আমাদের সেনাবাহিনীকে ওর পথ রোধ করে রণপ্রস্তুতিতে থাকতে হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিজি রায়ের সেনাবাহিনী শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কাসেম বিন ওমর অগ্রগামী বাহিনীর পশ্চাতে প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহকে জানাল, "এক শত্রুসেনা আমাদের দেখে পালাতে ছিল, সে আমাদের তীরে আহতাবস্থায় শহরে ফিরে গেছে।" আবু আব্দুল্লাহ সাথে সাথে সুলতান মাহমূদকে খবরটি অবগত করালেন। সুলতান এ সংবাদ শুনে দারুণ বিমর্ষ হলেন। কিছুক্ষণ ভেবে তিনি রসদসামগ্রী বোঝাই কাফেলাকে ওখানেই থামিয়ে দিলেন। আসবাব পত্রের পাহারার জন্যে কিছু সৈন্যকে নিযুক্ত করে কাসেমকে বললেন, "বিজি রায়ের সৈন্যদের গতিবিধি দেখে আমাকে জানাও।"

শত্রু সৈন্যদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে কাসেম সুলতানকে যে সংবাদ দিল তা মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। বিজি রায় শহর থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে সুলতানের গমন পথে রণ প্রস্তুতিতে রেখেছে গোটা সেনাবাহিনীকে। জায়গাও বেছে নিয়েছে তার সুবিধামত। হস্তিবাহিনীকে সে সবার আগে রেখেছে।

সুলতান হস্তিবাহিনীর দুর্বলতা জানতেন। হাতি আহত হলে স্বপক্ষের জন্যে কতটুকু বিপদ বয়ে আনে এর অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট। তিনি পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তীর ধনুক ও বর্শাসজ্জিত পদাতিক বাহিনীকে হস্তিবাহিনীর মোকাবেলার জন্যে নির্দেশ দিলেন। কয়েকটি হাতি আহত হয়ে বিকট চিৎকারে উল্টোপথে

দৌড়াল, কিন্তু ওদের পিছন দিকটা ছিল মুক্ত। আহত হাতি ওদের জন্যে কোন ক্ষতির কারণ হলো না।

সুলতান একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি বিজি রায়ের রণকৌশলে বিস্মিত হলেন। এই প্রথম তিনি হাতির সফল ব্যবহার দেখে অবাক হলেন। সুলতান দেখলেন। তার পদাতিক বাহিনী হস্তিবাহিনীর মোকাবেলায় পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি অশ্বারোহী বাহিনীকে ওদের সহযোগিতার জন্যে নির্দেশ দিলেন। এক হাজার অশ্বারোহী ইউনিট ওদের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু বিজি রায়ের অশ্বারোহী বাহিনী সুলতানের অশ্বারোহীদেরকে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলল। ফলে মুসলমান অশ্বারোহীরো পদাতিক সৈন্যদের সাহায্যে ওদের কাছেই যেতে পারল না।

হিন্দু সৈন্যরা প্রচণ্ড উদ্যম ও সাহসিকতার সাথে মুসলিম সৈনিকদের তাড়া করছিল, ওদের কমান্ডিং নির্দেশনাও ছিল নিপুণ। সুলতান মাহমূদ ওদের পিছন দিকে একটি ইউনিট পাঠালেন ওদিক থেকে আক্রমণ করতে কিন্তু ওরা পিছন দিকটাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল আগে থেকেই। যে মুসলিম সৈন্যদল পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল হিন্দু সৈন্যরা ওদের ঘেরাও করে ফেলল। ওরা আক্রমণ তো করতেই পারেনি, নিজেদের প্রাণ রক্ষা করাই মুশকিল হয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে হিন্দুবাহিনী মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে হস্তিদল লেলিয়ে দিল। খুব কষ্টে বহু হতাহতের পর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে মুসলিম বাহিনীর একাংশ ওদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো। এভাবেই এদিনের বেলা অস্তমিত হলো। সুলতান প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়ে ভাবছেন, কী করবেন।

আশু পরাজয় নয়তো পশ্চাদপসরণ ছাড়া সুলতান বিজয় লাভের কোন পথ খোলা দেখছেন না। সুলতান বহু দূর পথ ঘুরে বেরা শহরের কাছে গিয়ে দেখে নিলেন, রাজধানীতে আক্রমণ করে বিজি রায়ের মনোনিবেশ ময়দান থেকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় কি-না। কিন্তু তারও কোন সুযোগ ছিল না। বিজি রায় শহর রক্ষায়ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। শহরের বাইরে অসংখ্য মোরচাবন্দী সৈনিককে সে নিযুক্ত করে রেখেছিল রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষায়। এদিকে সে রাতে সুলতানের রসদপত্রেও হিন্দুরা আক্রমণ করে বসল। এই প্রথম সুলতান দেখলেন, হিন্দুরা তারই কৌশল অবলম্বন করে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

নির্ঘুম কাটল সারা রাত। সুলতান সবে মাত্র ফজরের নামায শেষ করলেন। তখন পদাতিক বাহিনী দিয়ে আক্রমণ চালানো হলো কিন্তু ফল হলো বিরূপ। মুসলিম সৈন্যরা যেটিকে শত্রুবাহিনীর বাহু মনে করেছিল আসলে সেটি বাহু ছিল না, ছিল ফাঁদ। সেই ফাঁদে পা দিয়েছিল সুলতানের পদাতিক সেনাদল।

পদাতিক বাহিনীর বিপর্যয়ে সেনাপ্রধান কাসেম বিন ওমরের অশ্বারোহী বাহিনীকে ওদের জায়গায় পাঠালেন। কাসেমের দল জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়ল। লাশের পর লাশ পড়লেও কাসেমের সাথীরা শত্রুর মোকাবেলায় পিছপা হলো না। তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠল রণাঙ্গন। ময়দান জুড়ে সারি সারি মৃতদেহ। আহতদের আর্তচিৎকার ও জখমী সওয়ারের ক্রন্দনে পরিবেশ ভয়ংকর রূপ নিল, কিন্তু কোন পক্ষই মোকাবেলায় পিছুটান না দিয়ে হামলা আরো তীব্র করতে লাগল। তীব্র লড়াইয়ের মধ্যেই বেলা শেষে নেমে এলো সন্ধ্যা।

তৃতীয় দিনের শুরুতে সুলতানের সৈন্যসংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। বাকী সবাই হয়তো নিহত না হয় আহত হয়ে পড়ল। রসদ সামগ্রীও নিঃশেষ প্রায়। তৃতীয় দিনের প্রাণপণ মুকাবেলায়ও লড়াইয়ের যবনিকাপাত না ঘটায় সুলতান হতোদ্যম হয়ে পড়লেন। তিনি একবার ভাবলেন, এভাবে সৈন্যদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া অর্থহীন। কিন্তু তৃতীয় দিন মুসলিম সৈন্যরা আক্রমণ আরো শাণিত করল, তাদের আবেগ ও আক্রমণের তীব্রতা দেখে সুলতান সিদ্ধান্ত বদলে ফেললেন-তিনি তার দেহরক্ষী বাহিনীর উদ্দেশে বললেন, "মুজাহিদ ভাইয়েরা! বিজয়ের জন্যে আমি আমার জীবনকে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করলাম। এখন থেকে যুদ্ধের কমান্ড করব আমি স্বয়ং।" সুলতানের আবেগ ও অগ্নিঝরা বক্তৃতায় রিজার্ভ ও তার দেহরক্ষী সৈন্যদের খুন টগবগ করে উথলে উঠল। সৈন্যদের তাকবীর ধবনিতে বেরার আকাশ কেঁপে উঠল। রিজার্ভ বাহিনী নিয়ে সুলতান ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মুসলিম বাহিনী সিংহের মতো গর্জে উঠল শত্রুর মোকাবিলায়। শত্রু বাহিনীও শেষ শক্তি ঝেড়ে ছিল প্রতিআক্রমণে। কিন্তু তখনও বিজি রায়ের বাহিনী ময়দানে অবিচল। এক পর্যায়ে সুলতান নিজের বাহিনীকে পশ্চাৎ অপসারণ করে নিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে দু'রাকাত নামায পড়লেন। নামায শেষ করে সালাম দিয়েই তিনি এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন-হাঁক দিলেন, "মুজাহিদ ভাইয়েরা! আল্লাহ্ আমাকে বিজয়ের ইশারা করেছেন। বন্ধুরা! এগিয়ে যাও। বেঈমানদের নিঃশেষ করো।" সুলতানের আহবানে স্তিমিত আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে উঠল মুসলিম বাহিনী। প্রচণ্ড আওয়াজে হায়দরী হুংকারে গর্জে উঠল মুসলিম বাহিনী। একই সাথে গগনবিদারী তকবীর তুলে লাফিয়ে পড়ল সকল অশ্বারোহী শত্রু নিধনে।

সুলতান যখন আল্লাহ্র দরবারে সিজদাবনত, বিজি রায় তখন পণ্ডিতদের নিয়ে দেবীর পূজায় মগ্ন। মুসলমানদের অবিচল শক্তি আর পরাক্রম দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত বিজি রায় দেবীর চরণে পড়ে হাউ মাউ করে সাহায্য প্রার্থনা করছিল। বিজি রায়ের কাছে যখন পুনর্বার মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের খবর দেয়া হলো, তখন সে মূর্তির পা ধরে সাহায্যের জন্যে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে মূর্তির পায়ে চুমু খেয়ে বিজয়ের আশায় অগ্নিমূর্তি ধারণ করে ময়দানে হাজির হলো। এসেই সে শুনতে পেল গগনবিদারী কণ্ঠ—"মুজাহিদ ভাইয়েরা! বিজয় নয়তো শাহাদত। আল্লাহ্র

সিপাহীগণ! এটা মূর্তিপূজক ও তাওহীদে বিশ্বাসীদের সংঘাত। মুজাহিদ ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌র যমীন থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়? বিজয় নয়তো শাহাদাত, সামনে এগিয়ে যাও!"

যুদ্ধের দৃশ্য এ মুহূর্তে বদলে গেল। মুসলমানরা এখন বেপরোয়া। তাদের সামনে একটাই লক্ষ্য, বিজয়। গোটা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে একই জোশ, একই চেতনার প্রজ্বলন। তাদের চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি ঝড়ছে, তরবারী লাভা উদগীরণ করছে, যেন আগ্নেয়গিরি তার জ্বালামুখ খুলে দিয়েছে। আগুনের লাভা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ময়দানে। সুলতান নিজেই কমান্ড দিচ্ছেন। তার তরবারীর আঘাতে সারি সারি মানবদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। তিনি যেদিকেই যাচ্ছেন শত্রুবাহিনী কচুকাটার মতো সাফ হয়ে যাচ্ছে। প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ দেখছেন, সুলতানের আবেগ অত্যুঙ্গে। তিনি সুলতানের নিরাপত্তার ব্যাপারটি সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিলেন। তার ডান-বামে-পিছনে ছোট তিনটি বিশেষ বাহিনীকে নিযুক্ত করলেন। নির্দেশ দিলেন, যে কোন মূল্যে তোমরা সুলতানের উপর আক্রমণ প্রতিহত করবে। আবু আব্দুল্লাহ্ দেখলেন, শত্রুবাহিনী এখন দিশেহারা। বিজি রায়ের বাহিনী রণক্লান্ত, ময়দানে লাশের স্তূপ জমে গেছে, সম্মুখ ভাগে মুসলিম বাহিনীর তীব্রতার কাছে শত্রু বাহিনী আক্রমণাত্মক নয় এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। তাই তিনি মুসলিম বাহিনীর দুই বাহুতে ও পশ্চাৎদিকে নিরাপত্তা বিধানের কঠোর নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে দু'প্রান্তের মুজাহিদদের বললেন, "তোমরা আক্রমণ আরো তীব্র করো।"

দেখতে দেখতে যুদ্ধের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। বিজি রায়ের সম্মুখভাগের সেনাবল কমে এলো। বিজি রায় শহররক্ষীদের নির্দেশ দিল ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে। শহরের নিরাপত্তারক্ষীরা নিমিষে ময়দানে চলে এলো। এই প্রচণ্ড যুদ্ধাবস্থায় দিনমণি শেষ আলোর ঝলকানী দিয়ে আঁধারে হারিয়ে গেল। সুলতান শত্রুবাহিনীকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি রেখে আক্রমণের ইতি টানলেন।

শহরের নিরাপত্তারক্ষীদের ময়দানে চলে আসার ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আবু আব্দুল্লাহ্ রাতের আঁধারে ঝটিকা আক্রমণে রাজধানী তছনছ করে ফেললেন। শহরের প্রধান ফটক ভেঙে গুড়িয়ে দিলেন। দুর্গ প্রাচীরের কয়েক জায়গা ধসিয়ে দিলেন বিস্ফোরক ব্যবহার করে। পরদিন প্রত্যূষে আর কোথাও বিজি রায়ের পতাকা উড্ডীন দেখা গেল না। হিন্দু সৈন্যবাহিনী বিক্ষিপ্ত। বিজি রায়ের খোঁজ নেই। বহু খোঁজাখুঁজির পর অনেক দূরের এক মাঠে সৈন্য বেষ্টিত বিজি রায়কে একদল মুসলিম সৈন্য দেখতে পেয়ে ওদের দিকে ধাবিত হল। মোকাবিলা না করে বিজি রায়ের নিরাপত্তারক্ষীরা যে যেদিকে পারে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। বিজি রায়কে

ঘিরে ফেলল সুলতানের সিপাহীরা। তাকে আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিল দলপতি। কিন্তু বিজি রায় অস্ত্র না ফেলে নিজের তরবারী নিজের পেটে ঢুকিয়ে দিল।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বিজয়ী বেশে সুলতান বিজি রায়ের রাজধানী বেরায় প্রবেশ করলেন। দু'শর চেয়ে বেশী প্রশিক্ষিত হাতি তাদের দখলে এলো। রাতের আঁধার নেমে এসেছে তখন। চতুর্দিকে বহু দূর পর্যন্ত লাশ আর লাশ। উভয় পক্ষের অধিকাংশ সৈন্য হয় মৃত নয়তো আহত। সারা ময়দান ও শহর জুড়ে আহত সৈন্যের আর্তচিৎকার, করুণ আর্তি আর আহত জন্তুর বিকট চেচামেচি। বহু মশাল জ্বালিয়ে মুজাহিদরা আহত সাথীদের খোঁজে বের হলেন। লাশের পর লাশের স্তূপ থেকে উদ্ধার করতে লাগলেন পড়ে থাকা সহযোদ্ধাদেরকে। লাশের স্তূপের মাঝে আহত কাসেম মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় মাঠে শোনা গেল একটি নারীকণ্ঠ। কাসেম.....! কাসেম......! বেঁচে থাকলে আমার ডাকে সারা দাও! কাসেম.....তুমি কামিয়াব, আমার আশা সফল হয়েছে আজ। আল্লাহ্ আমার দু'আ কবুল করেছেন.....। কাসেম বলো, তুমি কি বেঁচে আছো....?

চার কুমারী দুর্গ

আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে সেই রাতের চাঁদের আলোও ছিল রক্তিম। আকাশ ছিল ধূসর বিবর্ণ। সুলতান মাহমূদের সেনারা টানা তিন দিন মরণপণ যুদ্ধে যে রক্ত নদী প্রবাহিত করেছিল এবং যে ধুলোবালি বেরার আকাশে উড়িয়ে ছিল তাতে সে আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ধূলির আস্তরণে। চাঁদনী রাতের ফ্যাকাশে আলোয় যে পর্যন্ত দৃষ্টি যেতো, তাতে মৃতের লাশ, শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ আর আহত জখমী সৈন্য, ঘোড়া, উট আর হাতির মিলিত চিৎকারে পরিবেশ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। রাতের নিস্তবদ্ধতা নয় সেদিনকার বেরা ছিল একটি ধ্বংসযজ্ঞের মূর্তিমাণ চিত্র। মাইলের পর মাইল যমীন মানুষের রক্তে লাল রং ধারণ করেছিল।

সেই যমীন আজকের পাকিস্তানের অংশ। বিজয়ী ভূখণ্ডটি বর্তমান পাকিস্তানের হলেও ওখানে শহীদ যোদ্ধাদের কারো ঠিকানা পাকিস্তানে ছিল না। তারা এসেছিল সুদূর গজনী হতে। গজনী থেকে এসে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী সুলতানের সহযোদ্ধারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয়ভূমি উদ্ধার করেছিলেন পৌত্তলিক হায়েনাদের দখল থেকে। সেই বিরাণ মসজিদগুলো মুক্ত করেছিলেন শেরেকী চর্চার নাপাক গ্রাস থেকে। সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মসজিদগুলোকে পরিণত করেছিল মদালয় ও ঘোড়ার আস্তাবলে। মসজিদগুলো তারা আবার উচ্চকিত করেছিল এক আল্লাহ্র জয়গানে, মসজিদে মসজিদে আবারো চালু করেছিল একত্ববাদের বিজয়ধ্বনি "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।"

অসংখ্য আহত মুসলিম যোদ্ধার কাতর আর্তি আর দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও ছিল পৌত্তলিকদের পদানত করার শুকরিয়া। মৃত্যুপথযাত্রী মুজাহিদরা কষ্ট ভুলে গিয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছিল ভয়ংকর শত্রুদের পরাজয়ে এবং সুলতানের শত্রুদেশে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করার সাফল্যে। অনেকের দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তারা বাবারে মারে, মরে গেলাম বলে আহাজারী করেনি, তাদের মুখে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা, বিজয়ের জন্যে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রকাশে ধ্বনিত হলো, আল হামদুলিল্লাহ্।

সেই যোদ্ধারা ছিল অটল অবিচল ঈমানের অধিকারী, ইসলামী আকীদা-আমলে দৃঢ় বিশ্বাসী। তারা মাতৃভূমি ছেড়ে সুদূর মুলতানে এসেছিল, মুসলিম কন্যা জায়াদেরকে মুশরিক পাষণ্ডদের পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করতে, যেসব মুশরিক-পশুরা মুসলিম মেয়েদেরকে দাসী বানিয়ে তাদের ইজ্জতের উপর পাশবিক উৎপীড়ন চালাচ্ছিল। তারা এসেছিল আল্লাহ্র পূজারীদের হৃত ইবাদতখানা আবার আল্লাহ্র দাসদের জন্যে মুক্ত করে দিতে।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে সেদিন পৌত্তলিক হায়েনাদের কবল থেকে গজনীর শার্দূলেরা নির্যাতিত মুসলিম অবলাদের মুক্ত করেছিল। যারা জীবিত ছিল তারা যুদ্ধের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মশাল হাতে সারা প্রান্তর খুঁজে ফিরছিল সাথীদের মৃতদেহ এবং বেঁচে থাকা আহত সহযোদ্ধাদের। শতশত মশাল রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়েছিল বেরার মাঠে-প্রান্তরে। শত্রুসৈন্য আর আহত মুজাহিদের আর্তি, গগন বিদারী চিৎকারে সেই রাতে যেন কেয়ামত নেমেছিল বেরার যমীনে। আহত উট, ঘোড়া আর হাতিদের বিচিত্র গোঙ্গানী সৃষ্টি করেছিল এক ভয়ংকর পরিস্থিতির।

অগণিত মানুষের করুণ আর্তি আর অশ্ব হস্তির বিকট চিৎকারের মধ্যে মুজাহিদরা শুনতে পেল ক্ষীণ আওয়াজের এক নারী কণ্ঠ-কাসেম...! কাসেম....! জীবিত থাকলে সাড়া দাও। বড়ো অস্থির, দিগভ্রান্তের মতো দিগ্বিদিক দৌড়াচ্ছিল এক মশালবাহী। কখনো সে কোন আহতের মুখের কাছে মশালটি নিয়ে দেখছিল লোকটির চেহারা, হতাশ হয়ে আবার দৌড়াচ্ছিল মশাল উঁচু করে। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল কাসেম......! কাসেম.....! আমার ডাকে সাড়া দাও !......আমি তোমাকে খুঁজছি।

এই মৃত্যুপুরিতেই এক জায়গায় মারাত্মক আহতাবস্থায় পড়েছিল কাসেম। সারা শরীরে তার অসংখ্য ক্ষত। অত্যধিক রক্তক্ষরণে সে শক্তিশূন্য। মাথা তুলে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, চোখ মেলে পৃথিবীটা দেখার শক্তিও তার নেই। হুঁশ জ্ঞান পুরোপুরি লোপ না পেলেও যুদ্ধের ভয়াবহতার কিছুই মনে নেই কাসেমের।

কাসেম.......! কাসেম......! নারী কণ্ঠের এই মায়াবী আওয়াজ ইথারে ভাসতে ভাসতে তার কানেও ধ্বনিত হচ্ছিল। কিন্তু তখন এ জগতের চেয়ে পরকালেরই ভাবনায় তন্ময় ছিল কাসেমের হৃদয়। ভাবছিল, সে হয়তো তার বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছে নিজের জীবন এবং শরীরের সবটুকু রক্তের বিনিময়ে। তাই আকাশের হুরপরী ও ফেরেশতারা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে মর্তজগতে এগিয়ে আসছে। তার মস্তিষ্কের পরতে পরতে এসব ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।

এক পর্যায়ে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল কাসেম ..... কাসেম......আহবান। ধ্যান ভেঙে গেল কাসেমের। স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল তার মায়ের অবয়ব। বাবার অপরাধের কথা মনে পড়ায় সে কুঁকড়ে উঠল। তার মনে পড়ল, মা তাকে বাবার তরবারী হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করলাম, তোমাকে আমি মৃত অথবা দুশমনের তরবারী বিদ্ধ অবস্থায় দেখতে চাই। তবে মৃত্যুর আগে তুমি এ তরবারী দিয়ে কম করে হলেও শত দুশমন সংহার করবে। তবেই আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা লাঘব হবে।"

তার স্মরণ হলো....সে তার বাবার তরবারী মাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, এ তরবারী আমাকে দিও না মা! এটি নাপাক হয়ে গেছে। এতে লেগে রয়েছে মদ নারীর নাপাক প্রভাব।

তার আরো মনে পড়ল, পেশোয়ার থেকে রওয়ানা হওয়ার পর অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়ে তার ডান হাতের বাহুতে একটি কুরআনের আয়াত সম্বলিত তাবীজ বেঁধে দিয়ে মা বলেছিলেন—"আল বিদা আমার কলিজার টুকরো। তুমি জীবিত ফিরে এলে খুশী হবো, কিন্তু তোমার লাশ যদি বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসে তবে আরো বেশী খুশী হবো।" কানে বাজল প্রধান সেনাধ্যক্ষ আবু আব্দুল্লাহকে মায়ের অনুরোধ—"আমি আমার একমাত্র ছেলেকে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করে দিচ্ছি, তাকে তার বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেয়ার বিনীত অনুরোধ করছি।"

তখনও কাসেমের ক্ষতস্থান দিয়ে অঝোর ধারায় খুন ঝরছে। এই স্মৃতিগুলো কাসেমের অনুভূতিকে জাগিয়ে দিল চরমভাবে। মায়ের প্রতিটি কথা তার কানে অনুরণিত হচ্ছে। আনচান করে উঠল কাসেমের আহত হৃদয়। হায়! কোথায় আছি আমি! মায়ের কাঙ্ক্ষিত বিজয় কি অর্জিত হয়েছে? আমি কি বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছি? সুলতান কোথায়? কোথায় আছেন সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্? আমার সাথীরা কেমন আছে? তারা সবাই গ্রেফতার হয়নি তো? সুলতান কি পশ্চাদপসরণ করেছেন? বেরা দুর্গকি দখলে এসেছে? আমার তরবারী মায়ের কাছে কে পৌঁছাবে? কে তাকে বলবে, তোমার ছেলে এই তরবারী দিয়ে শত নয় হাজারো দুশমনকে মৃত্যুর স্বাদ দেখিয়েছে। এতেও কি তোমার আত্মা শান্তি পাবে না? এমন হাজারো প্রশ্ন আহত কাসেমের কষ্ট আরো বাড়িয়ে তুলছে।

কাসেমের জানার উপায় ছিল না, সুলতান বিজয়ী হয়েছেন। এখন তিনি বিজি রায়ের রাজমহলে বসে অধিনায়ক ও কমান্ডারদের কাছ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতির রিপোর্ট নিচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানে ব্যস্ত রয়েছেন। অপর দিকে বিজি রায় নিজের তরবারী দিয়েই আত্মহত্যা করেছে।

যুদ্ধের পরিণতি চিন্তায় তার মন অস্থির হয়ে উঠল। আহত যন্ত্রণা ভুলে গেল সে। উঠে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু তার হাত-পায়ের একটিও অক্ষত নেই। তরবারী আর বর্শার আঘাতে কাসেমের সারা শরীর জর্জরিত। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠল। উঃ শব্দ বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। বসে পড়ল কাসেম। কিন্তু না, বসে থাকাও সম্ভব হলো না তার। সুলতান, সেনাবাহিনী ও মায়ের আকাঙ্ক্ষা তার অসার দেহে শক্তির সঞ্চার করল। এবার মাটিতে ভর দিয়ে অনেক কষ্টে কোমর সোজা করে দাঁড়াল কাসেম। চারদিকটায় একবার চোখ বুলাল। দেখছে, অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে ফিরছে অনেকগুলো মশাল। বিবর্ণ চাঁদের আলো।

চাঁদ একটু পর পর ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে। এরই মধ্যে আবার কানে ভেসে এলো সেই আহবান—কাসেম....! কাসেম....! তুমি কোথায়? পাশাপাশি শোনা গেল পুরুষের ভারী কণ্ঠ—"এই মহিলা হয়তো কাউকে খুঁজছে। ওকে কেউ নিয়ে যাও।"

"সে কাসেমের লাশ তালাশ করছে?" বলল একজন। তাকে বল, আমরা আহত এবং মৃতদের তুলে নিচ্ছি। কে সে, তার পরিচয় নিও।

লোকগুলো কথা বলছিল গজনীর ভাষায়। কাসেম তাদেরকে হাঁক দিয়ে তার অবস্থান জানান দিতে চাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের আওয়াজ সে নিজেই শুনতে পেল না। কঠিন যন্ত্রণা ও অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণে তার শরীরে সামান্য শক্তিও ছিল না। তাছাড়া ময়দান আহত যোদ্ধা ও সওয়ারীদের শোরগোলে মুখরিত। উচ্চ আওয়াজে কথা বলা ছাড়া আর কাউকে ডাকার উপায় ছিল না। মশালগুলো কাসেমের কাছ থেকে বেশী দূরে ছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছে এগুলো তার কাছে এখন যোজন যোজন দূরত্বের সমান। কাসেমের পক্ষে সম্ভব ছিল না এক কদম অগ্রসর হওয়া। পায়ের রগ কেটে যাওয়ার কারণে পা ফেলে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করলে পড়ে গেল কাসেম। অনেক কষ্টে মাথা সোজা করে বসল। এমন সময় কানে ভেসে এলো পানি.....পানি.....।

আওয়াজ লক্ষ্য করে দেখল কাসেম, তার সামনেই কাতরাচ্ছে এক জখমী সৈনিক। কিন্তু গজনীর সৈনিক হলে তো সে 'পানি'র বদলে 'আব' বলতো। নিশ্চয় লোকটি মুলতানের। হিন্দু সৈনিক হবে। মায়ের মাতৃভাষা মুলতানী হওয়ার কারণে কাসেমও জানতো ভারতীয় হিন্দুরাই 'পানি' বলে। পানির কথা শুনে কাসেমের বুকের মধ্যে তৃষ্ণা হাহাকার করে উঠল। বুকটা যেন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে। কখন কোথায় পানি পান করেছিল মনেই নেই। সুলতানের মতো যুদ্ধের ভয়াবহতায় সেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিল। তার স্মৃতিতে শুধুই যুদ্ধ এবং মায়ের কণ্ঠই ধ্বনিত হচ্ছিল। কাসেম ছিল অগ্রণী দলের কমান্ডার। সুলতান যখন যুদ্ধের কমান্ড নিজের দায়িত্বে নিয়ে বিজি রায়ের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানেন তখন কাসেম সুলতানের পাশেই মরণপণ যুদ্ধ লিপ্ত ছিল। তার সাথীদের অধিকাংশই শহীদ হয়েছিল মুখোমুখি যুদ্ধে করে। এক সময় কাসেম আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এসব তার মনে নেই। তার শুধু মনে আছে, যুদ্ধ ক্রমশঃই তাদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে, বিজয় ছিল তাদের কাছে সুদূর পরাহত।

তুমি কে দাদা, ভগবানের নামে আমাকে একটু পানি দাও, বলে তরফাতে শুরু করল আহত লোকটি। ভগবানের নাম শুনে কাসেমের মৃত দেহেও যেন আগুন জ্বলে উঠল।

সে তার তরবারী বের করতে কোমরে হাত দিল। কিন্তু খাপ শূন্য। কখন তরবারী পড়ে গেছে মনে নেই। তরবারী না পেয়ে কোমর থেকে খঞ্জর বের করল কাসেম। ঠিক এ মুহূর্তে আহত লোকটি বলে উঠল, তুমি হয়তো মুসলমান!

হ্যাঁ, আমি মুসলমান!

কাসেম সামান্য সময় ভাবলো। খঞ্জর কোমরে গুজতে গুজতে বলল, মুসলমান কখনো তৃষ্ণার্ত দুশমনকে হত্যা করে না। তুমি তৃষ্ণার্ত। কিন্তু আমার কাছে পানি নেই। ভগবানের নামে তুমি পানি চেয়েছো। তোমার ভগবান আর পানি নিয়ে আসবে না। আমি তোমাকে পানি পান করাব। একটু অপেক্ষা কর। দেখি তোমার জন্যে পানি পাই কি-না।

কাসেম দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু পা নড়বড়ে। সে অতি কষ্টে হামাগুঁড়ি দিয়ে একটি লাশের পাশে গেল। লাশের কোমর থেকে পানির মশক খুলে হামাগুড়ি দিয়ে আহত লোকটির পাশে পৌঁছে বলল, হাঁ কর।

লোকটি বলল, তুমি মুসলমান, তোমার হাতে আমি পানি পান করব না।

কাসেম অবাক হলো। এতো ঘৃণা ওদের মনে! মরার সময়ও লোকটি মুসলমানের হাতে পানি পান করতে রাজি হচ্ছে না! মুসলমানদের কত ঘৃণা করে এরা!

তাহলে তোমার ভগবানকে ডাক। ভগবান পানি নিয়ে আসে কিনা দেখ। আমরা আল্লাহ্র নামে যুদ্ধ করি। এজন্য যুদ্ধের সময় আমাদের কোন ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভূত হয় না। তিনদিন ধরে আমরা ক্ষুধা-পিপাসা ভুলে যুদ্ধ করেছি, আমাদের কোন তৃষ্ণা নেই। আল্লাহ্ আমাদের বুক চির-প্রশান্তিতে ভরে দিয়েছেন।

এবার হিন্দু সৈন্যটি হাত বাড়িয়ে মশকটি ধরতে চেষ্টা করল, কাসেম মশকটি ওর মুখে ধরল, লোকটি এক নিঃশ্বাসে আধা মশক পানি গলাধঃকরণ করল।

যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে, তুমি কি কিছু জান? লোকটিকে জিজ্ঞেস করল কাসেম।

আমি সাধারণ সৈনিক নই। দু'শ সৈনিকের কমান্ডার আমি। আমাদের রাজার মৃত্যুর পর আহত হয়েছি আমি।"

"আমাদের সুলতান কোথায়? বলতে পার?"

সম্ভবত শহরে.....। শোন। মৃত্যুকালে তুমি আমাকে পানি পান করিয়েছো। আমি তো মরেই যাবো, তোমাকে একটা সত্যকথা বলে যাচ্ছি। আমাদের জাতিকে কখনও বিশ্বাস করো না। মুসলমানদের ধ্বংস করা আমাদের ধর্মের শিক্ষা। আমরা বহু মুসলমানকে ধোঁকা দিয়ে আমাদের অনুগত করে রেখেছি। আমাদের পণ্ডিতেরা সব সময় বলেন, মুসলমানরা আমাদের চিরশত্রু। ওদের শেষ করাই আমাদের ধর্ম। আমরা আমৃত্যু মুসলিম জাতির বিনাশে সব রকম চেষ্টা করে থাকি। এ যুদ্ধে

আমাদের পরাজয় হলেও যুদ্ধ থেমে থাকবে না। যতোদিন দুনিয়াতে একটি হিন্দুও বেঁচে থাকবে, সে চেষ্টা করবে মুসলমানকে ধ্বংস করতে। এটা আমাদের ধর্ম, এটা আমাদের ধর্মের নির্দেশ।

হিন্দু সৈনিকের কথা শুনে কাসেমের চেতনা আরো জেগে উঠতে লাগল। কথা বলতে বলতে হিন্দু সৈনিকটির যবান আড়ষ্ট হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর ওর আওয়াজ থেমে গেল। একটা হেচকি দিয়ে অসার ও নীরব হয়ে গেল লোকটি।

সুলতান মাহমূদ যখন বিজয়ী বেশে বেরা শহরে প্রবেশ করেন, শহরের ছোট বড় আবাল-বৃদ্ধ সকল মুসলমান তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সকলের মিলিত তকবীর ধ্বনিতে বেরার আকাশ পেয়েছিল নতুন আবহ। কেউ কেউ আনন্দের আতিশয্যে শুয়ে পড়েছিল সুলতানের ঘোড়ার সামনে। মুসলমানদের আনন্দে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন সুলতান। দীর্ঘদিন পর প্রাণ ফিরে পেয়েছে এখানকার মুসলমান জনসাধারণ। কিন্তু মুসলমানদের পাংশু চেহারা দেখে সুলতানের মন বিজয়ের আনন্দে নেচে উঠার বদলে বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল। ওদিকে বেরার হিন্দুরা ছেলে-পেলে, স্ত্রী-সন্তান আর ঘাটুরী-পেটারা মাথায় নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

সুলতানের দৃষ্টি পড়ল ওদের উপর। গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। বললেন সেনাধিনায়কদের, "ফেরাও ওদের। কোথায় যাচ্ছে এরা। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। রাতের অন্ধকারে বাড়িঘর ফেলে এরা কোথায় যেতে যাচ্ছে?" গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "ঘোষণা করে দাও, আমরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শহরের কোন অধিবাসীকে তাড়াব না, কারো বাড়িঘর লুট করবো না, আগুন ধরাব না। কারো ইজ্জতের উপর আক্রমণ করবো না। ওদের জলদি ফেরাও....। বল, যারা শহরে আছে তারা যেন তাদের পরিচিত জনদের লাশ এনে সৎকার করে এবং আহতদের চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। আহত সবাইকে ময়দান থেকে তুলে আনার মতো জনবল নেই আমাদের। তারা ইচ্ছে করলে এ কাজের জন্য মহিলাদেরকেও ময়দানে নিয়ে যেতে পারে।"

সুলতানের নির্দেশে শহরত্যাগী হিন্দুদের ফিরিয়ে আনা হল। যারা গমনদ্যোত ছিল তাদেরকে অভয় দেয়া হল। সুলতানের অভয়বাণী প্রচার করা হলো শহরের সর্বত্র। বলা হলো, শহরের বাসিন্দাদের সাথে সুলতানের কোন বিরোধ নেই, তাদের সাথে তার কোন সংঘাত নেই। বিরোধ-সংঘাত ছিল রাজার সাথে এবং সংঘাত হয়েছে রাজার সেনাবাহিনীর সাথে। সাধারণ নাগরিকরা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত।

হিন্দু-মুসলমান সকলকে লাশ তুলে আনতে বলা হলো। মুসলমানরা সুলতানের সহযোদ্ধাদের মৃতদেহ ও আহতদের তুলে আনার জন্যে ময়দানের দিকে ধাবিত হলো। তাদের সেবা-শুশ্রূষা এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্যে দলে দলে লোক মশাল হাতে বেড়িয়ে পড়ল।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর শহরের প্রধান মন্দিরের বড় পণ্ডিত কয়েকজন সেবাদাসকে শহরে পাঠিয়ে বহু বিশ্বস্ত হিন্দুকে মন্দিরে ডাকাল। পণ্ডিতের সংবাদ পেয়ে বহু সংখ্যক হিন্দু মন্দিরে জড়ো হল। আজ মন্দিরে শংখ ধ্বনি বাজছে না। ওদের চোখে আজ মূর্তিগুলোর চেহারা যেন ম্লান দেখাচ্ছে। সরস্বতীর চেহারায় হাসি থাকলেও তারা মনে করলো, পূজারীদের ব্যর্থতায় সে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। সারা মন্দির জুড়ে নীরবতা। শোকের ছায়া।

বড় পণ্ডিত কোন শ্লোক না আওড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে সমবেত পূজারীদের বলল, "আমাদের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছে, রাজা মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু আমরা এখনও জীবিত। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার এক সুযোগ এসেছে। সুলতান আমাদেরকে শহরে থাকার অনুমতি দিয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার বাহিনী আমাদেরকে হয়রানী করবেন না। তারা আশ্বাসও দিয়েছে, কোন ধরনের লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে না, কারো উপরে অত্যাচার উৎপীড়ন করা হবে না।

তারা যদি শহর লুটের ইচ্ছা করতো, শহর ধ্বংস করতে চাইতো, তাহলে এতোক্ষণে সারা শহর জ্বলে উঠতো। আমরা এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারি। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারি। রাতের অন্ধকারে খুব সহজেই কাজটি সমাধা করতে পারি।"

পণ্ডিত গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "শহরের হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ সবাইকে নিজেদের নিহত আত্মীয়-স্বজনকে তুলে এনে সৎকার করতে এবং আহতদের সেবাকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

"তোমরা জলদি ময়দানে চলে যাও। সবাই মশাল সাথে নিবে, আর সাথে রাখবে খঞ্জর অথবা একটি ছোট্ট কুড়াল। মুসলমানরা বিজয়ী হলেও অর্ধেকের বেশী সৈন্য আহত হয়েছে। যেসব মুসলিম সৈন্য আহত অবস্থায় ময়দানে পড়ে আছে তারা যদি চিকিৎসা কেন্দ্রে এসে সুস্থ হয়ে ওঠে তবে ওরা আমাদের জন্যে বিপদ আরো বাড়াবে। শত শত মুসলিম যোদ্ধা ময়দানে আহত অবস্থায় পড়ে আছে। তোমরা ওদের দেখেই বুঝতে পারবে। ওদের মধ্যে যারা দাঁড়াতে পারে না তাদেরকে তোমরা কুড়ালের আঘাতে ওখানেই শেষ করে দেবে।"

"শহরের সব হিন্দুকে এ সংবাদ বলার দরকার নেই। বেশী বলাবলি করলে কোন সুবিধাভোগী আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিতে পারে। নারী-পুরুষ সবাই যাও, সকাল পর্যন্ত যতো পারো শত্রুদের বধ করো। আমাদের দেশমাতা ও দেবীকে খুশী করতে হলে এ কাজ আমাদের করতেই হবে। যাও, যতো জলদি পারো সবাই কাজে লেগে যাও।"

কাসেম যে জায়গায় আহত হয়ে পড়েছিল সেখানটায় হতাহত লোক কম। আতহতদের আহাজারীও নেই। তাই এখনো এদিকে উদ্ধারকারীদের কেউ

আসেনি। এতোক্ষণ পর্যন্ত কাসেম... কাসেম... যে ডাক শোনা যাচ্ছিল তাও আর শোনা যাচ্ছে না। উদ্ধারকারীর আগমন আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। নিজের জীবন নিয়ে কাসেমের ভাবনা ছিল না, তার প্রত্যাশা ছিল সে সুলতান ও সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ্‌র সামনে হাজির হয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করবে, "আমার পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি আমি করতে পেরেছি? তার মা'কে জানাবে, মা! তোমার আশা কি এখন পূর্ণ হয়েছে?"

দূরে দূরে অনেক মশাল ঘুরতে দেখছে কাসেম। কিন্তু সবাই ওদিকেই ব্যস্ত। তার এ দিকটায় কেউ আসছে না। হতাশায় কাসেমের শরীর অবশ হয়ে আসছিল। তার পক্ষে এক কদম অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। পা দুটোয় কোন শক্তি নেই। প্রচুর রক্তক্ষরণে শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

এমন সময় বড় দুটো মশালকে এদিকে আসতে দেখে আশ্বস্ত হলো কাসেম। মাথাটা উঁচু করে তাকিয়ে রইল মশাল দু'টোর দিকে। খুব কষ্ট করে মাথাটা সোজা করে বসল মশাল দু'টোর আসার অপেক্ষায়। আর ভাবল, এরা হয়তো আমাদেরই কেউ হবে। আবারো তার কানে ধ্বনিত হলো সেই ডাক... "কাসেম ,.....! কাসেম.....! জীবিত থাকলে আমার ডাকে সাড়া দাও!"

হায়! কাসেমের যে সেই দরদী ডাকে সাড়া দেয়ার শক্তি নেই, শত ইচ্ছে থাকার পরও তার কণ্ঠ থেকে কোন আওয়াজ বেরুচ্ছে না। ঝুঁকে ঝুঁকে, জায়গায় জায়গায় থেমে থেমে মশাল দু'টো এগিয়ে আসছিল কাসেমের দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারছিল কাসেম, লোক দু'টো থেমে থেমে মরদেহ দেখছে। ভাবতে ভাবতে মশালধারী লোক দু'টো একে অন্যের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল কাসেমের সামনে। তাদের হাতে মশাল জ্বলছে।

লোক দু'টোর অনুচ্চ বাক্যালাপ শুনতে পেল কাসেম—একজন সাথীকে বলছে—"মুসলমান! সাংঘাতিক ঘাড় ত্যাড়া, আমাদের সহ্যই করতে পারে না...।"

"হ্যাঁ। আমি মুসলমান। খুব ক্ষীণ কণ্ঠে জানাল কাসেম। আমাকে বিজয়ের সুসংবাদটি জানাতে পার! মনে হয় তোমরা এখানকার বাসিন্দা। তোমরা আমার ভাষা বলতে পার না জানি। কিন্তু আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারি বলতেও পারি।"

এদের একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপাত্মক হাসল। কোমর থেকে খঞ্জর বের করল একজন, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ সুসংবাদটি তোমাকে আমি এই খঞ্জরের ফলা দিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি।"

কথা শেষ না করেই খঞ্জর চালাতে উদ্যত হলো লোকটি। কাসেম নিরুপায়। প্রত্যাঘাত তো দূরে থাক আত্মরক্ষার জন্যে একটু নড়ার শক্তিও তার নেই।

কাসেমের জীবন ও মৃত্যুর মাঝে মাত্র মুহূর্তের ব্যবধান। কয়েক পলকের মধ্যেই কাসেমের বুকটা এফোড় ওফোড় হয়ে যেতো, যদি না খঞ্জরের আঘাত প্রতিহত হতো। যেই মশালধারীর খঞ্জর কাসেমের বুকে আঘাত হানতে নেমে আসছে—কোত্থেকে বিজলীর মতো একটি মশাল এসে আঘাত হানে ঘাতকের মুখে। একটা চিৎকার দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে ঘাতক। তার চকচকে খঞ্জরটা ছিটকে পড়ে দূরে। মশালটিও পড়ে যায় ওর হাত থেকে।

এরা মৃতপ্রায় কাসেমকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এর আগে তেরোজন আহত মুজাহিদকে এরা হত্যা করে এসেছে। এদের চৌদ্দতম শিকার ছিল কাসেম। সামান্য দূর থেকে রাবেয়ার নিক্ষিপ্ত মশালের আঘাত উদ্যত খঞ্জরের আঘাত থেকে রক্ষা করেছে কাসেমকে। মশালের আলোয় কাসেম দেখতে পেল, মুখ থুবড়ে পতিত ঘাতকের মশালটি হাতে তুলে নিয়েছে রাবেয়া। সংহারী মূর্তি ধারণ করে মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাবেয়া। এ সেই রাবেয়া। যে রাবেয়া ফেরারী হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসেম বিন ওমরের ফাঁদ ও দাউদ বিন নসরের চক্রান্ত সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছিল সুলতানকে। এই সেই রাবেয়া যার সত্য সাক্ষ্যর কারণে আত্মহত্যা করেছে সেনাপতি আসেম। যার কারণে ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন সুলতান ও তার সেনাবাহিনী। পিতার সেই হন্তা, পুত্র কাসেমের জীবন দাত্রী হয়ে দেখা দিল যুদ্ধের ময়দানে।

এক ঘাতকের আঘাত থেকে রাবেয়ার নিক্ষিপ্ত মশালে বেঁচে গেল কাসেম। কিন্তু ঘাতক রয়ে গেছে আরেকজন। ওর সাথী রাবেয়ার উপস্থিতি দেখে কুড়াল উত্তোলন করল মোকাবেলার জন্যে। ঘাতক দেখল, এক যুবতী রুদ্র মূর্তি ধারণ করে মশাল হতে দাঁড়িয়ে। ওর হাতে কোন অস্ত্র নেই। কাসেম আহত। তার পক্ষে মোকাবেলা করা অসম্ভব। উপরন্তু রাবেয়া জীবনে কোনদিন খঞ্জর ধরেনি। হাতের মশালটি ছিল তার একমাত্র ভরসা। কাসেমের জীবন সংহারে উদ্যত ঘাতকের মুখের দিকে তাই হাতের মশালটিই ছুঁড়ে মেরেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। মশালটি আঘাত হানে ঘাতকের মুখে। চোখ মুখ ঝলসে যায় ঘাতকের। দূরে ছিটকে কুঁকাতে থাকে। ওর সাথী রাবেয়াকে দেখে ওকেই আগে বধ করতে আঘাত হানতে উদ্যত হলো। মশাল দিয়েই প্রতিরোধে লিপ্ত হলো রাবেয়া। অবস্থার আকস্মিকতায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মুহূর্তে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেল কাসেম। তবে নড়তে পারল না এক কদমও। রাবেয়া আর ঘাতকের মধ্যে চলছে সংঘাত। কৌশলী যোদ্ধার মত হাতের মশাল দিয়ে প্রতিরোধ করছে রাবেয়া। মৃতপ্রায় কাসেম এই সঙ্গিন অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারল না। তার মৃতপ্রায় শরীরে জেগে উঠল মুজাহিদের সত্ত্বা। কোমর থেকে সে বের করে নিল খঞ্জর। খঞ্জর

হাতে নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। যেই না ঘাতক কাসেমের দিকে ফিরল, মশালের আলোতে দেখে ওর পেট বরাবর নিক্ষেপ করল খঞ্জর। লক্ষ্যবেধী নিশানা। খঞ্জরটি আমূল বিদ্ধ হলো দুশমনের পেটে। খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে ঘুরে গেল বেঈমান। যেই ঘাতক পিঠ ফেরাল অমনি রাবেয়া মশাল ঠেকিয়ে দিল ওর কাপড়ে। জ্বলে উঠল ঘাতকের পরিধেয় বস্ত্র। চকিতে আবার এদিকে তাকাল দুশমন, অমনি আবার রাবেয়া ওর মুখে ঠেসে ধরল মশাল। বাঁচার জন্যে দিগ্বিদিক জ্বলন্ত কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল ঘাতক। কিছুদূর গিয়ে হোচট খেয়ে পড়ে গেল।

দূরের উদ্ধারকারী লোকেরা যখন একটি মানুষকে জ্বলতে দেখল এবং শুনতে পেল আর্তচিৎকার, তখন তাদের একজন এদিকে দৌড়ে এল। তারা এসে দেখতে পেল রাবেয়া ও আহত কাসেমকে। আর অদূরে ছটফট করছে ঝলসে যাওয়া দু'বেঈমান। এরা ছিল গজনীর সেনাসদস্য। কাসেম ও রাবেয়া পূর্বাপর ঘটনা জানাল সৈন্যদের। ইতিবৃত্ত শুনে সৈন্যরা ঘাতকদের পাশে গেল। এদের একজনের অবস্থা করুণ। অপর ঘাতকের চোখ-মুখ ঝলসে গেছে, কথা বলার শক্তি আছে ওর। গজনীর উদ্ধারকারী দলের এক কমান্ডার ওর বুকে তরবারী রেখে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, "তোরা কারা? কোত্থেকে এসেছিস? বল, কেন ওকে হত্যা করতে চাচ্ছিলি? নইলে এই তরবারী তোর পেটে ঢুকিয়ে দেবো।"

বেঈমান ঘাতক মুজাহিদের হুংকারে সবই বলতে শুরু করল। বলল, "আমরা বড় পণ্ডিতের আজ্ঞাবহ। তার নির্দেশে আমরা মুসলমান আহতদের হত্যা করতে ময়দানে এসেছি। দু'জনে এর আগে তেরোজনকে হত্যা করেছি, এ লোকিট ছিল আমাদের চৌদ্দতম শিকার।"

ভয়াবহ এই সংবাদ শুনে উদ্ধারকারী গযনী বাহিনীর লোকেরা ময়দানের সর্বত্র তল্লাশী শুরু করল। তারা এ ধরনের বহু ঘাতককে গ্রেফতার করল ময়দান থেকে। তৎক্ষণাৎ হিন্দুদের বাধা দেয়া হল ময়দানে প্রবেশ করতে। বিদ্যুৎ গতিতে বড় মন্দিরের প্রধান পণ্ডিতকে গ্রেফতার করা হল। কাসেম বিন ওমরকে নিয়ে আসা হল চিকিৎসা কেন্দ্রে।

* * *

গজনীর সেনাবাহিনী যখন পেশোয়ার থেকে মুলতানের পথে রওয়ানা হয় তখন কয়েকজন অধিনায়ক ও কমাণ্ডারের স্ত্রীও কাফেলার সাথে ছিলেন। রসদসামগ্রীর কাফেলার সাথে থাকতো তাদের বহনকারী পালকী। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রী ছাড়াও আরো কয়েকজন মহিলা ছিলেন সেই কাফেলায়। সেইসব অভিজাত মহিলাদের প্রধান কাজ ছিল সেবা ও অসুস্থ রোগীদের দেখাশোনা করা। অন্যান্য যুদ্ধে আহতদের সেবা যত্ন সৈনিকরাই করতো, কিন্তু এই যুদ্ধের গুরুত্ব ও সার্বিক

পরিস্থিতি অনুধাবন করে মহিলাদের সঙ্গে আনা হলো, যাতে সৈনিক স্বল্পতায় আহতদের সেবার কাজে তারা সহযোগিতা করতে পারে।

"তোমার আম্মা শুরুতে আমাকে আসতে দিতে চাচ্ছিলেন না। তার কাছেই আমাকে থাকতে বলেছিলেন।" ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করায় কিছুটা সুস্থানুভব করার পর কাসেমের পাশে বসে বলছিল রাবেয়া। তবে তোমাদের রওয়ানা হওয়ার সময় তোমার আম্মা আমাকে বললেন, "এবারের অভিযানে কিছু সংখ্যক মহিলা সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে। আমি তাকে অনুরোধ করলাম, 'আপনি আমাকেও কাফেলায় শরীক হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।' জানি না তিনি কার সাথে বলে আমাকে কাফেলায় শরীক হওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।"

"আমি তোমার মাকে বললাম, সুলতানের এক গাদ্দার সেনাধিনায়কের অপকর্ম ফাঁস করে দিয়ে আমি সুলতান ও সুলতানের সেনাবাহিনীকে ভয়ংকর পরাজয় থেকে বাঁচাতে সাহায্য করেছি। আপনি যদি এর পুরস্কার দিতে চান, তবে আমাকে যে করেই হোক যুদ্ধ কাফেলার সাথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমার ভিতরে যে কষ্ট ও দুঃখের আগুন জ্বলছে তা সেই দিন নিভাতে পারবো, যেদিন সুলতান মুলতান জয় করবেন, আর আমি আমার বেঈমান বাপকে নিজের হাতে খুন করবো। দাউদ বিন নসরের পাপ প্রাসাদ নিজের হাতে আমি গুড়িয়ে দেবো, ওখানে কেয়ামত ঘটিয়ে ছাড়ব।"

"তোমার মা আমার কথা শুনে বললেন, বোন! আমার ভিতরেও তো আগুন কম নয়। যুদ্ধে যেতে আমারও ইচ্ছে করছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়েছে, স্বামী ছাড়া কোন মহিলাকে কাফেলার সাথে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে না। কথা বলতে বলতে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বললেন, তুমি যাও, আমার একমাত্র ছেলে অগ্রণীদলের কমান্ডার হয়ে যাচ্ছে। আশা করি আমার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও পিছপা হবে না। ওর মাথা থেকে শরীর আলাদা না হওয়া পর্যন্ত ও মৃত্যুবরণ করবে না। আমি ওকে সাহস দিয়ে বলেছি, তুমি জীবিত আমার কাছে ফিরে এলে আমি খুশী হবো। কিন্তু তোমার জীবনের বিনিময়ে হলেও আমি যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ চাই। বোন রাবেয়া! মুখে যাই বলি না কেন, আমি তো মা, যখন ভাবি রণাঙ্গনে পানি.... পানি.... করে আমার পুত্র মারা যাচ্ছে তখন হৃদয়টা ভেঙ্গেচুরে খান খান হয়ে যায়। তখন আর সাহস থাকে না। কিন্তু পুত্র কাসেম নয়, আমি একজন মুজাহিদের মা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেই। মুজাহিদরা মরতেই যুদ্ধ করে, বাঁচতে নয়। বেঈমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মরণেই মুজাহিদের সফলতা। ভাবি, আমার উদর থেকে জন্ম নেয়া এ মুজাহিদ আমার নয়, এ আমার কোলে আল্লাহ্‌র আমানত মাত্র। আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখনই আমানত ফিরিয়ে নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আমার দুঃখ করা অনুচিত। তখন মনটা শান্ত হয়, দুঃখ কিছুটা লাঘব হয়।"

"তোমার আম্মা আমাকে হাত ধরে বললেন, রাবেয়া! তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও। আহতদের খুঁজতে গিয়ে সবার আগে তুমি আমার ছেলেকে খুঁজবে। ওর মুখে পানি দেবে। তুমি আমার প্রতিচ্ছবি হয়ে মায়ের ভূমিকা পালন করবে। রাবেয়া! তোমার কোন সন্তান নেই। সন্তানের মমতা দিয়ে ওর প্রতি যত্ন নিও তুমি। উপরে আল্লাহ্ আর নিচে তোমার কাছে আমি পুত্রকে সোপর্দ করলাম....।

"কাসেম! তোমার আম্মা আমাকে এও বলেছিলেন—রাবেয়া! তোমার কাছে যদি এমন সংবাদ আসে, আমার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে পিঠ দেখিয়েছে বা মোকাবেলা করা থেকে পালিয়ে ছিল, তাহলে তরবারী, বর্শা কিংবা খঞ্জর দিয়ে তুমিই ওকে খুন করে ফেলো। মনে করো, আমার স্বামী গাদ্দার ছিল ওর ঔরষজাত সন্তানও গাদ্দারই হয়েছে। গাদ্দারকে শেষ করেছো ওর বীজও শেষ করে দিবে। ও এমন করলে বাকী জীবনটা কোন পীর বুযুর্গের উঠোন ঝাড়ু দিয়ে কাটিয়ে দেবো।"

"আমার কার্যক্রম সম্পর্কে আপনি কোন তথ্য জানতে পেরেছেন?" রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করল কাসেম।

'পেশোয়ার থেকে আসার পথে সিন্ধুনদ পার হওয়ার জন্য যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তখন আমি সেনাধ্যক্ষ আবু আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাসেমের সংবাদ কি? তিনি বললেন, কাসেম দারুণ সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে। আমি তাকে বললাম, আমার আসার খবরটি যেন কাসেম জানতে না পারে। কেননা সে আমার আসার সংবাদ পেলে তার মন এদিকেও ঝুঁকতে পারে, তাতে যুদ্ধের মনোযোগ নষ্ট হবে।"

রাবেয়া আরো জানাল, "যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে রসদসামগ্রী বহরের সাথে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যুদ্ধে কি হচ্ছে এ সংবাদ আমরা পাচ্ছিলাম না। তিন দিন টানা যুদ্ধ চলল, আমাদের কাউকেই এদিকে আসতে দেয়া হলো না। একদিন খবর পেলাম, যুদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন। হয়তো আমাদের পশ্চাদপসরণ করতে হতে পারে! একথা শুনে সব মহিলা লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। কারো কাছেই তোমার কোন সংবাদ আমি পাচ্ছিলাম না। আমরা সবাই নামায পড়ে বিজয়ের জন্যে দু'আরত ছিলাম। এমতাবস্থায় আজ দুপুরে আমাদের সংবাদ জানানো হলো, আমাদের বিজয় হয়েছে। কিন্তু আমাদের ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। হতাহতের সংখ্যাই বেশী। সারা ময়দান জুড়ে লাশ আর লাশ। জখমীদের তুলে আনার মতো পর্যাপ্ত লোকেরও অভাব। আমাদেরকে এখানকার চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ডাক্তাররা ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিতো, মহিলারা ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধতো, আহতদের ওষুধ খাওয়াতো, পানি পান করাতো।

একের পর এক আহত যোদ্ধাকে সেবাকেন্দ্রে আনা হচ্ছিল আর তাদের গায়ের রক্ত পরিষ্কার করে ক্ষতস্থানে ওষুধ দেয়া হচ্ছিল। অনেকের চেহারা পুরোটাই রক্তে

মাথা ছিল, অধিকাংশই ছিল মরণাপন্ন, বেহুঁশ। কয়েকজন তো সেবাকেন্দ্রে এসে মারা গেছে। আমি আহতদের দেহ থেকে রক্ত পরিষ্কার করছিলাম। কাজের ফাঁকে চেতনাজ্ঞানসম্পন্ন অনেকের কাছে আমি জিজ্ঞেস করেছি তোমার কথা। অনেকেই অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। মাত্র তিনজন তোমাকে দেখেছিল বলেছে কিন্তু সবাই একথাই বলেছে, 'তার দল যেদিকে গিয়েছিল ওইদিক থেকে খুব কম লোকই ফিরে এসেছে।'

বেলা ডুবে যাওয়ার পর তোমার দলের একজন আহতকে আমি পেয়েছি। সে আমাকে বলল, কাসেম বিন ওমর যদি এখনো এখানে না এসে থাকে তবে সে হয়তো মারা গেছে। আমার সামনেই কাসেম আহত হয়েছিল। লোকটি আরো বলল, সম্ভবতঃ আমাদের ইউনিটের মধ্যে আমি একাই বেঁচে এসেছি। কাসেম ছিল আমাদের ইউনিট কমান্ডার। যুদ্ধের পরিস্থিতি এমন ছিল যে, যেন হিন্দুরা আমাদের খতম করেই নিঃশ্বাস নেবে। সুলতানের সরাসরি কমান্ডে যখন শেষ হামলার নির্দেশ হলো—তখন প্রধান সেনাপতি কাসেমকে বললেন, "কাসেম! রাজার পতাকাটিকে গুড়িয়ে দিতে হবে।" তিনি আমাদেরকে রাজার রক্ষণভাগে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন। সেনাপ্রধান বললেন, কাসেম! রাজার ঝাণ্ডা গুড়িয়ে দিতে পারলে যা পুরস্কার চাইবে তাই দেয়া হবে। বিদায়ের সময় মনে হচ্ছিল, সেনাপ্রধান আমাদের শেষ বিদায় জানাচ্ছিলেন।"

আহত যোদ্ধা আরো বলল, "শেষ পর্যায়ে কাসেম এতোই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল যে, হয় সে রাজার ঝাণ্ডা গুড়িয়ে দেবে না হয় নিজেই শেষ হয়ে যাবে। আখেরী আক্রমণে আমরা ছিলাম বেপরোয়া। কাসেমের উদ্দীপনা আমাদের সবাইকে পাগল করে তুলেছিল। মৃত্যু আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। জীবন-পণ আঘাত হানলাম। রাজার ঝাণ্ডাকে আক্রমণ করে তছনছ করে দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের কেউ আর অশ্বপৃষ্ঠে বসে নেই, সবাইকে শক্রসেনারা আহত করে ফেলেছিল। আমার বিশ্বাস, এখনও পর্যন্ত যদি তাকে এখানে না দেখা যায় তবে সে আর জীবিত নেই।"

"এরপর আমি সেবাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পথে একটি পড়ে থাকা মশাল উঠিয়ে হাতে নিলাম। ময়দানে এসে আমি হতবাক। কখনও রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিনি। আর এখানের মৃতদেহ দেখে মনে হলো যেন জঙ্গল কেটে অসংখ্য গাছ ফেলে রাখা হয়েছে। প্রতিটি লাশকেই আমি গভীরভাবে দেখছিলাম। প্রতিটি আহতের কুঁকানী শুনে দৌড়ে যেতাম। প্রত্যেকটি হিন্দু মরদেহ দেখে আমার মধ্যে প্রশান্তি আসতো কিন্তু মুসলমান যোদ্ধার মৃতদেহ দেখামাত্র চোখে পানি এসে পড়তো। এভাবে দেখতে দেখতে অনেক সময় চলে গেল। আহতদেরকে চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানোর কাজ চলতে লাগল।"

এক পর্যায়ে তোমাকে ডাকতে শুরু করলাম আমি। কেমন যেন হয়ে গেলাম। তোমার মায়ের আত্মা বুঝি আমার বুকে এসে ঢুকে ছিল। সজোরে চিকৎকার শুরু করে দিলাম তোমার নাম ধরে। উদ্ধারকারীদের অনেকেই বলল, 'আপনি ফিরে যান, এখানে কাসেমকে পাওয়া যাবে না।' কারো কথায় আমি স্বস্তি পেলাম না। সারা ময়দান দেখে দেখে এদিকে চলে এলাম যেখানে মরদেহ চোখে পড়ছে কম। তোমাকে না পেলে সারারাত তোমাকে খুঁজেই ফিরতাম। দিনের আলোতে তোমার লাশ উদ্ধার করে তবেই আমি ঘরে ফিরতাম।"

"যাকেই পেতাম তোমার কথা জিজ্ঞেস করতাম। এমন সময় দৃষ্টি পড়ল দু'টি মশালের দিকে। আমি ছিলাম ওদের পিছনে। আমি এগিয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। ইচ্ছা ছিল ওদের কাছে তোমার কথা জিজ্ঞেস করব। কিন্তু কিছুটা দূরে থাকতেই মশালের আলোয় তোমার চেহারা চিনে ফেললাম আমি। তখন তুমি বসেছিলে। আমি তোমাকে দেখলেও তুমি কেন আমাকে দেখতে পেলে না আমি বুঝতে পারছিলাম না।"

ওদের পোশাক দেখেই বুঝতে পারছিলাম, এরা উদ্ধারকারী গজনীর সেনা নয় এবং মুসলমানও নয়। ওদের দেখে আমার কোন দুর্ঘটনার আশংকা হয়নি কিন্তু যখন দেখি, ওদের একজন তোমাকে মেরে ফেলতে তরবারী তুলেছে, কোন কিছু না ভেবে দৌড়ে এসে ওর মুখে মশাল দ্বারা আঘাত করলাম। কাসেম! এ আসলে আল্লাহ্‌র দারুণ মেহেরবানী। তোমার বেঁচে থাকাটা একটা বিস্ময়। তবে তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, কারণ তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।"

দাউদ বিন নসর বিজি রায়ের পরাজয় সংবাদ পেয়ে কারামতী প্রাসাদ ছেড়ে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সময়ে নির্মিত একটি দুর্গে আশ্রয় নেয়। দুর্গের ভিতরে বিশাল প্রাসাদ। প্রাসাদের অভ্যন্তরে বহু কক্ষ। প্রহরী , গোলামখানা, আস্তাবল, বিরাট আঙিনা, শানবাঁধানো পুকুর, সজ্জিত বাগান—মোটামুটি একটি রাজপ্রাসাদ। এই দুর্গ সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিল যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর যখন এলাকাটি হিন্দুরা দখল করে নেয় তখন অনেক শিশু ও নারীকে হত্যা করে এর একটি কক্ষে নিক্ষেপ করেছিল। এখন এই দুর্গটিতে জিন ভূতের বসবাস—এ কথা ছিল সব লোকের মুখে মুখে। বিশেষ করে লোকেরা বলাবলি করতো, ওই বাড়িতে হিন্দু দখলদাররা চার কুমারীকে চরম নির্যাতন করে হত্যা করেছিল। দুর্গের ভিতরে নিহত চার কুমারীর কান্না এখনো নাকি শোনা যায়। শিশুদের দৌড় ঝাপ, খেলাধুলা চেচামেচি এবং কোলাহলরত মানুষের কথাও নাকি মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়।

এই দুর্গ সম্পর্কে মানুষের মনে এতো ভীতি ছিল যে, কেউ এর ধারে-পাশে যেতো না। কেউ কেউ বলতো, তারা দুর্গের ছাদের উপরে আগুন জ্বলতে

দেখেছে। দেখেছে ভূত পেত্নীর ঝগড়া-ফ্যাসাদ। ওখানে এখনো নাকি মৃতদের হাড়গোড় পড়ে রয়েছে।

যেদিন সুলতান মাহমূদ বেরা জয় করেন সেদিন মুলতানের এই চার কুমারী দুর্গে ছিল মেলা। মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর কেরামতীদের ধর্মীয় নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সে মানুষের কাছে নিজেকে আল্লাহ্‌র খাস লোক ও পয়গম্বর বলে পরিচয় দিতো এবং নানা অলৌকিক কীর্তি জাহের করে সরল ও অল্পশিক্ষিত মানুষকে কারামতী মতাবলম্বী করতে সচেষ্ট ছিল। এ সময়ে দাউদ বিন নসরের ভক্তরা দেশ জুড়ে একথা প্রচার করল যে, মুসলমানদের শাসক, কেরামতী ধর্মের নেতা, আল্লাহ্‌র ওলী দাউদ বিন নসর স্বীয় কেরামতীতে চার কুমারী দুর্গের সকল জিনভূতকে বন্দী করে তার অনুগত বানিয়ে ফেলেছেন, যাতে এগুলো মানুষের কোন ক্ষতি করতে না পারে এবং মানুষ এই দুর্গের কাছে যেতে ভয় না পায়। দাউদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা আরো প্রচার করল, চার কুমারী দুর্গের জিন ভূতেরা প্রতি দিনই একজন তাজা মানুষের রক্ত পান করতো, আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে দাউদ নিজের কারামতী ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগুলোকে বন্দী করে রেখেছেন, যে কেউ ইচ্ছা করলে বন্দী জিন-পেত্নীদের দেখতে পারে।"

সুলতান মাহমূদ বেরায় যে সময়ে নতুন সৈন্য ঘাটতি পূরণে ব্যস্ত এ সময়ে চার কুমারী দুর্গে চলছে লোকমেলা।

এ আজব খবর শুনে দাউদের কারামতী দেখতে দলে দলে লোক সন্ধ্যার পরে চারকুমারী দুর্গে সমবেত হতে লাগল। দুর্গটিকে সাজানোও হলো নতুনরূপে। জায়গায় জায়গায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। দুর্গের প্রধান ফটক ও রাস্তার চারপাশে এমন তীব্র সুগন্ধী ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে, যারাই দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করছিল, দুনিয়া ভুলে মুগ্ধ বিমোহিত হচ্ছিল কিংবদন্তির দুর্গাভ্যন্তরের অবস্থা দেখে।

দুর্গের বহিরাঙ্গন অবিকল পূর্বের মতোই রেখে দেয়া হয়েছে। যেখানে দীর্ঘদিনের ময়লা আবর্জনা জমে ইঁদুর, মাকড়সা জাল বুনেছে, আর পলেস্তরা খসে খসে পড়ে গেছে। শুধু ভিতরের পরিবেশ আমূল বদলে বাড়ির উঠোনে বিশাল প্যান্ডেল টেনে রং বেরঙের শামিয়ানা টাঙিয়ে রঙ্গীন বাহারী বাতি জ্বালিয়ে এমন স্বপ্নিল পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে, সাধারণ মানুষ তা দেখে হতবাক।

প্যান্ডেলের মাঝখানে রাখা হয়েছে একটি বিরাট গালিচা। গালিচার উপর সিংহাসন। সিংহাসনটি মণিমুক্তা হীরা জওহারে সজ্জিত। রঙ্গীন আলোতে সিংহাসনের মণিমুক্তাগুলো তারার মতো ঝকমক করছিল। সাধারণ মানুষ অভূতপূর্ব এ দৃশ্য দেখে অপার বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দাউদের অলৌকিক শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছিল।

দু'চার দিনের মধ্যে সারা মুলতানে ছড়িয়ে পড়ল দাউদের কারামতী। লোকমুখে প্রধান আলোচ্য বিষয় চার কুমারীর দুর্গ।

মানুষ বলাবলি করছিল, হাজার বছর আগে নিহত চার কুমারীকে দাউদ আবার লোকের সামনে জীবিত করে এভাবে দেখিয়েছে যে, তারা বাতাসে উড়ে এসে আবার বাতাসে মিলিয়ে গেছে। দর্শকেরা নাকি কিশোরীদের আওয়াজ ও শিশুদের কথাও শুনেছে।

দাউদের কারামতী মুলতানবাসীদের মধ্যে এমনই প্রভাব ফেলল যে, কোন কোন মসজিদের ইমাম জুমআর দিনের বক্তৃতায় পর্যন্ত দাউদের কেরামতী উল্লেখ করে বক্তৃতা করতে শুরু করেছে। তারা দাউদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হিন্দুদের মন্দীরগুলোতে পণ্ডিতেরা দাউদের কারামতীকে সত্য বলে প্রচার করছে। হিন্দু পণ্ডিতরা শিষ্যপূজারীদের বলছে, আসলে কারামতী ধর্মই আসল ইসলামী ধর্ম। মোল্লারা শুধু শুধু মানুষের মধ্যে নেক ও পাপের প্রাচীর সৃষ্টি করে ভোগান্তির মধ্যে ফেলেছে। এসব আসলে মিথ্যা। মানুষের জৈবিক চাহিদা সৃষ্টিকর্তার দেয়া। সে দুনিয়াতে তার ইচ্ছা ও সাধ্যমতো যা কিছু করার তাই করতে পারে। এতে কোন পাপবোধের কারণ নেই।

মুলতান শহরের সবচেয়ে ঘন-ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাস মুসলমানদের। কারামতীদের হাতে মুলতানের শাসনক্ষমতা চলে যাওয়ার পর থেকে হকপন্থী মুসলমানদের আর্থিক ও সামাজিক অবনতি ঘটে। চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বদিক থেকেই মুসলমানদের উপর নেমে আসে দুর্যোগ। যারা কারামতীদের অনুসারী তারাই সরকারী সহযোগিতা ও আনুগত্যে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে।

ঘন বসতি মুসলিম এলাকায় অনুরূপ আরেকটি দুর্গসম বাড়িতে কিছু সংখ্যক খাঁটি মুসলিম পরিবার বাস করে। চার কুমারী দুর্গে মেলা শুরু হওয়ার ক'দিন পর এই দুর্গসম বাড়িতে কয়েকজন লোক একটি পুরনো ঘরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আলোচনারত। তবে তাদের আলোচনার বিষয় দাউদের কারামতীর প্রশংসা নয়, দাউদের কারামতীর বিরূপতা। আলাপকারীদের একজন সেই বুযুর্গ যিনি রাবেয়াকে আসেম ওমরের চক্রান্ত ফাঁস করে দেয়ার জন্য দাউদের প্রাসাদ থেকে ফেরার হতে সাহায্য করেছিলেন।

"মুলতানের শাসনক্ষমতা কারামতীদের হাতে। সর্বময় দণ্ডমুণ্ডের মালিক তারা। তাই আমরা প্রকাশ্যে একথা বলতে পারছি না, কারামতী আসলে ইসলামী আদর্শ নয়, সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। ইসলাম মানুষকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে নেক কাজে উৎসাহিত করে। ইসলামের সম্পর্ক মানুষের আত্মার সাথে আর কেরামতী ধর্ম শরীর সর্বস্ব। কেরামতী মতে, মানুষ যথেচ্ছভাবে তাবৎ বিলাস-ব্যসন, জিনা ব্যভিচার, মদ-নারী সম্ভোগ করতে পারে। কেরামতী মতে একজন সুন্দরী নারী ইচ্ছে করলে স্বামী ছাড়াও যে কোন পছন্দনীয় পুরুষের সঙ্গলাভ করতে পারে, তাতে কোন বাধা নেই। সে তার শরীরের একচ্ছত্র মালিক। তার ইচ্ছায় বাধা

দেয়ার এখতিয়ার কারো নেই। তাদের মতে, আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করতে। এতে বিধি-নিষেধ থাকতে পারে না। আপনারা লক্ষ্য করেছেন—কেরামতীদের অনুসারী ঢলের মতো বাড়ছে। সাধারণ অজ্ঞ মানুষ এদের প্ররোচণায় আকৃষ্ট হয়ে ঈমান হারাতে শুরু করেছে।" বললেন একজন।

"মানুষ স্বভাবতই পাপকর্মের প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয়।" বললেন সমবেতদের মধ্যে আলেম ব্যক্তি। "নেক কাজে দৈহিক কোন সুখ নেই। মানুষের আসল শক্তি আত্মা। আত্মা দেখা যায় না। আত্মার সুখ তারাই অনুভব করতে পারে যারা আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করে আত্মা পবিত্র রেখেছে। সাধারণত মানুষ এটা বুঝতে চায় না। আত্মা পাপকর্মে দুর্বল হয়ে যায়। আত্মা দুর্বল হয়ে গেলে শরীরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বেশী পাপকর্ম করলে মানুষের আত্মা মরে যায়। জীবন শেষে মানুষ যখন মরে যায় তখন দেহটাকে মাটিতে দাফন করা হয় কিন্তু আত্মা কখনও মরে না, আত্মা আল্লাহ্র দরবারে হাজির করা হয়।"

'আপনি যা বলছেন—তা এখানে উপস্থিত সবাই জানে। আমাদের মাথার উপর এখন যে মুসিবত চেপে বসেছে দয়া করে এ ব্যাপারে কথা বলুন!" বলল এক যুবক। "যেদিন থেকে চার কুমারী দুর্গে দাউদ মেলা বসিয়ে জিন ও চারকুমারীর প্রেতাত্মাকে দেখাচ্ছে, সে দিনের পর থেকে দলে দলে মুসলমান দাউদের কেরামতী ধর্ম গ্রহণ করে ঈমান হারাচ্ছে। আমি একটি মসজিদে ইমামকে ওয়াজ করতে শুনেছি, কেরামতী ধর্ম সত্যধর্ম। কোন ভ্রান্ত মতাদর্শ যখন মসজিদে প্রভাব সৃষ্টি করে তখন সাধারণ মানুষ এটিকে সত্য বলেই গ্রহণ করতে শুরু করে।'

'আপিন কি জানেন, হিন্দু পণ্ডিতেরা মন্দিরে পূজারীদেরকে বলছে, কেরামতী ধর্ম সত্যিকার ইসলামী ধর্ম। মৌলভীদের ধর্ম সঠিক নয়।' বলল আরেক যুবক।

"ইমাম আর পণ্ডিত উভয়ে একই কথা বললেও কোন হিন্দুকে তুমি কেরামতী ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে না।" বললেন বুযুর্গ ব্যক্তি। "আমরা লোকদের একথা বলতে পারছি না যে, কেরামতী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী খৃস্টানদের সৃষ্ট। মহাভারতে এরা হিন্দু ও খৃস্টানদের সহায়তায় মুসলমানদের ঈমানহারা করতে মিশনারী কাজ করছে। বেঈমানদের অন্যতম একটি নীল নক্সা হলো-ইসলামের মোড়কে মুসলমানদের ঈমান হারা করতে গোনাহ্র কাজে জড়িয়ে ফেলা। কেরামতীদেরকে রীতিমতো হিন্দুরা পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে, যাতে মুলতানের কেরামতীদেরকে মুসলিম বলে সাধারণ মুসলিমদের ধোঁকা দিতে পারে।

ভাইয়েরা! মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্ত শুরু হয়েছে। চারকুমারী দুর্গের কেরামতী মুলতানের অর্ধেক মুসলমানকেই ঈমানহারা করে ফেলেছে।

এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে কি করে আমরা এই জঘন্য চক্রান্ত রুখতে পারব। এখনও পর্যন্ত আমাদের কারো স্বচক্ষে দেখা হয়নি, চারকুমারী দুর্গে আসলে কি ঘটছে।"

"যারা দেখে এসেছে তারা বলেছে, প্রত্যেক রাতেই চারকুমারী ও শিশুদের নাকি জীবন্ত করে দেখানো হয়।" বললেন আলেম। শোনা যাচ্ছে-একটি ধোয়ার কুণ্ডলী থেকে নাকি মেয়েগুলো দৃশ্যমান হয় আবার ধোয়ার কুণ্ডলীতে হারিয়ে যায়। আমাদের কারও স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখে আসা উচিৎ। আমরা তো ওখানে যাচ্ছি না এসব আজগুবী ঘটনা আমাদের ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে।"

"এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি, এটা নির্ধারণ করতেই আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।" বলল এক যুবক। "ওখানে যদি কোন ধোঁকা প্রতারণা কিংবা জাদুটোনার ব্যাপার ঘটান হয়ে থাকে তবে কেরামতীদের রহস্য আমরা ফাঁস করে দেবো।" যুবক তার সমবয়সী যুবকদের ইঙ্গিত করে বলল, "আমরা ইসলামের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত। ওখানে যদি আমাদের কোন সংঘাতের মুখোমুখি হতে হয় তবুও আমাদের ভয় নেই। আপনি আলেম-জ্ঞানী। আপনি আমাদের করণীয় কি সে সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দিন।"

"বাবারা! মনোযোগ দিয়ে শোন!" বললেন আলেম। "কেরামতী গোষ্ঠী কাফেরদের সৃষ্ট। ওদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তোমরা জান। চিন্তার ব্যাপার হলো—ধর্ম অনেক সময় মানুষকে দুর্বল করে দেয়। মুসলমানরা ধর্মের জন্যে জীবন বাজী রাখতে দ্বিধা করে না, আমাদের শত্রুরা তা ভালভাবে জানে বলেই ধর্মের অস্ত্র ব্যবহার করেই আমাদের ঘায়েল করতে তৎপর।"

"দাউদ ক্ষমতা লিপ্সু। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে সে ধর্মের লেবাস পরেছে। ধর্মের লেবেল এঁটেই দাউদ নিজের ক্ষমতা শক্ত করার কাজে লিপ্ত। লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে, আমাদের ধর্মের লোকেরা জাতিগতভাবে যতো প্রতারণার শিকার হয়েছে সবগুলো ধর্মের আবরণেই হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ তো আর এখন নেই। তারা নিজেরা যেমন খাঁটি ছিলেন লোকরেদকেও খাঁটি ধর্মকর্ম পালনে বাধ্য করতেন। বর্তমান শাসকরা ধর্মের আবরণে নিজেদের খেফালত টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। এরা ধর্মকে মোড়কের মতো ব্যবহার করে অশিক্ষিত লোকদের সমর্থক বানাচ্ছে। সাধারণ লোকদের এদের ধোঁকা বুঝতে অনেক দেরী হয়। আর যখন বুঝে তখন আর করার কিছু থাকে না। কেউ যদি এদের ধোঁকার মোকাবেলায় সঠিক কথা বলে তাকে ক্ষমতার শক্তি-বলে নিঃশেষ করে দেয়া হয়।

দাউদ বিন নসর যে মুসলমান নয় এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দাউদ যে ইসলামের ক্ষতি করছে, খৃস্টান ও হিন্দুদের সাথে মিলে মুসলমানদের ধ্বংস করতে

শুরু করেছে প্রকাশ্যে একথা আমাদের বলা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ ওর বিরুদ্ধে মোকাবেলায় যাওয়াও কঠিন ব্যাপার। ওর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে না আমরা কিছু করতে পারছি না, না আমরা সত্য কথা বলতে পারছি। এজন্য আমাদেরকে গোপন তৎপরতা চালাতে হবে।" বলল সেই অগ্রসর যুবক।

"হ্যাঁ। আজ রাতেই আমরা সবাই চারকুমারী দুর্গে যাব।" বললেন দরবেশ। "সরেযমীনে পরিস্থিতিটা দেখে এসে তার পর আমরা ঠিক করব পরবর্তী কর্তব্য।"

সন্ধ্যার পর দুর্গের জনারণ্যে প্রবেশ করল বুযুর্গ ও তার সাথীরা। দুর্গাভ্যন্তরের পরিবেশ দেখে সবাই অবাক। দর্শকদের আগ্রহ, মুগ্ধতা দেখে তাদের বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। দর্শকরা দুর্গের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ঘরবাড়িগুলো দেখছিল। বুযুর্গের সাথে ছিল নয়জনের একটি তরুণ দল। তন্মধ্যে দু'জনের বয়স ছিল সতেরো আঠারো। তারা এটা সেটা দেখতে দেখতে এমন এক জায়গায় এসে থামল সেখান থেকে আর সামনে কাউকে যেতে দেয়া হয় না। একজন প্রহরী দর্শকদেরকে সামনে অগ্রসর হতে না দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। বুযুর্গ ও তার সাথীরাও এখানে এসে থেমে গেল। সামনে এগুতে চাইলে বাধা দিল প্রহরী। বুযুর্গ প্রহরীকে জিজ্ঞেস করল, সামনে কি? প্রহরী জবাব না দিয়ে রাগত স্বরে বুযুর্গকে ফিরে যেতে বলল। ইত্যবসরে প্রহরীর দৃষ্টি অন্য দিকে চলে গেল আর ফাঁক বুঝে প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন বুযুর্গ। জায়গাটি ছিল আলো আঁধারী। তাই প্রহরী বুযুর্গের অনুপ্রবেশ ঠাহর করতে পারল না। বুযুর্গ প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে সাথীদের ইশারা করলেন ওখান থেকে চলে যেতে। সাথীরা ওখান থেকে ফিরে গিয়ে মঞ্চের চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

অন্ধকার গলিপথে যেতে যেতে বুযুর্গ একটি ঘরের মধ্য থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখলেন। তিনি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, ভিতরের ঘরটি খুব সাজানো, মেঝের মধ্যে সুদৃশ্য গালিচা বিছানো। গালিচার উপরে বালিশ। রং বেরঙের ঝাড়বাতি জ্বালানো। অর্ধনগ্ন পাঁচ ছয়টি সুন্দরী তরুণী উচ্ছল নৃত্যরত। বালিশে ঠেক দিয়ে দুই সুদর্শন পুরুষ রাজকীয় ভঙ্গিতে বসা। তাদের সামনে পানপাত্র। তারা থাবা দিয়ে নৃত্যরত একেকটি তরুণীকে ধরে নিজের কোলে টেনে নিয়ে ওকে উলঙ্গ করে নানাভাবে মজা করছে আর অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছে।

এ দৃশ্য দেখে বুযুর্গ আরো সামনে অগ্রসর হলেন। সামনে পেলেন দরজা খোলা একটি কামরা। ভিতরে বাতি জ্বলছে, কোন লোক নেই। ভিতরে ঢুকে পড়লেন বুযুর্গ। দেখলেন এককোণে একটি সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। বুযুর্গ ভাবলেন, এটা হয়তো কোন সুরঙ্গ পথ নয়তো কোন গুদাম ঘরের সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন বুযুর্গ। আশ্চর্য! বাড়ির কোথাও কোন মেরামতের কাজ না হলেও এ সিঁড়িটি ছিল নতুন এবং সুরঙ্গ পথটি ছিল যথেষ্ট

প্রশস্ত। একজন জোয়ান মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে পারতো। বুযুর্গ সুরঙ্গ পথে এগুতে থাকলেন, সুরঙ্গের জায়গায় জায়গায় বাতি জ্বালানো। বুযুর্গ টেরই পাননি, তার কয়েক কদম পিছনে খঞ্জর হাতে একলোক তাকে অনুসরণ করছে। লোকটি খঞ্জর হাতে পা টিপে টিপে বুযুর্গের পিছনে পিছনে আসছিল। লোকটি বুযুর্গ ব্যক্তিকে খঞ্জর দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করতে হাত উপরে উঠাল-কিন্তু লোকটি বুঝে উঠতে পারছিল না, সুরঙ্গ পথটি এতোটুকু চওড়া নয় যে, হাত উঁচু করে হাত ঘুরিয়ে আঘাত হানা যাবে। সুড়ঙ্গ পথের দেয়ালে আঘাত লেগে শব্দ হলে বুযুর্গ চকিতে পিছনে ফিরে বিদ্যুৎ গতিতে কোমড় থেকে খঞ্জর বের করে আঘাতকারীকে প্রতিঘাত করলেন। উভয়ের হাতের খঞ্জরে টক্কর খেয়ে শব্দ হল। কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। বুযুর্গ বামপায়ে সজোড়ে প্রহরীর কোমরে লাথি মেরে চিৎ করে ফেলে দিলেন। নিজের খঞ্জর ওর বুকে আমূল বিদ্ধ করে হেচকা টানে বের করে আবার পাঁজরে ঢুকিয়ে আরেকটি লাথি মারলেন। লোকটি আর্তচিৎকার দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

আক্রান্ত আর্তচিৎকার দিলে দৌড়ে সিঁড়ির প্রবেশপথে এসে পড়লেন বুযুর্গ। তার দিকে দৌড়ে এলো কয়েকজন। বুযুর্গ বললেন, জলদি নিচে যাও। আমি আসছি। ওরা আহতের আর্তচিৎকার শুনেছিল। বুযুর্গকে চিনতে না পেরে ওরা সুড়ঙ্গপথের দিকে দৌড়ে গেল আর এই ফাঁকে দৌড়ে গলিপথ মাড়িয়ে জনারোণ্যে মিশে গেলেন বুযুর্গ। রক্তমাখা খঞ্জরটি এর আগেই কোমরে গুজে ফেলেছিলেন তিনি।

সমবেত সকল লোকের আকর্ষণ ছিল মঞ্চের দিকে। সেখানে আলোর তীব্রতা কম। সবার দৃষ্টি মঞ্চের দিকে। বুযুর্গ তার সাথীদের খুঁজে বের করে সংক্ষেপে বললেন, তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, কি দেখেছেন এবং কি করে এসেছেন। সাথীরা তাকে এখান থেকে চলে আসার প্রস্তাব দিয়ে বলল, "অন্যথায় আপনার ধরা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শংকা না বাড়িয়ে বুযুর্গ চলে এলেন দুর্গ থেকে।"

একটু পড়েই নাকাড়া বেজে উঠল। বাজল সানাই। এটা দাউদের মঞ্চে আগমন বার্তা। একটু পড়েই ঘোষক ঘোষণা দিল—মুলতানের শাসক, কেরামতী পয়গাম্বর, আবুল ফাতাহ শাইখ নসর বিন শাইখ হামিদ কারামতী, সত্য ইসলামের পতাকাবাহী মঞ্চে আসছেন, জ্বিন ও ভূত তার তাবেদার। উপস্থিত সকলেই মাথা নীচু করে তাকে অভিবাদন জানাবে।

ঢোল নাকারা বাজতে থাকল। বাজনার তালে তালে সৃষ্টি হলো সুর লহরী, যেন আন্দোলিত হতে থাকলো শত শত বছরের পরিত্যক্ত দুর্গের সব ঘরদোর। বাজনার আবহে মঞ্চের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো দাউদ, মাথায় রাজমুকুট। সারা গায়ে জরিদার জমকালো রাজকীয় পোষাক। সে এসে উপবেশন করল হিরা-মুক্তার

সিংহাসনে। মানুষ তার আগমনে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল। ঘোষক হাঁক দিল, "শত শত বছর ধরে এই দুর্গ জিনভূত প্রেত্নীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল, এরা প্রতিদিন একজন না একজনের তাজা রক্তপান করতো। সত্যধর্মের পয়গাম্বর তার বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতাবলে খোদার বিশেষ ক্ষমতায় সকল ভূত পেত্নী ও জ্বিনকে তিনি অনুগত বানিয়ে ফেলেছেন। ওদেরকে বন্দী করে রেখেছেন। সমবেত সকল মানুষের কর্তব্য তার আনুগত্য স্বীকার করে তার হাতে মুরীদ হওয়া। না হয় জিন ভূতেরা তাদের ক্ষতি করবে।"

এমন গুরু গম্ভীর আওয়াজে এই ঘোষণা দেয়া হলো যে, সমবেত মানুষজন ভীষণ প্রভাবিত হলো। এরপর কানে ভেসে এলো ধীরলয়ের যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজ সেই সাথে নৃত্যের সুরলহরী। এ সময়ে সমবেত কণ্ঠের কোরাস সঙ্গীতের আওয়াজও ভেসে এলো। পুরো প্যান্ডেলটি বাজনার তালে তালে নেচে উঠল। দাউদ বিন নসর মসনদ থেকে দাঁড়িয়ে গেল দর্শকদের দিকে পিঠ করে। বিড় বিড় করে মন্ত্রের মতো কি যেন আওড়াল। সুড়ঙ্গ পথ ছিল অন্ধকার। ওখান থেকে প্রথমে ধোঁয়া নির্গত হয়ে মঞ্চের জায়গাটি অন্ধকার হয়ে গেল। দাউদ দুহাত প্রসারিত করে বলল, খোদায়ে যুলজালাল! হে মানুষ ও জ্বিনের সৃষ্টিকর্তা! আমাকে তুমি খোদায়ী শক্তি দাও। যাতে জ্বিন ও ভূতের কষ্ট থেকে তাদের আমি মুক্তি দিতে পারি। সে ধমকের স্বরে বলল, "আমার সামনে আয়।" কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে ধোঁয়া কমে গেল, ধোঁয়ার ভিতর থেকে চারটি কুমারী সুন্দরী দৃশ্যমান হল।

মেয়েগুলো যেন জান্নাতের হুর। তাদের গায়ে ফিনফিনে রেশমী পোষাক। বাদকদলের বাজনা আরো তীব্র হলো। যন্ত্রসঙ্গীতের সুরে কেঁপে কেঁপে উঠল মঞ্চ। যুবতীরা এক সাথে দাউদকে কুর্নিশ করতে সেজদায় পড়ে গেল। দাউদ তাদেরকে উঠে যেতে ইশারা করল। ধোঁয়া সম্পূর্ণ গায়েব হওয়ার আগেই যুবতীরাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

যুবতীদের অন্তর্ধান বুঝে উঠার আগেই মঞ্চে দেখা গেল চারটি দৈত্যের মতো জঙ্গলী মানুষ। লোমষ কালো চেহারা। কুচকুচে কালো শরীর। বড় বড় চোখ। মাথার চুলগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। মাথায় বাঁকানো শিং। দীর্ঘ দাঁত ওদের মুখের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মঞ্চের উপরে বেতাল বেশামালভাবে নাচতে শুরু করে দিল দৈত্যগুলো। ঘোষণা হলো—এরাই জিন। এদের চেয়ে আরো উদ্ভট চেহারার দানবের মতো একটি লোককে দেখা গেল হাতে চাবুক নিয়ে দাঁত খিটমিট করছে। সে বন্য দৈত্যগুলোকে এভাবে পেটাতে শুরু করে দিল যে, ওদের বিকট চিৎকারে দর্শকগণ ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, থামো! থেমে গেল পেটানো। ভূতগুলো সমস্বরে বলে উঠল, হুজুর! আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। হুজুর! আমরা এখন আপনার কথা

মানবো, আমরা আপনার মুরীদ হয়ে গেছি। আমরা কসম করে বলছি—আপনি আল্লাহ্‌র পয়গম্বর, আল্লাহ্‌র দূত। এ সংবাদ আমরা গায়েব থেকে জানতে পেরেছি।

মঞ্চের দিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আবারো ধেয়ে আসল। অন্ধকার হয়ে গেল মঞ্চ। ধোঁয়া কেটে যখন মঞ্চ পরিষ্কার হয়ে গেল তখন সেখানে দৈত্য দাউদ কাউকেই আর দেখা গেল না। ঘোষণা করা হল—কেরামতী পয়গম্বর আল্লাহ্‌র দরবারে হাজিরা দিতে গেছেন।

তোমরা যা দেখে এলে এসবই সেই সুড়ঙ্গের তেলেসমাতি। সাথীদের উদ্দেশ্যে সেই পুরনো বাড়িতে বসে বলছিল—বুযুর্গ ব্যক্তি। যে মেয়েগুলোকে তোমরা দেখে এসেছো-ওদেরকে আমি একটি বন্ধ ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছি। এই সবই সেই সুড়ঙ্গ পথের কারিগরী। সুড়ং পথটি নতুন তৈরী করা হয়েছে। এই সুড়ঙ্গ পথটি মঞ্চে এসে শেষ হয়েছে। এই সুড়ঙ্গ পথেই মঞ্চের দিকে ধোঁয়া ছোড়া হয়। মেয়ে ও কৃত্রিম দৈত্যগুলো এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়েই দৃশ্যমান হয়ে আবার ধোঁয়ার অন্ধকারে সুড়ঙ্গ পথে চলে যায়।

চার কুমারী দুর্গে দাউদের তেলেসমাতী দেখে আসার পর বুযুর্গের নেতৃত্বে আবার পুরনো বাড়িতে বসল তার সতীর্থদের পর্যালোচনা বৈঠক। আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল এই দুর্গে জ্বিনদের কোন অস্তিত্ব নেই, থাকলেও এভাবে এদেরকে বন্দী করে রাখা যায় না।

বুযুর্গ ও তার সহযোগিরা যখন চারকুমারী দুর্গের ঘটনা ও তাদের করণীয় নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন তখন সেই বাড়ির দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল বাড়ির মালিক। আর অন্যেরা বিপদাশংকায় পালানোর জন্যে তৈরী হয়ে গেল। বাড়ির মালিক ছিল এদের সহযোগী। কোন বিপদ সংকেত থাকলে সে দরজার কাছে এসে কাশি দেবে এমন কথা ছিল। কিন্তু আজ সে কাশি দেয়নি। যখন দরজা খোলা হল তখন দেখা গেল, তাদেরই অন্য এক সাথী উপস্থিত।

আমি যে খবর শুনে এসেছি, তা যদি সত্য হয় তবে কেরামতীদের মৃত্যু ঘণ্টা ঘনিয়ে এসেছে। বেরা থেকে কয়েকজন লোক এসে বলেছে, সুলতান মাহমূদ বেরা দখল করে নিয়েছেন। বেরার রাজা বিজি রায় আত্মহত্যা করেছে। লোকগুলো বলেছে—তিনদিন পর্যন্ত এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে যে, সুলতান ও বিজি রায় সবারই সহায় সম্পদ সব বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখন সুলতান গজনীর সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করছেন। গজনী থেকে রসদপত্র পৌঁছাতে সময় লাগবে। বর্তমানে বেরা থেকে কাউকে বের হতে দেয়া হচ্ছে না, কাউকে ঢুকতেও দেয়া হচ্ছে না।

সবাই গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর আলেম বললেন, "রাজশক্তির সাথে টক্কর দেয়া আমাদের সম্ভব নয়। আমরা এখন গোপনে কারামতী চক্রান্তকারীদের নির্মূল করার কাজটি চালিয়ে যেতে পারি। যে কাজটি আমাদের

দরবেশ সুনিপুণভাবেই শুরু করে এসেছে। সতর্ক থাকতে হবে আমাদের যেন কেউ চিহ্নিত করতে না পারে। যদি দাউদকে হত্যা করা যায় তবে হয়তো এই অপকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। তৃতীয় পন্থা হতে পারে আমাদের কয়েকজন বেরা গিয়ে সুলতান মাহমূদকে এখানকার পরিস্থিতি জানিয়ে মুলতান আক্রমণের জন্যে অনুরোধ করা।

একথায় সায় দিল সবাই। সিদ্ধান্ত হল, আলেম, বুযুর্গ ও আরো তিনজন নওজোয়ান সাথী পরদিন সকালেই বেরার উদ্দেশে রওয়ানা হবে।

দরবেশের গোপন আস্তানায় যখন সুলতান মাহমূদের বেরা বিজয়ের খবর শোনানো হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে দাউদকেও তার গোয়েন্দারা খবর দিল যে, সুলতান মাহমূদ বেরা দখল করে নিয়েছে এবং বিজি রায় আত্মহত্যা করেছে।

দাউদ তখন চার কুমারী দুর্গের যাদুকরী ধোঁকাবাজীর এক সহযোগী হত্যার অপরাধে অন্যান্য প্রহরীদের উপর চড়াও হচ্ছিল। প্রহরীরা তার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে কড়জোড়ে নিবেদন করছিল, তাদের কেউ ওকে হত্যা করেনি। বরং তারা একজনকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু দাউদ কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। দাউদের বিশ্বাস, কোন তরুণীর চক্রান্তে এদেরই কেউ ওকে হত্যা করেছে। দাউদ ওদেরকে শাসাচ্ছিল কিন্তু প্রহরীদের সবাই মিনতি করছিল আমরা ওকে হত্যা করিনি।

এ সময় দাউদের সেনাপতি এসে জানাল বেরার দুঃসংবাদ। সংবাদ শুনে দাউদের অবস্থা এমন হলো যে, তার মদের নেশা উবে গেল। বেশামাল দাউদ চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকায় চোখে অন্ধকার দেখছিল। এরই উপর ভয়ানক দুঃসংবাদ ওকে আরো শংকিত করে ফেলল। নিরাপত্তা প্রধানকে হুকুম দিল, ওদেরকে হাত পা বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে দাও, তারপরও যদি সত্য কথা না বলে তবে কোন খাবার না দিয়ে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখবে।

প্রহরীদেরকে নিয়ে যাওয়ার পর সেনাপতিকে দাউদ বলল, মাহমূদ যদি বেরা দখল করে থাকে তবে আমাদেরকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। তুমি আগামীকাল সকালেই ব্যবসায়ীর বেশে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা পাঠিয়ে দাও। তারা গিয়ে সরেযমীনে ব্যাপারটি দেখে আসুক। মাহমূদের কাছে যদি সৈন্যবল কম থেকে থাকে তবে আমরা মহারাজা আনন্দপালকে খবর দেবো ওর উপর হামলা করতে।

সকাল বেলায় মুলতান থেকে ছোট দু'টি কাফেলা বেরার উদ্দেশে বের হল। এক দলে দরবেশ, আলেম ও তার তিন সাথী, আর অপর দলে দাউদের সেনা বাহিনীর দুই কর্মকর্তা ও অপর চারজন সৈনিক।

দাউদের লোকেরা যখন দরবেশের কাফেলাকে দেখল তখন বলল, মনে হয় ওরাও ওদিকে যাবে। চল আমরাও ওদের সাথে মিশে যাই।

হক ও বাতিলের লড়াই

থমকে গেল দাউদের চমক। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় দাউদের নাচ, নখরা ভাটা পড়ল। বেরা পতনের খবরে দাউদের মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল। সে চারজন কমান্ডার ও দুইজন ঊর্ধ্বতন সেনা অফিসারকে বেরার উদ্দেশে পাঠাল। ওদেরকে নির্দেশ দিল, যে করেই হোক, তোমরা বেরায় গিয়ে সুলতান মাহমূদের অবস্থা জানাবে, সে কবে নাগাদ মুলতান অভিযানে বের হতে পারে এবং তার সৈন্যসংখ্যা কত? ওখানকার হিন্দুদের অবস্থা কি তাও ভাল করে অনুসন্ধান করবে এবং সম্ভব হলে ওদের সাথে যোগাযোগ করে আসবে। নির্দেশ মত ছয়জনের কাফেলা বণিকের বেশে বেরার পথে রওয়ানা হল। এই ছয়জনের প্রত্যেকেই ছিল গোয়েন্দাবৃত্তিতে পারদর্শী এবং কট্টর কেরামতী।

মুলতান থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর গুপ্তচর কেরামতীরা দরবেশ, আলেমসহ আরো তিন ব্যক্তিকে বেরার দিকেই যেতে দেখল। তারা এদের সাথে মিশে গেল। ভাবল, একই দিকে যেহেতু যাচ্ছি, তাই এদের কাছ থেকে কোন সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। দাউদের গুপ্তচররা ছিল অশ্বারোহী। তাছাড়াও তাদের তিনটি উট বোঝাই ছিল মালপত্রে। দরবেশের সাথীদের তিনজন ছিল উষ্ট্রারোহী এবং আলেম ও দরবেশ অশ্বারোহী। এরা ছিল নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান। তারা যাচ্ছিল সুলতান মাহমূদকে কেরামাতীদের দুষ্কৃতি সম্পর্কে অবহিত করে মুলতান আক্রমণের অনুরোধ জানাতে।

উভয় কাফেলা মুখোমুখি হলে কুশল বিনিময় হলো, সালাম কালামও হলো। কিন্তু পরিচিতি পর্বে উভয় কাফেলা কিছুটা রক্ষণশীলতা বজায় রাখলো। দরবেশ জানালো, "তারা মুলতানের বাসিন্দা, মুলতানেই ব্যবসা করে। ব্যবসায়িক কাজে বেরা যাচ্ছে।" কেরামাতীরা বলল, "তারা লাহোরের বাসিন্দা। ব্যবসায়িক কাজে মুলতান এসেছিল। এখন বেরা হয়ে লাহোর ফিরে যাবে।"

"আপনারা তো মুলতানের অধিবাসী, তাহলে তো আপনারা কেরামতী মুসলমান?" দরবেশকে জিজ্ঞেস করল এক কেরামতী।

"না, আমরা সুন্নী মুসলমান। কেরামতীদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ওদেরকে আমরা মুসলমানই মনে করি না। আপনারা তো মনে হয় সুন্নী মুসলমান। কারণ মুলতান ছাড়া আর কোথাও কেরামতী নেই।" বলল দরবেশ।

"ওদের আমরা চিনি না।" বলল এক কেরামতী সৈনিক। "আমরাও আপনাদের মতই সুন্নী মুসলমান। আচ্ছা-শুনলাম; সুলতান মাহমূদ বেরা দখল করেছে? ওখানকার রাজা বিজি রায় নাকি আত্মহত্যা করেছে?"

"শুনলাম তাই।" বললেন আলেম। "যদি খবরটি সত্য হয়ে থাকে, তবে আপনারা, আমাদের সবারই খুশী হওয়া উচিত। মুহাম্মদ বিন কাসেমের পর এই প্রথম কোন ন্যায়পরায়ণ সুলতান এদিকে অভিযান করলেন। আপনি দেখে থাকবেন, এ অঞ্চলের অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমানরা কীভাবে দলে দলে হিন্দুদের চক্রান্তে ধর্মান্তরিত হচ্ছে।"

"আমরা খুব খুশী হয়েছি।" বলল কেরামাতী কমান্ডার। "আমরা চাই সুলতান মাহমূদ লাহোরও দখল করে নিক। এ এলাকাটিও মুসলমানদের দখলে আসা দরকার।"

"লাহোরের আগে সুলতান মাহমূদের উচিত মুলতান দখল করা। কথায় বলে, ঘরের শত্রু বিভীষণ। আপনি হয়তো জানেন, মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর খৃস্টান ও হিন্দুদের ক্রীড়নক সেজে মুসলমানদের পরিচয়ে ইসলামের শিকড় কাটছে।"

"জানা তো নেই, সুলতান মাহমূদ দাউদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানেন কি না। সুলতানের কাছে সঠিক তথ্য আছে কি না তাও তো জানা নেই।" বলল কেরামাতী কমান্ডার।

"জানা না থাকলেও তার এখন জানা উচিত।" বললেন আলেম।

"আমরা তো এক সাথেই বেরা যাচ্ছি। সুলতান মাহমূদ যাতে দাউদ বিন নসরকে বন্ধু মনে না করেন, এ ব্যাপারটি তাকে অবহিত করা তো আমাদেরও কর্তব্য।" বলল কেরামাতী কমান্ডার।

"অবশ্যই।" বললেন দরবেশ। এ কর্তব্য আমাদের অবশ্যই পালন করা দরকার।

সবাই সমতালে চলতে লাগল। আলেম ও দরবেশ এ কথা প্রকাশ করতে চাচ্ছিল না যে, তারা সুলতান মাহমূদের কাছেই যাচ্ছে। তাদের গতিবিধি দেখে কেরামতীদের এমন কোন সংশয়ও হয়নি। কিন্তু কেরামতীরা ছিল দুর্দান্ত চালাক এবং পেশাদার গোয়েন্দা। ওরাও নিজেদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেনি। কেরামাতীরা দরবেশ ও সাথীদের আকীদা বিশ্বাস নিয়েই কথাবার্তা বলছিল। দরবেশ ও আলেম ঘুর্নাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেনি যে ওরা সুন্নী মুসলমান নয় এবং ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে। তাদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ায় সমমনা মনে করে তারাও অকপটে ওদের সাথে কথাবার্তা বলতে লাগল।

বেলা ডুবার আগেই তারা মুলতান অঞ্চলের বড় নদী রাভী পেরিয়ে গেল। যে জায়গা দিয়ে তারা নদী পার হল এখানে নদীটি বেশ চওড়া কিন্তু অগভীর। নদী পেরিয়ে তীরে উঠেই তারা সবাই রাত যাপনের জন্যে সুবিধা মতো একটি জায়গা বেছে নিল। এ সময় কেরামতী দলের কমান্ডার তার ঘোড়ার পিঠ থেকে সামান ও

জিন খুলছে, তার এক সৈনিক তার কাজে সহযোগিতা করছে। সহযোগী সৈনিকটি জিন খুলতে খুলতে কমান্ডারের উদ্দেশে বলল, "লোকগুলোকে দেখে তো ব্যবসায়ীই মনে হয় কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন বদ মতলবে বেরা যাচ্ছে না তো? যে দু'জন লোক আমাদের সাথে কথাবার্তা বলছে, মনে হয় এরা শিক্ষিত, আলেম। এরা যদি আমাদের সম্পর্কে কোন কূটকৌশল না করে তবেও আমাদের উচিৎ হবে এদের সাথে থাকা। কারণ আলেম হিসাবে বেরাতে তারা যে সম্মান পাবে এদের সাথে থাকলে আমরাও তাদের দ্বারা উপকৃত হবো। আমাদের উচিৎ তাদের সাথে হৃদ্যতা সৃষ্টি করা।"

"আজ রাতে আমরা মদের মশক খুলব না। যাতে তারা আমাদেরকে মু'মেন মুসলমান মনে করে। তাদের মধ্যে ওই বুড়ো লোকটি খুব ভালভাল কথা বলে। আমরা তাদেরকে সুলতান মাহমূদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে উৎসাহ দেবো। এরপর তাদের সাথে আমাদের একজনও চলে যাবো মাহমূদের দরবারে। তাহলে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানা যাবে।"

সবাই এক সাথে আহারে বসল। আহার পর্বেও কেরামতী কমান্ডার সারাদিনের মতো ধর্মীয় প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগল। ওদের কথায় বুঝা যাচ্ছিল, তারা নিষ্ঠাবান মুসলমান। কথার ধরনও ছিল এমন যে, আলেম ও দরবেশ মনে করলেন, তাদের মতো এরাও সুলতান মাহমূদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের মতোই ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ। কেরামতী দলের সবাই প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা। ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিক। দরবেশ ও আলেমের মিশন ছিল ইসলামী চেতনা থেকে উৎসারিত কর্তব্যের প্রতিফলন। তাই তাদের মধ্যে সব বিষয়ে অতিরিক্ত সচেতনতার বোধ ছিল না। তাদের মন-মস্তিষ্কেও এসবের গন্ধ নেই। পক্ষান্তরে কেরামতী দলটির মিশনই ছিল সন্দেহজাত, ধূর্তামি আর প্রতারণার। কথায় কথায় কেরামতী প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিল দলনেতা।

"কেরামতীদেরকে আমরা ভ্রান্ত মনে করি।" বলল কেরামতী কমান্ডার। "কিন্তু মুলতানে আমরা যাকেই দেখলাম সবাইকে দাউদের অনুসারীই মনে হলো। সেখানে লোক মুখে চার কুমারী দুর্গের কথা শুনে গতরাতে আমরা সেই মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা জিন দেখলাম, কুণ্ডলীর ভিতর থেকে চারটি তরতাজা কুমারী মঞ্চে আবির্ভূত হলো। তারা আবার ধোঁয়ার মধ্যেই হারিয়ে গেল। আমাদের কাছে তো এগুলো বাস্তব এবং দাউদের কারামতীই মনে হলো। মনে হয় দাউদের মধ্যে বিশেষ আধ্যাত্মিক গুণ আছে-না হয় এসব কি কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব?"

"যে দিক থেকে আপনারা চার কুমারী এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখলেন সেদিক থেকে কোন লাশ বের হতে দেখেননি?" কেরামতী কমান্ডারের কথায় আবেগ তাড়িত হয়ে রহস্য প্রকাশ করে দিলেন দরবেশ।

"লাশ! কার লাশ?" বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কেরামতী কমান্ডার।

"দাউদের একজন বিশ্বস্ত প্রহরীর লাশ। চার কুমারী আর জিনের ভোজভাজি আমি দুর্গের ভিতরে গিয়ে দেখে এসেছি।" বললেন দরবেশ।

"বলেন কি? আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাদেরকে এই রহস্যের কথা খুলে বলুন তো! আমরা তো ভাবতেই পারিনি, কোন বাতিল গোষ্ঠীর মধ্যে এমন অলৌকিক ক্ষমতা থাকতে পারে। আমরা তো তার কেরামতী দেখে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে মুরীদ হওয়ার চিন্তা করেছিলাম। আর আপনি বলছেন, ভোজভাজি! ভাই মেহেরবানী করে আমাদের সন্দেহমুক্ত করুন। এতেও আপনার সওয়াব হবে!"

কেরামতী কমান্ডারের চাতুর্যপূর্ণ কথায় আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন দরবেশ। তিনি ওদেরকে সুন্নী মুসলমান মনে করে তার গোপন অভিযানের কথা সবিস্তারে বলে দিলেন। বললেন, কিভাবে তিনি ভিতরে প্রবেশ করে গোপন কক্ষে চার কুমারীকে দেখলেন এবং দাউদ ও সহযোগীদেরকে তরুণী বেষ্টিত অবস্থায় মদ পানরত অবস্থায় পেলেন। তাও বললেন, একজনকে হত্যা করে কিভাবে তিনি গোপন সুড়ঙ্গ পথ ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলেন।

কেরামতী কমান্ডার ও সাথীরা অভাবিত এই সফল অভিযানের জন্যে দরবেশকে বাহবা ও ধন্যবাদ দিল। এ কৃতিত্বের জন্যে দরবেশের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে খুবই উজ্জীবিত করতে লাগল। ওরা তো দরবেশের কথা শুনে হতবাক। "বলে কি বুড়ো! যে হত্যাকাণ্ডের কিনারা করতে না পেরে দাউদ মহলের অভ্যন্তরীণ সকল নিরাপত্তারক্ষীকেই কঠিন শাস্তি দিচ্ছে, ওরা ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বলতে পারছে না কে ঘটিয়েছে হত্যাকাণ্ড। আর এই বুড়ো কি সেই হত্যার নায়ক! মনে মনে মহা খুশী হল তারা, অভাবিতভাবে হাতের নাগালে অপ্রত্যাশিত শিকার। আর পালাবে কোথায়? শিকার এখন তাদের হাতের নাগালে। ভিতরের মনোভাব প্রকাশ করল না কেরামতীরা।

রাতের আহারপর্ব সেরে সবাই বিছানা পেতে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেরামতী কমান্ডার দরবেশের প্রতি দারুণ ভক্তি দেখাচ্ছে। তার প্রতি অত্যধিক সম্মান দেখিয়ে সে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে দরবেশের বিছানা করল। সারাদিনের বিরামহীন ক্লান্তির কারণে শুয়েই সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল দরবেশের। চোখ মেলল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। মোটা কাপড় দিয়ে তার চোখ মুখ বেঁধে ফেলা হয়েছে। সে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পা বাড়াতে পারল না। দু'তিনজন লোক তার হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল। সাথে সাথে তাকে ধরাধরি করে একটি উটের উপরে রেখে বেঁধে ফেলল উটের সাথে। উটের রশি আরেকটি ঘোড়ার সাথে বেঁধে ঘোড়াকে তাড়া দিল। সহগামী হলো আরেকটি ঘোড়া। কেরামতী গুপ্তচররা অপ্রত্যাশিতভাবে চারকুমারী দুর্গের

রহস্যজনক নিরাপত্তারক্ষী হত্যাকারীকে পেয়ে তাকে দাউদের কাছে পৌঁছে দিয়ে মোটা অংকের পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় দরবেশকে মুলতানে নিয়ে যাওয়ার জন্য দু'জনকে দিয়ে রাতের অন্ধকারেই পাঠিয়ে দিল। এ কাজটা আসলেই ছিল তাদের জন্য বিরাট এক সাফল্য আর দরবেশ ও সাথীদের জন্যে মারাত্মক বিপর্যয়।

দরবেশের সাথীরা তার কাছ থেকে অনেকটা দূরে বেঘোরে ঘুমাচ্ছিল। রাতের এই অপহরণ ঘটনা মোটেও টের পেল না তারা।

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল আলেম ব্যক্তির। তিনি ঘুম থেকে উঠে নামাযের জন্য দরবেশকে জাগাতে তার বিছানায় গেলেন। কিন্তু বিছানা খালি। ভাবলেন, দরবেশ হয়তো তার আগেই শয্যা ত্যাগ করে প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে গেছেন। অথবা অযু করতে নদীতে গেছেন। কেরামতী কমান্ডার ঘুম থেকে উঠে তাদের বাধা উট ও ঘোড়ার দিকে গেল। একটু পরেই চিল্লাতে শুরু করল "হায়! আমাদের দু'টি ঘোড়া ও একটি উট নেই। আমাদের দু' সাথীও নেই। হল্লাচিল্লা করে কেরামতী কমান্ডার আবিষ্কার করল, আমাদের দামী জিনিসপত্র গুলোও সব নিয়ে গেছে। কমান্ডার চেমামেচি করে ঘোড়ায় জিন লাগাতে শুরু করল, আর বলতে লাগল, বেশী দূর যেতে পারেনি। চলো, ওদের তালাশ করি।" এমন সময় আলেম বললেন, "আমাদের দরবেশকেও তো দেখছি না।"

"হ্যাঁ, তাহলে সে-ই আমাদের লোকদের অপহরণ করেছে। তাকে তো আমরা দরবেশ মনে করেছিলাম। কিন্তু গতরাতে সুড়ঙ্গের মধ্যে যেভাবে এক সৈনিককে সে হত্যা করে ফিরে এসেছে—এ লোক পেশাদার খুনী। চল ওকে ধরতে হবে।"

"ওর পিছু নেয়া বোকামী।" বলল অপর এক কেরামতী। "জানাতো নেই এখান থেকে কখন কোন দিকে পালিয়েছে সে।"

"হ্যাঁ। তুমি ঠিক বলেছো। এ মরু বীজন প্রান্তরে কোথায় খুঁজে ফিরব আমরা। ওকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।" বলল কমান্ডার।

"আলেম ব্যক্তি নীরবে দাঁড়ানো। তার তিন সাথীও হতবাক। হচ্ছে কি এসব? দরবেশকে তো তারা জানে, সে খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতি করবে, একথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। তার মতো একজন মর্দে মু'মেন নেক মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। অথচ এরা বলছে, দরবেশ তাদের মালপত্র লোকসহ অপহরণ করে নিয়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা হতবাক।

"আমার তো মনে হয় তোমরাও ডাকাত।" আলেমকে উদ্দেশ করে বলল কেরামতী কমান্ডার।

"আমরা ডাকাত হলে এখন আমাদের কাউকে তুমি এখানে দেখতে না। আর তোমরাও জীবিত থাকতে না। সবাই লাশ হয়ে থাকতে।" বললেন আলেম।

"দেখো! তোমাদের দু' লোক নিরুদ্দেশ। আমার তো মনে হয়, তোমাদের ওই লোকেরা চুরি করার জন্যে মালপত্র বাঁধছিল, তা দেখে ফেলেছিল দরবেশ।

ওদের অপকর্ম ফাঁস হয়ে যাবে মনে করে ওরা দরবেশকে হত্যা করে নদীতে ফেলে পালিয়ে গেছে। ওরা জোয়ান দু'জন, আর দরবেশ বুড়ো একা।"

তাদের লোক কোথায় গেছে, তা কেরামতীদের জানা। তাই কেরামতী কমান্ডার মনে করল, এরাও যদি দরবেশের গোপন মিশনের সহযোগী হয়ে থাকে, তবে এদের বেশী ঘাটানো ঠিক হবে না। এদের কাছ থেকে আরো তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনায় কেরামতী কমান্ডার আলেম ও তার সাথীদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না। বস্তুতঃ তাদের উদ্বেগের কোন কারণও ছিল না। কমান্ডার নিজেই তো দরবেশকে অপহরণের ব্যবস্থা করেছে।

পুনরায় উভয় কাফেলা বেরার দিকে রওয়ানা হলো। কেরামতীরা আগে আর আলেম ও সাথীরা ওদের পিছনে।

"এদের গতিবিধি আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। সাথীদের ক্ষীণ আওয়াজে বললেন আলেম।" সকাল থেকে এদেরকে আমি গভীরভাবে দেখছি, আমার কাছে এদেরকে ব্যবসায়ী মনে হয়নি। এরা ব্যবসায়ী নয় অন্য কোন পেশার লোক। দরবেশ গতরাতে আবেগপ্রবণ হয়ে সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশের ঘটনা বলে দিয়েছিল। আমার মনে হয়, এরা দাউদের লোক। গোয়েন্দা। এরাই দরবেশকে অপহরণ করে মুলতান নিয়ে গেছে। এরা বেরা যাচ্ছে, সুলতান মাহমূদের গতিবিধি ও তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানার জন্যে।"

"আমাদের সচেতন থাকা দরকার।" বলল এক সাথী। "ওরা যেন বুঝতে না পারে, দরবেশের সাথে আমাদের গভীর কোন সম্পর্ক ছিল।"

"এরা যদি সত্যিই গোয়েন্দা হয়ে থাকে, তবে এদেরকে আমি বেরায় ধরিয়ে দেবো। এখন থেকে এদের সাথে আমরা আরো আন্তরিক ভাব দেখাবো।"

"এ বিষয়টা তো পরিষ্কার বোঝা গেছে, এরা আমাদের নবী দাউদ বিন নসর ও কেরামতী ধর্মাদর্শের ঘোরতর বিরোধী। এখন থেকে ওদের সাথে আমরা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব দেখাবো। আমাদের জানতে হবে এদের প্রকৃত পরিচয় এবং এদের মূল উদ্দেশ্য।" সাথীদের বলল কেরামতী কমান্ডার।

সূর্য যখন মাথার উপর, তখন কেরামতী কমান্ডার সওয়ারীগুলোকে ঘাস পানি খাওয়ানো এবং নিজেদের বিশ্রাম ও আহারের জন্য কাফেলা থামিয়ে দিল। আহার পর্বে কেরামতী কমান্ডার আলেমকে জিজ্ঞেস করল,

"দরবেশের সাথে আপনার সম্পর্ক কতো দিন ধরে?"

আলেম বললেন, "আমি শুধু এতটুকু জানতাম, মুলতানে সে ব্যবসা করে। কোথায় কি ব্যবসা তা জানি না। আমরা যখন বেরা রওয়ানা হলাম, তখন সে আমাদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে।"

"ঐ লোকটি চার কুমারী দুর্গে একটি লোক হত্যা করেছে, তা কি আপনারা জানতেন?"

"খুনের কথা জানতে পারলে আমরা তাকে সাথেই রাখতাম না।" বললেন আলেম। "সে যদি ধর্মীয় ভাবাবেগে খুন করে থাকে তাও ঠিক করেনি। নরহত্যা মহাপাপ। হত্যাকাণ্ড আল্লাহও ক্ষমা করেন না।"

গুপ্তচর নেতা বহু চেষ্টা করেও আলেমের কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারল না। কেরামতীরাও আলেম কাফেলার সাথে একথাই প্রকাশ করছিল যে, তারা কেরামতী নয় নিষ্ঠাবান মুসলমান।

রাজা, মহারাজা কোন সুলতানের শাসনের বাইরে বিজন মরু প্রান্তরে দু'টি ছোট কাফেলা একই কাফেলায় লীন হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু দৃশ্যত একটি কাফেলা হলেও এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিস্তর ব্যবধান। একদল আরেক দলের প্রাণঘাতি শত্রু। এরা পারস্পরিক শত্রুতায় লিপ্ত এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চিন্তায় বিভোর। হক ও বাতিলের অদৃশ্য সংঘাতে তারা অহর্নিশ চিন্তামগ্ন। আলেম সন্দেহাতীতভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, এরা ব্যবসায়ী নয় কেরামতী। আলেম ছিলেন বয়স্ক প্রবীণ। তার তিনসাথী অবশ্য যুবক। কিন্তু কেরামতীদের সবাই শক্তিশালী। আলেম ভাবছিলেন, এরা যদি প্রশিক্ষিত সৈনিক হয়ে থাকে, তবে তার তিন সাথী কি এদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে?

মনে মনে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন আলেম। আল্লাহই সকল বিপদে মদদগার। কোন মানুষ মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না যদি আল্লাহ্র রহমত না থাকে। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন, এরা যদি তার সাথে বেরা পর্যন্ত যায় তবে এদেরকে তিনি ধরিয়ে দিবেন। তবে বুযুর্গ দরবেশকে নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন তিনি। তাকে যদি কেরামতীরা হত্যার দায়ে দাউদের কাছে ধরে নিয়ে যায় তবে বৃদ্ধ লোকটি অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মুলতানে আমাদের সবার ঠিকানা বলে দিতে পারে। তাহলে তাদের স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়দের দাউদের বাহিনী চরম লাঞ্ছিত করবে ও অত্যাচার চালাবে।

ইসলামী ইতিহাসের কষ্ট ও ত্যাগের কথা মনে হলো তার। কতো কঠিন নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। এ মুহূর্তে ইসলামের জন্যে তাদেরও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কুরবানী এখন সময়ের দাবী। সাথীদের উদ্দেশে বললেন—

"প্রিয় সাথীরা! আজ আমরা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি, তা খুবই কঠিন। ইসলামের জন্যে আমাদের ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকারের সময় এসেছে। আশা করি আল্লাহ্র রাস্তায় যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তোমরা পিছপা হবে না। মনে রেখো, যে মুসলমান ত্যাগ স্বীকার না করে কষ্ট দেখে পালিয়ে যায়, ইতিহাস থেকে তাদের নাম চিহ্ন হারিয়ে যায়। হতে পারে আমাদের এই অভিযানের কারণে তোমাদের প্রত্যেকের পরিবারে অবর্ণনীয় অত্যাচার নেমে আসবে। সব জুলুম-অত্যাচার দৃঢ়তা

ও সাহসের সাথে সহ্য করতে হবে। তোমরা যদি কষ্ট দুর্ভোগ ও নির্যাতনের মোকাবেলায় অটল থাকতে না পার তবে এখনই বাড়িতে ফিরে যেতে পার। তবে মনে রাখবে, যে মুসলমান ঈমানের পরীক্ষায় পালিয়ে যায়, ইতিহাস থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

তিন যুবকের কেউই আলেমকে ফেলে বাড়ি ফিরে যেতে রাজী হলো না। পক্ষান্তরে তারা আলেমকে তাদের দলনেতা স্বীকৃতি দিয়ে বললো, "আপনি আমাদের যে কোন নির্দেশ দিবেন, আমরা জীবন বাজী রেখে তা পালনে অঙ্গীকার করছি।"

ইতিহাসের এ এক নির্মম বাস্তবতা। যাদের রক্তের বিনিময় ও ত্যাগে রচিত হয় ইতিহাস, যাদের কুরবানীর বিনিময়ে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর যতো রাজা-বাদশা-বিজয়ীর কীর্তি গাঁথা, তাদের অধিকাংশই রয়ে গেছে অজ্ঞাত। কেননা, ইতিহাস যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ীর নামোল্লেখ করে, যে সব অজ্ঞাত লোক নিজেদের পরিচয় আড়াল করে বিজয়ের ভিত রচনা করতে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে ইতিহাস তাদের জানে না।

তখন সূর্য ডুবে গেছে। কেরামতী কমান্ডার রাত যাপনের জন্যে যাত্রাবিরতি দিতে অনুরোধ করল। জায়গাটি ছিল সবুজ শ্যামল, তাজা ঘাসের প্রাচুর্য ছিল সেখানে। অসংখ্য ঝোপঝাড় উঁচু নীচু টিলায় ভরা। কেরামতী কমান্ডার আলেমের উদ্দেশে বলল, "একটি সুবিধা মতো জায়গা দেখুন, আমিও দেখছি।" আলেম সাথীদের নিয়ে আরো সামনে অগ্রসর হলেন। একটি মরু প্রস্রবণের পাশে তিনি তাঁবু খাটাতে বললেন সাথীদের। জায়গাটিতে পানি ও ঘাস রয়েছে। পশুগুলোর খাবার ও নিজেদের বিশ্রাম উভয়টা একই সাথে সারা যাবে।

কেরামতীরা পিছনে রয়ে গেল। আলেম ভাবলেন, ওরা হয়তো এদিক সেদিক দেখে এ জায়গাটিকেই পছন্দ করবেন, কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কেরামতীরা এলো না। আলেম ওদের আসার ব্যাপারে ভাবলেশহীন। ওরা ভিন্ন রাত কাটাক, তাতে কিছু যায় আসে না।

আলেম লক্ষ্য করলেন, "তাদের অদূরেই একটি তাঁবু খাটানো। সেখানে এক হিন্দু বৃদ্ধ এবং এক যুবক দাঁড়ানো। সাথে একজন বয়স্কা মহিলা এবং দু'জন তরুণী। তরুণী দু'জন দেখতে রাজকুমারীর মতো। তাদের তাঁবুর সামনে একটি মশাল জ্বলছে।

আলেমও তাদের তাঁবুর সামনে একটি মশাল জ্বালিয়ে এর হাতল মাটিতে পুঁতে দিয়ে সবাইকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। ক্লান্তির আবেশে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল অল্প সময়ের মধ্যেই।

মাঝরাতে নারী ও পুরুষের আর্তচিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল সবার। আলেম ও সাথীরা সবাই উঠে তরবারী হাতে নিলেন বিপদাশঙ্কায়। জ্বলন্ত মশালের আলোয় দেখতে পেলেন, তাদের দিকে এগিয়ে আসছে পাশের তাঁবুর বৃদ্ধ হিন্দু ও বয়স্কা মহিলা। কিন্তু তাদের সাথের দু' যুবতীকে দেখা গেল না।

আলেম ও সাথীরা তরবারী উঁচিয়ে ওদের দিকে অগ্রসর হলে ওরা পাশ ফিরে দৌড়াতে উদ্যত হলো। আলেমের সাথীরা সমস্বরে ওদের হুঁশিয়ার করে বললো, "পালাতে চাইলে নির্ঘাত মরতে হবে, জীবন বাঁচাতে চাইলে দাঁড়াও।"

মৃত্যুভয়ে ওরা দাঁড়িয়ে গেল। আলেম ও সাথীরা তাদের কাছে গেলে জীবন ভিক্ষা চাইল তারা। আর ভয়ে কাঁপতে লাগল। অনেক কষ্টে আলেম তাদের বুঝালেন, "আমরা তোমাদের হত্যা নয়, সাহায্য করতে চাই। বলো, তোমরা পালাচ্ছিলে কেন?"

"তোমাদের সাথীরা আমাদের সবকিছু নিয়ে গেছে। আমাদের সাথে থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, অনেক দামী গহনা ছিল, সবই ওরা নিয়ে গেছে। তোমাদের সাথীরা মেয়ে দু'টিকেও নিয়ে গেছে।" ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ।

"মেয়ে দু'জন তোমার কি হয়?"

"ওরা আমার মেয়ে। এ আমার ছেলে, আর এ আমার স্ত্রী। আমরা বেরা থেকে পালিয়ে এসেছি। বেরা মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। আমরা হিন্দু।"

"গযনীর মুসলমানরা কি তোমাদের ঘরবাড়ি লুটপাট করেছে? শহরে গণহত্যা চালিয়েছে? তোমাদের মেয়েদের নির্যাতন করেছে?"

না-না, তা নয়। বলল বৃদ্ধ। বিজয়ী সুলতান তো নির্দেশ দিয়েছেন, কোন হিন্দুর ঘরে কেউ যাবে না, কোন নারীকে কেউ লাঞ্ছিত করো না। সকল নাগরিকের মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দিয়েছে সুলতান। কিন্তু আমার এই মেয়ে দু'টো খুব সুন্দরী। বলাতো যায় না, বিজয়ী সৈন্যরা আবার আমার মেয়েদের লাঞ্ছিত করে কি-না। এই আশঙ্কায় আমি তাদের নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, বেরাতেই আমরা নিরাপদ ছিলাম।"

"হুজুর! দয়া করে আপনার সাথীদের কাছ থেকে আমার মেয়ে দু'টিকে উদ্ধার করে দিন। ওরা ওদের মেরে ফেলবে। আমার অনেক সোনা দানা ওরা নিয়ে গেছে, সব আপনারা নিয়ে নিন তবুও আমাদেরকে এদের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমার সাথে যা আছে তাও আপনাদের দিয়ে দেবো। তবুও আপনারা আমার মেয়ে দু'টির প্রতি একটু দয়া করুন।"

বৃদ্ধ হিন্দুর কথা শুনে আলেম বুঝতে পারলেন কেরামতীরাই এই অপকর্মের হোতা। কারণ কেরামতীদের কাছে জীবন মানে ভোগ আর সম্ভোগ। ওরা বেঁচেই থাকে পাপকর্মের জন্য। সুন্দরী মেয়ে দু'টিকে দেখে ওরা আর লোভ সামলাতে পারেনি। ওদের কাছে নারীভোগ পাপ নয়, পুরুষের অধিকার।

"তোমাদের কাছে কি অস্ত্র নেই?" হিন্দুদের জিজ্ঞেস করলেন আলেম।

"মালপত্রের সাথেই ছিল আমাদের তরবারী। ওরা আমাদের উপর এভাবে হামলে পড়ল যে, আমরা তরবারী হাতে নেয়ার সুযোগ পেলাম না। ওরা আমাদের

মারপিট করে সব ছিনিয়ে নিয়েছে। নিরুপায় হয়ে আমরা এখন বেরার দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম, এ সময় আপনারা আমাদের দাঁড়াতে বললেন।"

আলেম তার তিন সাথীকে বললেন, "এই হিন্দুকে আমাদের এ কথা বুঝাতে হবে যে, মুসলমানদের কাছে নারীর ইজ্জত ধর্ম বর্ণের ঊর্ধ্বের বিষয়। মুসলমান যে কোন ধর্মের নারীর ইজ্জত রক্ষার্থে জীবন বাজী রাখতে কুণ্ঠাবোধ করে না। নারীর মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী কর্তব্য। আজ আমাদের একথা প্রমাণের সময় এসেছে যে, মুসলমানরা কর্তব্য পালনে কতটুকু নিষ্ঠাবান। আমাদের চোখের সামনে দু'টি অসহায় নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হবে আর আমরা নিশ্চুপ বসে থাকবো তা হতে পারে না। আশা করি তোমরা এদের ইজ্জত রক্ষায় জীবন বাজী রাখতে পিছপা হবে না। আমি তোমাদের সাথে আছি। এসো একসাথে পাষণ্ডদের রুখে দাঁড়াই, আল্লাহ্ আমাদের মদদ করবেন।"

আলেম সাথীদের বললেন, "কেউ আবেগপ্রবণ হয়ে তাড়াহুড়ো করো না। আগে ওদের অবস্থা পরখ করে নাও, তারপর সুযোগ মতো আঘাত হানো। ওদের দেখে মনে হয় প্রশিক্ষিত সৈনিক।"

আলেম ও সাথীরা ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন কেরামতীদের তাঁবুর দিকে। ওদের তাঁবুটি ছিল একটা টিলার ঢালে। আলেম টিলার পাশ ঘেঁষে পিছন দিক থেকে দেখে নিলেন ওদের অবস্থা। মশাল জ্বলছে, কেরামতী চার পাষণ্ড দূর্বাঘাসের উপর বসে মদ গিলছে আর অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছে। তরুণী দু'জন সম্পূর্ণ নিরাবরণ। মদের সুরাহী ওদের হাতে। যেই ওদের পানপাত্র খালি হয়ে যাচ্ছে মেয়ে দু'টো আবার ঢেলে দিচ্ছে। কেরামতীরা মদে অভ্যস্ত। এই মদ ও পানপাত্র ওদের সাথেই ছিল কিন্তু নিজেদের মুসলমান বুঝাতে এরা গতদিন মদ বের করেনি।

দীর্ঘক্ষণ আলেম ও সাথীরা কেরামতী হায়েনাদের অপকর্ম দেখলেন। যুবতী দু'টোকে নিয়ে এরা কাবাবের মতো টানাটানি করছে। একজন ছেড়ে দিচ্ছে তো আরেকজন আবার কোলে টেনে নিচ্ছে। সেই তালে চলছে শুরাপান। এক পর্যায়ে কেরামতী কমান্ডার উঠে দাঁড়িয়ে গেল। বেশী মদ পানের কারণে ওর পা দুটো টলছিল। দাঁড়িয়ে নিজের কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল কমান্ডার। আর একটি মেয়েকে পাঞ্জায় নিয়ে ঘাসের উপর শুইয়ে দিয়ে হামলে পড়ল তার উপর। আলেম সাথীদের উদ্দেশে বললেন, "আঘাত হানো।"

সাথীরা সবাই এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেরামতীরা ছিল মদে চুরচুর। আঘাত প্রতিরোধের কোন সুযোগ পেল না কেউ। আলেমের তরবারীর প্রথম আঘাতেই কমান্ডারের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে তরুণীকে নিয়ে কেরামতী কমান্ডার আদিমতায় মেতে উঠেছিল সে একটা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কেরামতীর রক্তে স্নাত হয়ে গিয়েছিল মেয়েটি। আলেমের সাথীরা অন্য তিন নরপশুরও ইহলীলা সাঙ্গ করে দিল।

বেহুঁশ তরুণীর চোখে মুখে পানির ঝটকা দেয়া হলে সে জ্ঞান ফিরে পেল। উভয় তরুণীকে বলা হলো কাপড় পরে নিতে। ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা নির্বাক হয়ে পড়েছিল। ওরা ভেবেছিল, চার নরপশুর পাঞ্জা থেকে তারা আরেক দল পাষণ্ডের কব্জায় পড়েছে। কিন্তু তাদের ধারণা পাল্টাতে বেশী সময় লাগল না। অল্প সময়েই তারা বুঝতে পারল, এরা হায়েনারূপী মানুষ নয়, ঘোর এ দুঃসময়ে তাদের জন্যে রহমতের দূত।

আলেম দু' হিন্দু পুরুষকে বললেন, "তোমরা তোমাদের ছিনিয়ে নেয়া মালপত্র মুদ্রা ও অলংকারাদি ওদের আসবাব থেকে বের করে নাও। প্রয়োজনে ওদের উট ঘোড়াসহ সবকিছুই তোমরা নিয়ে যেতে পার।"

হিন্দুরা কেরামতীদের দেহ ও গাঠুরী তল্লাশী করে তাদের সোনা গহনা ও মুদ্রা উদ্ধার করল। আলেম হিন্দু বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "এতো স্বর্ণমুদ্রা ও অলংকার নিয়ে প্রহরী ও সওয়ারী ছাড়া এ পথে পা বাড়ালে কেন?"

হিন্দু বৃদ্ধ জানাল, "মুসলমান বিজয়ীরা বেরা থেকে কোন হিন্দুকেই বাইরে যেতে এবং ভিতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। তাই আমাদের লুকিয়ে ছাপিয়ে আসতে হয়েছে। কোন সওয়ারী সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

এখন তোমরা আমাদের হেফাযতে থাকবে। তোমরা ইচ্ছা করলে আমাদের সাথে বেরায়ও ফিরে যেতে পার, আর চাইলে আমরা তোমাদেরকে মুলতান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি।" বললেন আলেম।

বৃদ্ধ হিন্দু কিছু স্বর্ণমুদ্রা ও অলংকার আলেমের সামনে রেখে বলল, "এখন যেহেতু আমরা উট ও ঘোড়া পেয়ে গেছি, মুলতান যেতে আর অসুবিধা হবে না। আপনারা আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন। মেহেরবানী করে এই নজরানা কবুল করলে কৃতজ্ঞ হবো।"

"হু, তোমরা কি আমাদেরকে ভাড়াটে খুনী ভেবেছো!" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠলেন আলেম। সম্পদের লিপ্সা থাকলে তরবারীর আঘাতে তোমাদের সবকিছু আমরা ছিনিয়ে নিতে পারতাম। এসব রাখো। আজ রাত আমাদের এখানে আরাম করো। তরুণীদের ঝর্ণায় নিয়ে গা ধুইয়ে আনো। জানোয়ারটার রক্তে ওদের শরীর মেখে গেছে।"

আলেম ও সাথীদের এই সৌজন্য ব্যবহার ছিল হিন্দুদের কাছে অকল্পনীয়। আলেম একথা বলার পর যুবকটি তরুণী দু'টিকে ঝর্ণায় নিয়ে গেল রক্ত মাখা শরীর পরিষ্কার করাতে।

আলেম হিন্দু বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "বেরার অবস্থা কি?" বৃদ্ধ বলল, "বেরার অবস্থা খুবই শোচনীয়। বেরার বাইরে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে উভয় বাহিনীর অর্ধেকের বেশী সৈন্য মারা গেছে। রাজা বিজি

রায় আত্মহত্যা করেছেন।” বৃদ্ধ আরো বলল, “মুসলমান সৈন্যসংখ্যা এখন এতো কম যে যদি কোন বহিঃশত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে সুলতান মাহমূদ বেরাকে রক্ষা করতে পারবেন না।”

“কার পক্ষ থেকে আক্রমণ আশঙ্কা রয়েছে?”

“আক্রমণ করলে রাজা আনন্দ পাল করতে পারেন। শুনেছি, পেশোয়ারের কাছে আনন্দপাল সুলতান মাহমূদের অগ্রাভিযান রুখে দেয়ার জন্যে পথ রোধ করেছিলেন। কিন্তু সুলতানের বাহিনী নদী পেরিয়ে আনন্দপালের সৈন্যদেরকে এভাবে ঘিরে ফেলে যে বহু কষ্টে জীবন নিয়ে পালিয়ে গেছেন আনন্দপাল। এখন রাজধানীতে রাজা আনন্দপালের ছেলে শুকপাল রয়েছে। ইচ্ছে করলে সে বেরা আক্রমণ করতে পারে।”

“আচ্ছা! আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?” আলেমকে জিজ্ঞেস করল হিন্দু বৃদ্ধ।

“মুলতান থেকে এসেছি আমরা। আমরা মুলতানের অধিবাসী।”

“তাহলে তো আপনারা অবশ্যই কেরামতী। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।”

“না, আমরা কেরামতীদের দুশমন। তুমি আমাদের সাথে নির্ভয়ে কথা বলতে পার, আমরা তোমাদের নিরাপত্তার ওয়াদা করেছি। তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না, ক্ষতি করতেও কাউকে দেবো না।” বললেন আলেম।

আলেমের কথা শুনে ম্লান হয়ে গেল হিন্দু বৃদ্ধের চেহারা। আলেম লক্ষ্য করলেন, বয়স্কা মহিলাকে এই লোকটি নিজের স্ত্রী পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু দেখে মনে হয় না এরা স্বামী-স্ত্রী। ইতোমধ্যে ঝর্ণা থেকে রক্তমাখা শরীর পরিষ্কার করে হিন্দু যুবকের সাথে ফিরে এসেছে দু’ যুবতী। আলেম গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন ওদের। যুবকটির চেহারা ও অবয়বের সাথে তরুণীদের কোন মিল নেই। তরুণী দু’টির রাজকুমারীর মতো অবয়ব। গায়ের রংও ওদের ফর্সা আর ওদের কথিত মা নিকষ কালো। মা মেয়ে এবং ভাই বোন ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেমন না আছে বয়সের সামঞ্জস্য, না আছে ওদের চেহারার আদল অভিব্যক্তির মিল। বস্তুতঃ বয়স্কা মহিলাটিকে ওদের সেবিকা বলেই মনে হয়। আর যুবকটি ওদের কোন হুকুম বরদার।

এই মৃত বদমাশগুলো তোমাদের পালিয়ে যেতে দিয়েছিল, আমরা তোমাদের যেতে দেবো না। এদের মতো আমরা তোমাদেরকেও হত্যা করব। আর মেয়ে দু’টিকেও নিয়ে যাবো। এই মহিলাকে রেখে যাবো এখানেই। যেন কোন হিংস্র জানোয়ার ওকে খেয়ে ফেলে। যদি আমাদের মিথ্যা বলো, তোমাদের এই পরিণতিই বরণ করতে হবে। আর যদি সত্য কথা বলো, তাহলে তোমাদের সসম্মানে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া হবে-এই মেয়ে দু’টি তোমার কন্যা নয়, আর এই যুবক ওদের ভাই নয়, এই মহিলাও ওদের মা নয়। ঠিক নয় কি? আমরা তোমাদের জীবন বাঁচিয়েছি, তোমাদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার ওয়াদা করেছি অথচ

তোমরা আমাদের সাথে মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছো। তোমরা কি বলোনি, কেরামতীরা তোমাদের সুহৃদ?

আলেমের কথায় পাণ্ডুর হয়ে গেল হিন্দু বৃদ্ধের চেহারা। সে বলল, হ্যাঁ, বলেছিলাম। ওদেরকে এ কথা বলার কারণেই ওরা আমাদের ছেড়ে দিয়েছিল।

"দেখো, রাজা-বাদশা-যুদ্ধ-ক্ষমতা এসবের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা ব্যবসায়ী, ব্যবসা আমাদের পেশা। তোমরা সঠিক পরিচয় দিলে আমরা আমাদের কৃত অঙ্গীকার পালন করবো।"

আপনারা আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন। আমাদের বখশিশ পর্যন্ত নেননি। আমাদের মুখে সত্য কথা শুনে যদি আপনারা খুশী হন তবে মনে করব আপনাদের কিছুটা হলেও কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পেরেছি, তাহলে শুনুন, আমি এদের পিতা নই, ওই বয়স্কা মহিলাও এদের মা নয়। আসলে এই তরুণী দু'জনের সেবিকা সে। যুবকটি এদের সেবক।

"সত্য ঘটনা বলো। অবশ্যই বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে তোমরা মুলতান যাচ্ছিলে?" জিজ্ঞেস করলেন আলেম।

"আপনার ধারণা ঠিক। আমরা মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরের কাছে এ পয়গাম নিয়ে যাচ্ছিলাম যে, সুলতান মাহমূদের কাছে এখন সৈন্যসংখ্যা খুবই কম। দাউদ যদি এ মুহূর্তে বেরা আক্রমণ করে তাহলে সুলতান মাহমূদ বেরা কব্জায় রাখতে ব্যর্থ হবে। কারণ দাউদ যদি বেরা ঘেরাও করে তাহলে বেরাতে যে তিন হাজার হিন্দু সৈনিক বন্দী রয়েছে এবং মন্দিরগুলোতে যেসব হিন্দু যোদ্ধা লুকিয়ে রয়েছে এবং যেসব হিন্দু নাগরিক সুলতানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগে নিজের বাড়িঘরে রয়েছে সবাই একসাথে বিদ্রোহ করে সুলতানের মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃআক্রমণের মুখে মুষ্টিমেয় সৈন্য দিয়ে কিছুই করতে পারবে না সুলতান। সুলতানকে পরাজিত করার এ এক মোক্ষম সুযোগ। আমরা এ সংবাদ নিয়েই মুলতান যাচ্ছিলাম।"

"তোমাদেরকে কে পাঠিয়েছে?"

"পরাজয়ের পর বিজি রায়ের সেনাবাহিনীর কয়েকজন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে। আমি বিজি রায়ের সরকারের মন্ত্রী ছিলাম। অন্যান্যের মতো আমিও মন্দিরে আত্মগোপন করেছিলাম। মন্দিরেই আমরা গোপনে সলাপরামর্শ করে ঠিক করি, এ মুহূর্তে যে করেই হোক দাউদ বিন নসরকে বেরা আক্রমণে রাজি করানো জরুরী। সবাই মিলে আমাকেই একাজে প্রতিনিধিত্ব করতে সাব্যস্ত করলেন। দাউদের জন্য উপহার হিসেবে সোনা গহনা, মুদ্রা ছাড়াও দেয়া হলো এই মেয়ে দু'টিকে। এরা রাজমহলের প্রশিক্ষিত রক্ষিতা। নারী, সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি আজন্ম লিপ্সা দাউদের। ওর এ চরিত্রের কথা ভালভাবে জানে

হিন্দুরা। তাই দাউদের সাথে তারা অর্থ ও নারীর ভাষায়ই কথা বলে। এই মেয়ে দু'টি বিজি রায়ের পরাজয়ের পর মন্দিরেই আত্মগোপন করেছিল। তাদেরকে বহু বলে কয়ে বুঝানো হলো যে, তাদেরকে দাউদের কাছে একটি মিশনে পাঠানো হচ্ছে। তারা নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে যে ভাবেই হোক দাউদকে যেন বেরা আক্রমণে রাজী করায়। হৃতরাজ্য উদ্ধার ও ধর্মের খাতিরে মেয়েরাও রাজী হয়।

আপনি যেসব সোনা গহনা দেখেছেন, এগুলো ছাড়াও আমাদের কাছে আরো মণিমুক্তা রয়েছে। এগুলো ডাকাতরা খুঁজে পায়নি। আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আমাদের কাছ থেকে কিছু সম্পদ আপনারা রেখে দিন। আপনারা আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন।" বলল হিন্দু বৃদ্ধ।

"আলেম বৃদ্ধকে ধমকের স্বরে বললেন, তোমাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছি, সোনা গহনা টাকার কথা আমার সামনে আর বলবে না। এসবের প্রতি আমাদের লোভ নেই। রাজ্য রাজা আর যুদ্ধের যে কাহিনী বলছো, তাতেও আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। আমাদের কাছে বড় বিষয় হলো, তোমাদেরকে নিরাপদে মুলতান পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার পালন করা। তোমাদের রাজার পরাজয় ও আত্মহত্যার পরও কি তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা পরাজয় মেনে নিতে পারেনি?" বৃদ্ধের অন্তরের আরো গভীর থেকে সত্য বের করার জন্যে কৌশলের আশ্রয় নিলেন আলেম।

পণ্ডিতেরা হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে ধর্মের অংশ মনে করছেন। পণ্ডিতেরা হিন্দুদের বলছে, "মাহমূদ গযনীর অবস্থান যদি বেরায় মজবুত হয়ে পড়ে তবে শুধু যে আমরা রাজ্যহারা হলাম তাই নয়, গোটা ভারত থেকে হিন্দুত্ববাদ বিলীন হয়ে যাবে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো সারা ভারতে সুলতান মাহমূদও ইসলাম ছড়িয়ে দেবে। তাই মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করা প্রত্যেক হিন্দুর ধর্মীয় কর্তব্য। ধর্মের জন্য প্রত্যেক হিন্দু নারী-পুরুষের জীবন বাজী রাখতে হবে। মুসলমানদেরকে হত্যা করা আজ হিন্দুদের প্রধান পুণ্যের কাজ। আপনি মুসলমান, আপনার কাছে হয়তো আমার কথা পীড়াদায়ক মনে হবে, কিন্তু আমি আপনাকে সত্য বলার অঙ্গীকার করেছি, এজন্য প্রকৃত সত্যই বলে দিলাম। এখন আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের হত্যাও করতে পারেন, ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিতে পারেন।"

এই হিন্দু বৃদ্ধ ও যুবক কোন সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক ছিল না, ছিল গোড়া হিন্দু। ধর্মের ভাবাবেগে সোনা গহনা ও তরুণী দু'টিকে সাথে নিয়ে রাস্তার বিপদাপদের কথা না ভেবেই এরা ধর্মীয় মিশনে বেরিয়ে পড়েছিল। সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে এতো সহজে এরা ভড়কে যেতো না এবং ভীত বিহ্বল হয়ে কঠিন সত্যগুলো এত সহজে প্রকাশ করত না। আলেম ওদেরকে অভয় দিলেন, বললেন, "তোমাদের ভয় নেই, আমরা তোমাদের উপর কোন জুলুম করবো না।" আলেম আরো বললেন, "তোমরা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারো, আমার লোকেরা তোমাদের পাহারা দেবে।"

এদের কাছে একজন সাথীকে প্রহরায় নিযুক্ত করে অপর দুজনকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে আলেম পরামর্শে বসলেন। দীর্ঘ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, এদেরকে মুলতানের পথে ছেড়ে দিবেন এবং তারা দ্রুত বেরায় পৌঁছে সুলতানকে জানাবেন মুলতানের অবস্থা। একথাও বলবেন, সুলতান যেন মন্দিরে লুকিয়ে থাকা হিন্দু সৈনিক ও দুষ্কৃতকারী পণ্ডিতদের গ্রেফতার করেন আর বিজি রায়ের ছেলে ও দাউদের আক্রমণ সম্পর্কে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

দরবেশকে অপহরণকারী কেরামতীরা মাঝ রাতে রওয়ানা হয়ে তীব্রগতিতে পথ চলে দিনের শেষ ভাগেই মুলতান পৌঁছে গিয়েছিল। এরা দরবেশকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দাউদের সামনে ফেলে দিয়ে বললো, "হুজুর! এই সেই চার কুমারী দুর্গের ঘাতক। এই লোকটিই সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে প্রহরীকে হত্যা করেছে।" তারা কিভাবে দরবেশের কাছ থেকে রহস্য জেনেছে এবং তাকে অপহরণ করেছে সবিস্তারে সব জানাল।

দাউদ বিন নসরকে যখন একথা জানাল যে, দরবেশের সাথে আরো চার ব্যক্তি ছিল এবং তারা বেরার পথে রয়েছে। তখন দাউদ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গর্জে উঠল, "ওদেরকেও ধরে নিয়ে আসলে না কেন?"

কমান্ডার শুধু একে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছিল। কমান্ডার এই খুনীর সাথীদের সাথেই বেরা যাচ্ছে।

এ খবর শুনে দাউদ দশ বারোজন চৌকস সৈনিককে শক্তিশালী ঘোড়া নিয়ে দ্রুত দরবেশের অপর সাথীদেরকেও ধরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। নির্দেশ পেয়েই তারা রওয়ানা হয়ে গেল দরবেশকে অপহারণকারী দুই সৈনিককে সাথে নিয়ে। এরা দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে চোখের পলকে শহর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাতের দ্বিপ্রহরে। আলেম ও তার দুই সাথী একজনকে পাহারায় নিযুক্ত করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ অনেকগুলো অশ্বখুরের আওয়াজ শোনা গেল। দ্রুতই শব্দটা এগিয়ে এলো তাঁবুর দিকে। পাহারাদার তার সাথী ও হিন্দুদেরকেও জাগিয়ে দিল। আলেম জেগেই আঁচ করলেন বিপদাশঙ্কা। তিনি দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে মেয়েদেরকে টিলার আড়ালে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে মশালবাহী কয়েকজন অশ্বারোহী এদিকটায় কি যেন খুঁজতে লাগল। যেখানে কেরামতীদের লাশ পড়েছিল মশালের আলোয় নজরে পড়ল ওদের। কাছে গিয়ে ওরা ওদের চেহারা পরখ করে এদিক সেদিক তাকাল। অনতিদূরেই ছিল ওদের উট ও ঘোড়াগুলো বাঁধা। উট ও ঘোড়া দেখে ওদের বুঝতে বাকী রইল না অবশ্যই ধারে কাছে মানুষ রয়েছে। এদের সাথে আরো এসে যোগ হলো আট দশজন অশ্বারোহী। সবাই সমস্বরে হুশিয়ার ধ্বনি দিতে শুরু করল কাউকে না দেখে। চিৎকার করে বললো, যারাই এখানে আছো বেরিয়ে এসো। না হয় কাউকেই জীবিত রাখা হবে না।

কয়েকবার এমন হুমকি দেয়ার পরও যখন কোন সাড়া পেল না তখন খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। টিলার চার পাশে ছড়িয়ে পড়ল সবাই। প্রথমেই তাদের নজরে পড়ল মেয়ে দু'টি। মেয়ে দু'টিকে তারা ধরে ফেললে। বয়স্ক হিন্দু দু'জনও বেরিয়ে আসলো আড়াল থেকে। অশ্বারোহীরা বলল, আমরা মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরের লোক তোমাদের এগিয়ে নিতে এসেছি। কিন্তু দরবেশকে অপহরণকারী দুই কেরামতী বলল, "আমরা যাদের খোঁজে এসেছি, এরা সেই লোক নয়। ওদের সাথে কোন নারী ছিল না।"

"এদেরকে কারা হত্যা করেছে?" কেরামতীদের লাশের দিকে হিন্দুদেরকে জিজ্ঞেস করল এক অশ্বারোহী।

"আমরা জানি না।" বলল বৃদ্ধ হিন্দু। "আমরা বেরা থেকে এসেছি। দাউদ বিন নসরের জন্য একটি পয়গাম নিয়ে মুলতান যাচ্ছিলাম, আমরা এখানে তাঁবু খাটানোর আগে থেকেই লাশগুলো পড়েছিল।"

"মিথ্যা বলছো তোমরা।" হুমকির স্বরে বলল দলনেতা। "কি পয়গাম নিয়ে মুলতান যাচ্ছো তোমরা?"

"আমাদের মুলতান যেতে দাও, যা বলার তা তোমাদের শাসক দাউদকেই বলব, আর কাউকে বলা যাবে না।" বলল বৃদ্ধা।

এক অশ্বারোহী তাদের বিছানাপত্র দেখে চেঁচিয়ে উঠল। "এখানে তো অনেক বিছানা। লোকতো দেখা যাচ্ছে কম। নিশ্চয়ই আরো লোক এখানে শুয়েছিল, তারা কোথায়?"

"এই মেয়েদের ন্যাংটা করে ফেলো।" নির্দেশ দিল কমান্ডার। "বুড়ো দু'টিকে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে মুলতান পর্যন্ত নিয়ে যাও। মেয়েদেরকে টিলার আড়ালে নিয়ে চল। দেখবে অল্পের মধ্যে এদের দেমাগ ঠিক হয়ে যাবে।"

মেয়েরা দেখতে পেল দৈত্যের মতো চৌদ্দজন অশ্বারোহী। চার পাঁচজন কমান্ডারের নির্দেশে তাদেরকে ন্যাংটা করতে অগ্রসর হলে মেয়ে দুটো চিৎকার শুরু করল। ততক্ষণ পর্যন্ত হিন্দু বৃদ্ধ ও যুবক আলেম ও তার সাথীদের সম্পর্কে মুখ খুলেনি।

যেই ওরা মেয়েদের কাপড় ধরে টানাটানি শুরু করল তখন আড়াল থেকে আওয়াজ এলো, "সাবধান! মেয়েদের গায়ে হাত তুলবে না, আমাদের গ্রেফতার করতে পার, এদেরকে আমরাই খুন করেছি।"

দৃঢ় পায়ে ওদের সামনে এগিয়ে এলেন আলেম। তিনি মেয়েদের বেইজ্জতি দেখে ওদের সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন। সাথীরা তার অনুগামী হলো। আলেম বললেন, "অযথা মেয়েদের উত্ত্যক্ত করো না। তোমাদের শাসকের কাছে নিয়ে চলো আমাদেরকে। যা বলার মুলতানের দরবারেই বলব সব।"

মুলতানের রাজদরবার। দাউদের রোষাগ্নিতে পতিত দরবেশ। বিস্ময়কর সেই প্রহরী হত্যার নায়ককে নিজেই জিজ্ঞেস করছিল দাউদ।

"তুমি কিভাবে সুড়ঙ্গ পথে ঢুকলে? প্রহরীকে হত্যা করলে কেন?"

"আমি তোমার এই প্রহরীকে হত্যা করেছি একথা প্রমাণ করতে যে, মৃত কুমারীদের জীবন্ত করে উপস্থিত করা এবং জিনকে বেঁধে রাখার ক্ষমতা মুলতান শাসকের নেই। দৃঢ়কণ্ঠে দাউদের জবাব দিল দরবেশ। এ বিষয়টিও আমি প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, এখানে কোন জিন-দানব নেই, কোন ভূত-প্রেতও নেই। কেরামতীদের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং প্রতারণা।"

প্রচণ্ড আক্রোশে দরবেশের চেহারায় একটা চপেটাঘাত করল দাউদ। বলল, "এতো বড় স্পর্ধা! আমার দরবারে দাঁড়িয়ে আমার কেরামত সম্পর্কে কটূক্তি করছো তুমি! তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো! জানো! তোমার জীবন-মৃত্যু এখন আমার হাতের মুঠোয়! আমার হাত থেকে তোমাকে এখন কে বাঁচাবে?"

"মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাবেন।" দৃঢ়কণ্ঠে বললেন দরবেশ। "দাউদ! ফেরাউন ক্ষমতার দম্ভে খোদা দাবী করেছিল। তার পরিণতির কথা তুমি জান। তোমার পরিণতি ফেরাউনের চেয়েও ভয়ংকর হবে দাউদ! আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, অচিরেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আবারো কষে একটা থাপ্পর মারল দাউদ। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, "আমার পায়ের নীচের একটি পিঁপড়ার চেয়েও নিকৃষ্ট তুমি। তোমার সাথে তর্ক করতেও আমার ঘৃণা হয়। একথা তোমাকে বলতেই হবে, তোমার সাথে কে কে ছিল এবং বেরায় কোন উদ্দেশে যাচ্ছিলে?"

"আমি একা। আল্লাহ্ ছাড়া আমার আর আপন কেউ নেই।" বলল দরবেশ। "তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হলো, আমি বেরা যাচ্ছিলাম ঠিক তবে কেন যাচ্ছিলাম তা কখনও বলবো না।"

"তোমরা মাহমূদ গযনীকে একথা বলতে যাচ্ছিলে যে, সে যেন মুলতান দখল করে কেরামতী শাসন ধ্বংস করে দেয়।" বললো দাউদ। "তুমি তো আমার কেরামতী দেখলে, তুমি বিজন প্রান্তরে একটা কথা বললে আর এতো দূরে থেকেও আমরা তা জেনে গেছি। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে পস্তাবে। তোমার হাড্ডি থেকে আমরা গোশ্‌ত আলাদা করে ফেলব। একটু পরে তুমি চিৎকার করে আমার কথার জবাব দেবে কিন্তু তখন আর তোমার জবাব আমরা শুনবো না। আজ রাত তোমাকে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ দেয়া হলো। কয়েদখানায় বসে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কর। আগামীকাল তোমাকে জবাব দিতে হবে, তোমার সাথে আর কে কে ছিল। সুড়ঙ্গ পথে তুমি কিভাবে প্রবেশ করেছিলে এবং সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা মুলতানে কতজন আছে এবং এরা কোথায় থাকে?

"ঠিক আছে, এসব প্রশ্নের জবাব না হয় আগামীকালই শুনবে। কিন্তু আজ শুনে রাখো, ক্ষমতার তখ্‌ত কারো জন্যে স্থায়ী নয়। ক্ষমতার মোহে পড়ে পৃথিবীতে বহু লোক ধ্বংস হয়েছে। তোমার মতো লোকেরা ক্ষমতার মসনদে বসে যখন মাথায় রাজমুকুট পরে তখন আল্লাহ্‌র ক্ষমতার কথাটি ভুলে যায়। তোমার মতো শাসকেরাই ক্ষমতায় বসে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়, জুলুম-অত্যাচার চালায়। কিন্তু আল্লাহকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। আল্লাহ্‌ সব সময় মজলুমদের পক্ষে, জালেমদের বিরুদ্ধে। তুমি মিথ্যা পয়গাম্বরী দাবী করে আল্লাহ্‌র সত্য ধর্ম ইসলামকে বিকৃত করেছো, স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করেছো। ধর্মের আশ্রয়ে নারীদের সম্ভ্রম লুটে নিয়ে তুমি ধর্মকে কলংকিত করেছো। তোমার মিথ্যা প্রকাশ করে দেয়ার জন্যই আমি সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে তোমার নিযুক্ত প্রহরীকে খুন করেছি। তুমি মহাপাপী। তোমার পাপ আল্লাহ্‌ কখনও ক্ষমা করবেন না।"

গর্জে উঠল দাউদ। "নিয়ে যাও একে! বন্দিশালায় আটকে রাখো।"

কয়েকজন রক্ষী দৌড়ে এসে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলল দরবেশকে। দরবেশের ভরাট কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল, "দাউদ! তোমার মিথ্যা দাবী ও পাপাচারের দিন শেষ। তোমার মসনদের উপরে আমি জহরের বজ্রপাত দেখতে পাচ্ছি ....! দাউদ, আল্লাহ্‌র গজবকে তুমি বন্দী করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র গজব তোমাকে ধ্বংস করবেই।"

"জাঁহাপনা! আমাকে অনুমতি দিন ওর ধৃষ্টতা জীবনের জন্যে খতম করে দেই।" দাউদকে নিশ্চুপ দাঁড়ানো দেখে বলল এক দরবারী। সে আরো বলল, "কেরামতী আদর্শের অপমান আপনাকে নীরবে সহ্য করতে দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি জাঁহাপনা!"

"মুলতানে আমার হাজারো শত্রু বেড়ে উঠেছে। আমার আস্তিনের মধ্যে রয়েছে কালসাপ। ওর কাছ থেকে আমাকে জানতে হবে, কে কোথায় রয়েছে। নয়তো একে তো আমি দরবারেই শেষ করে দিতে পারতাম।"

"এর সাথে যারা ছিল তারাও হয়তো ধরা পড়বে।" বলল এক দরবারী।

"উধাও হয়ে যেতে পারে।" বলল দাউদ। এদের চেয়েও আমার দৃষ্টি এখন মাহমূদের দিকে। মাহমূদের গতিবিধি সম্পর্কে বেরা থেকে একটা নিশ্চিত খবর পাওয়া খুব জরুরী। তার এক সেনাপতিকে হাত করে আমরা ফাঁদে ফেলতে পেরেছিলাম, কিন্তু আমাদের সে ধোঁকা ব্যর্থ হয়ে গেছে। খবর পেয়েছি, আমাদের নীল নক্সা ফাঁশ হওয়ার ফলে সে আত্মহত্যা করেছে। বিজি রায় পরাজিত হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে। মাহমূদ গযনীর হাতে সৈন্য কম বলেও তার মাথায় বুদ্ধি আছে। কিন্তু হিন্দুস্তানে সৈন্যের অভাব নেই কিন্তু বুদ্ধির ঘাটতি রয়েছে প্রচুর।"

সুলতান মাহমূদ বেরা জয় করে বিজয়ের তৃপ্তির চেয়ে প্রকট সৈন্য ঘাটতিতে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। সাম্রাজ্য বিস্তার তার নেশা নয়, ধন-সম্পদ, মণি-মুক্তো অর্জনের লোভও তার নেই, বেরা ছিল হিন্দুস্তানের মূল ভূখণ্ডের প্রথম শহর। বেরায় মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যাও খুব কম ছিল না কিন্তু অধিকাংশ মসজিদ মন্দিরে রূপান্তরিত দেখে তার অন্তর কেঁদে উঠেছিল। তিনি বেরার কোথাও ইসলামের কোন অবিকৃত চিহ্ন দেখতে পেলেন না।

বেরা দখলের পর সর্বপ্রথম পণ্ডিতদের দল সুলতানকে স্বাগত জানাতে আসল। পণ্ডিতরা সুলতানের সামনে এসে দু' হাত জোড় করে প্রথমে তাকে নমস্কার জানাল এরপর কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম করল। বিজয়ের পর পেশোয়ারের পণ্ডিতরাও এভাবেই তাকে অভিবাদন জানিয়েছিল। সুলতানকে সিজদা করতে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন; ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "দাঁড়াও তোমরা। আমি খোদা নই। এভাবে কোন মানুষকে সিজদা করা এবং সিজদা গ্রহণ করা শির্‌ক। আমি তোমাদের শহর দখল করেছি বটে কিন্তু শহরের অধিবাসীদের প্রভু হয়ে যাইনি। আমাদের ধর্মে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা হারাম। তোমরা আমাকে গোনাহ্‌গার করছো। তোমরা কি বলতে চাও, তা বল।"

"জাঁহাপনা! আমরা আপনার কাছে আমাদের জীবন ও মন্দিরের মর্যাদা ভিক্ষা চাচ্ছি।" দু'হাত জোড় করে নিবেদন করল পণ্ডিতগণ।

"এখানকার মসজিদগুলোর যে সম্মান তোমরা দিয়েছো, মন্দিরের সে রকম মর্যাদাই কি তোমরা চাও?" পণ্ডিতদের বললেন সুলতান। "তোমরা যেমন এখানকার মুসলমানদের মর্যাদা দিয়েছিলে সে রকম মর্যাদা কি তোমরা চাচ্ছো? তোমাদের রাজমহল থেকে হিন্দু নারীর চেয়ে মুসলমান মেয়েই বেশী উদ্ধার করা হয়েছে। তোমরা যদি ধর্মের খাঁটি অনুসারী হতে তাহলে মেয়েদের এভাবে বেইজ্জতি বরদাশ্‌ত করতে না। নারীর ইজ্জত সম্ভ্রম লুণ্ঠন করাই কি তোমাদের ধর্ম?"

"মহামান্য মহারাজ! আমাদের করার কিছুই ছিল না।" বলল বড় পণ্ডিত। "আমাদের দেশে মহারাজার হুকুম ধর্মের বিধানের মতোই পালনীয়।"

"তবে তোমাদের দেশে ধর্ম মহারাজার গোলাম। আর তোমাদের মতো যারা ধর্মের কাণ্ডারী, ধর্মের পাহারাদার তারা ধর্মকে মহারাজাদের পায়ের নীচে সোপর্দ করেছো।" বললেন সুলতান। পণ্ডিত ও দুভাষীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তার একান্ত এক সেনাধ্যক্ষকে বললেন, "আমাদের ধর্মের বহু শাসক ও আলেমদের মধ্যেও এ ব্যাধি রয়েছে। আমাদের শাসকশ্রেণী, আমীর, শরীফ ও ধর্মীয় পণ্ডিতেরাও নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে ধর্মকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। শাসকরা নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে নিজেদেরকে ইসলামের খাদেম বলে দাবী করে।"

"মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরও এই ব্যাধিতে আক্রান্ত।" বললো সেনাধিনায়ক।

সুলতান ও সেনাধিনায়কের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল ফারসী ভাষায়। বেরার পণ্ডিতেরা ফারসী জানতো না। তাই তাদের পক্ষে সুলতানের কথা বুঝার কোন উপায় ছিল না।

সুলতান দোভাষীর মাধ্যমে বললেন, পণ্ডিতদের বলে দাও, তোমাদের দেবদেবী যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাদের বল তোমাদের জীব ন মান-সম্মান ও ধর্মকে যেন তারা রক্ষা করে। দেব-দেবীদের বলো, তারা নিজেদের রক্ষা করুক। আমি গোনাহ্গার বলছি, তোমাদের দেবদেবীগুলোকে যদি মন্দির থেকে বাইরে ফেলে দেই, তোমরা দেখতে পাবে, একজন গোনাহ্গার ব্যক্তির হাত থেকেও এরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। ওরা আবার মানুষের অপরাধের শাস্তি দিবে কিভাবে?

দোভাষী যখন স্থানীয় ভাষায় পণ্ডিতদের উদ্দেশে সুলতানের কথা ব্যক্ত করল, পণ্ডিতদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল।

সুলতান বললেন, "আমি জানি, ধর্মের বরকন্দাজ সেজে মন্দিরগুলোতে তোমরা কতো জঘন্য অপকর্ম কর। তোমাদের ধর্মের মেয়েরাই তোমাদের ইবাদাতখানাগুলোতে সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচতে পারে না। এজন্যই কি তোমরা কাদা-মাটি, ইট-পাথর দিয়ে দেবদেবী বানিয়ে রেখেছো, যাতে ওরা তোমাদের কোন অপকর্মে বাধা দিতে না পারে? তোমরা আমার কাছে তোমাদের ইজ্জত, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষার আবেদন নিয়ে না এলেও আমি কোন নারীর ইজ্জত ও কোন নাগরিকের জীবন সম্পদের ক্ষতিসাধন হতে দিতাম না। বেকসুর মানুষের জীবন সম্পদ রক্ষা করা আমার আল্লাহ্র হুকুম। আমাকে এসব থেকে আল্লাহ্ বিরত রাখেন। আল্লাহ্র নির্দেশ পালনেই আমি এখানে এসেছি। সব কাজ আমি আল্লাহ্র বিধান মতো সম্পাদন করার চেষ্টা করি।"

চকিতে দুভাষীর দিকে ফিরে সুলতান বললেন, "ওইসব পণ্ডিতদের তুমি জিজ্ঞেস কর, ওরা মন্দিরের ভিতরে পালিয়ে আসা হিন্দু সৈনিক, মন্ত্রী ও বড় বড় কর্তাব্যক্তিদের লুকিয়ে রাখেনি তো? ওদের জিজ্ঞেস কর, মন্দিরের ভিতরে বসে পণ্ডিতেরা আমাদের বিজয়কে নস্যাত করার জন্যে চক্রান্ত করবে না এমন গ্যারান্টি কি তারা দিতে পারবে?"

"না মহারাজ!" দোভাষীর কথা শুনে হাতজোড় করে বলল বড় পণ্ডিত। "আমরা আপনার গোলাম। মন্দিরে আপনার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে না।"

"ওরা কোথায়?" ডানে বামে তাকিয়ে বললেন সুলতান। "যাদেরকে লাহোরের পথ থেকে ধরে আনা হয়েছে ওদেরকে এখানে হাজির কর।" একটু পরেই পিঠমোড়া করে হাত বাঁধা দু'জনকে দরবারে হাজির করা হলো।

পণ্ডিতদের উদ্দেশে সুলতান বললেন, "তোমরা কি চেন এদের?" বন্দীদের বললেন, "তোমরা এদেরকে বল কেন তোমাদের গ্রেফতার করা হয়েছে?"

"এই পণ্ডিতরাই আমাদেরকে লাহোর পাঠিয়েছিল। লাহোরের রাজা আনন্দ পালের পুত্র শুকপালের কাছে পণ্ডিতেরা আমাদেরকে এ সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিল যে, বেরা বিজয়ী সুলতান মাহমূদের সৈন্যবল একেবারেই কম। এখনই বেরা আক্রমণ করে বিজি রায়ের পরাজয় ও আনন্দ পালের পলায়নের প্রতিশোধ নিতে তারা শুকপালের বেরা আক্রমণের জন্যে অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। এরা আমাদের কাছে বলে দিয়েছিল, বেরায় যে বিপুল পরিমাণ হিন্দু সৈনিক বন্দী হয়েছে, আক্রমণ হলে তারা বিদ্রোহ করে সুলতানের বাহিনীর জন্যে ভয়ংকর হয়ে উঠবে।"

নিজ নিজ অপরাধের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিল দুই কয়েদী।

"সন্দেহজনক অবস্থায় এদেরকে আমার সৈন্যরা পথ থেকে গ্রেফতার করেছে।" বললেন সুলতান। "আমরা এ কথাও জানতে পেরেছি, তোমরা মুলতানে দাউদের কাছেও এ ধরনের খবর পাঠিয়েছ।"

"তোমরা আমার কাছে জীবনের নিরাপত্তা চাইতে এসেছো। হে মূর্তিপূজারীরা! মনে রেখো, তোমরা আমার সৈন্যদের অগ্রাভিযান রুখতে পারবে না। তোমাদের দেব-দেবীদের বলোনা, তারা আমার বিজয়কে নস্যাৎ করে দিক। তোমরা যেমন মিথ্যুক, প্রতারক, তোমাদের দেব-দেবী বিশ্বাসও ভিত্তিহীন কাল্পনিক। তোমাদেরকে আমি এতটুকু সুযোগ দিতে পারি, তোমরা তোমাদের মূর্তিগুলো কাঁধে নিয়ে শহর থেকে চলে যাও। অন্যথায় তোমাদের স্বধর্মীয় বন্দীদের দিয়েই আমি এগুলো গুড়িয়ে দেবো। আমি যে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছি তা যদি গ্রহণ কর তবে নিরাপদে সম্মানে এখানে বসবাস করতে পারবে। তোমরা তো কায়া ও দেহ পূজারী; এসব ত্যাগ করে এখন রূহ ও আত্মাকে সমৃদ্ধ কর, আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামত আত্মাকে খোরাক দাও, এতো দিনতো শুধু দেহের স্বাদ মেটালে এখন আত্মার স্বাদ মেটাও। সম্পদ, অর্থ আর সোনা দানাতো খুব জমিয়েছো। এসবের মধ্যে সুখ নেই। আল্লাহ্র রহমতের সুখে সুখী হও। যাও! আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবে কি-না চিন্তা করে দেখো, এরপর আমাকে জবাব দাও।"

পণ্ডিতরা হতাশ হয়ে চলে গেলে সুলতানকে একজন আলেম বলল, "মাননীয় সুলতান! এরা গোড়া হিন্দু। এরা আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে আসেনি, এসেছে আপনাকে ধোঁকা দিতে। এরা দেহ পূজারী, নিজেদের স্বার্থে এরা ধর্মকে ব্যবহার করছে।"

"ব্রাহ্মণরা ইসলামের ঘোর শত্রু। এরা জানে, ইসলামে জাত-পাত নেই, উঁচু-নীচু নেই। সবাই সমান। কিন্তু এরা ধর্মের নামে সমাজে শ্রেণীবৈষম্য তৈরী করে রেখেছে। এরা জানে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের প্রভুত্ব শেষ হয়ে যাবে।"

এই আলেমের নাম হলো সাঈদুল্লাহ। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। সেই সময়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরীদের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক পরহেযগার লোক

এ অঞ্চলে ছিলেন তন্মধ্যে সাঈদুল্লাহ্ উল্লেখযোগ্য। সুলতান মাহমূদের বেরা বিজয়ের খবর শুনে তিনি তাকে স্বাগত জানাতে হাজির হন। সুলতান মাহমূদ আলেম ও জ্ঞানীদের সম্মান করতেন। তাঁর দরবারে আলেমগণ সব সময়ই কদর পেতেন।

মৌলভী সাঈদুল্লাহ্ সুলতানকে বললেন, "এ অঞ্চলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের একজন অনুসারী দীর্ঘদিন ধরে এমন অভিযানের জন্যে অধীর অপেক্ষা করছে। তাদের প্রত্যাশা ছিল, কোন ন্যায়-পরায়ণ মুসলিম নেতা যদি এ অঞ্চলে অভিযান চালায় তবে তারা জীবনবাজী রেখে বেঈমান কেরামতী ও হিন্দু-মুশরিকদের পদানত করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে, যাতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের হৃতগৌরব পুনরুজ্জীবিত করে আবার এ অঞ্চলকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনা যায়।

মাননীয় সুলতান! হিন্দুরা স্বভাবজাত ধোঁকাবাজ। ব্রাহ্মণরা নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে হেন কোন অপকর্ম ও অপকৌশল নেই যা তারা করতে পারে না। আপনি দেখলেন তো, একদিকে ওরা আপনাকে পরাজিত করতে চক্রান্তের জাল বিছিয়েছে, অপরদিকে আপনার দরবারে এসে আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইছে। এদেরকে বিশ্বাস করা কঠিন। দৃশ্যত আনুগত্যের ভান করবে কিন্তু অন্তরালে আপনার প্রশাসনকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য ইঁদুরের মতো কাটতে থাকবে। এরা ইসলাম গ্রহণ করলেও দুশমনী ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। ভিতরে ভিতরে ঘুণের মতো মুসলিম শাসনকে দুর্বল করতে থাকবে। ফোকালা করে দেবে আপনার প্রশাসনকে।"

"আমাদের শক্তির খুঁটি ও শিকড় তো আমাদের জাতি-ভাইয়েরাই কাটছে। ক্ষমতালিপ্সু ও দুর্নীতিপরায়ণ মুসলিম শরীফ শ্রেণীই তো আমাদের প্রশাসনকে ফোকলা করে দিচ্ছে। পারস্পরিক ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ অমিত সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। যে সৈন্যদের কর্তব্য ছিল মুশরিক পৌত্তলিকদের নির্মূল করা, তারা ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। আপনি দেখুন, এ অঞ্চলের সব মুসলিম রাজ্য ও সৈনিক যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তবে এক অভিযানেই সারা ভারত জয় করা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজধানী থেকে দূর অভিযানে বেরুলে সব সময় আমি উৎকর্ণ থাকি কখন না খবর আসে, প্রতিবেশী কোন মুসলিম শাসক গযনী আক্রমণ করেছে। আমাদের জ্ঞাতি শাসকরা ঈমান আমল নিলাম করে ফেলেছে। রাসূল আকরাম (সাঃ) যাদের হাতে ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যারা মুসলিম সেনাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার কথা তারা নিজেরাই ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে। এরা শির্‌ক নির্মূল করার পরিবর্তে শিরকের পৃষ্ঠপোষকতা করছে।"

"মাননীয় সুলতান! আপনাকে আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, দীর্ঘদিন ধরে বৈরী শক্তির মোকাবেলা ও অমুসলিম শাসনাধীনে থেকেও ঈমানকে আমরা বুকে

পুষে রেখেছি, আপনি এখান থেকে চলে গেলেও মুসলমানের ঈমান রক্ষার জিহাদ আমরা অব্যাহত রাখবো। ইনশাআল্লাহ্।"

"এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ঈমান ব্যাপারী তো মুলতানের ক্ষমতার অধিকারী দাউদ। সে তো রীতিমতো ঈমান বিক্রির মেলা বসিয়েছে।"

"জ্বী হ্যাঁ, আমরা শুনেছি, মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর ও হিন্দুরা মিলে সাংঘাতিক চক্রান্ত করছে, মুসলমানরা দলে দলে ঈমানহারা হচ্ছে।"

"সেই খৃস্টানের দেমাগের প্রশংসা করতেই হয়, হতভাগা মুসলমানদের ঈমান হরণের সাংঘাতিক এক ফেরকা তৈরী করেছে। যারা কেরামতী নামে মুসলিম পরিচয় দিয়ে বেঈমানীর বাজার গরম করেছে। দাউদ কেরামতীর ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম কর্ম নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা নেই। তার সবচেয়ে বড় চাহিদা ক্ষমতা আর ভোগ-বিলাসিতা।"

* * *

এদিকে আলেম ও তার সাথীদের বন্দী করে ফেলল কেরামতীরা। আলেম দেখলেন, চৌদ্দজন সৈনিকের সাথে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়া মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা, এর চেয়ে ওদের অপকর্ম সম্পর্কে দাউদকে বললে হয়তো একটা সুরাহা হবে। তাই তিনি মোকাবেলা না করে স্বেচ্ছায় গ্রেফতারী বরণ করে নিলেন। সাথীরাও তার অনুগামী হলো।

কেরামতী সৈনিকরা তাদের হাত বেঁধে ফেলল। হিন্দু কাফেলাসহ সবাইকে নিয়ে রওয়ানা হলো মুলতানের উদ্দেশে।

দিনের অপরাহ্নে মুলতানের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল তারা। লোকজন দেখতে পেল চৌদ্দ জন সৈনিকের একটি কাফেলা। তাতে তিনজন নারী দু'জন হিন্দু এবং চারজন বন্দী। বন্দীদের হাত বাঁধা। দর্শকরা আশ্চর্য হলো আলেমকে দেখে। কারণ, মুলতানে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। আলেমের সাথী যুবকরাও অনেকের পরিচিত। কি বিস্ময়! তাদেরকে সৈনিকেরা হাত বেঁধে আনল কোত্থেকে? কি অপরাধ করেছে এরা?

যারাই এই কাফেলাকে দেখছিল, আলেমকে বন্দী দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করছিল, এরা কি করেছে, বন্দী করা হলো কেন?

"হত্যা! এরা হত্যা করেছে?" বলল এক সৈনিক।

"কাকে হত্যা করেছে?"

"সেনাবাহিনীর লোক হত্যা করেছে।"

"আমরা সৈন্য হত্যা করিনি ডাকাত হত্যা করেছি।" চিৎকার দিয়ে বললেন আলেম।

"আমরা এই মহিলার সম্ভ্রম হরণকারী চার কেরামতীকে হত্যা করেছি।" উচ্চ আওয়াজে বলল বন্দী এক যুবক।

"চুপ কর!" ধমকে বলল এক সৈনিক।

"আল্লাহ্‌র আওয়াজকে তোমরা শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে পারবে না।" চিৎকার দিয়ে বলল অপর বন্দী যুবক।

অবস্থা বেগতিক দেখে সৈনিকরা তাদেরকে পেটাতে শুরু করল। তারাও আর উচ্চবাচ্য করল না।

দাউদকে খবর দেয়া হলো, দরবেশের সাথীদের গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। আরো বলা হলো, আমাদের যে চার গোয়েন্দা বেরা যাচ্ছিল দরবেশের সাথীরা তাদেরকে খুন করেছে। সেই সাথে এ খবরও দেয়া হলো, দু'জন পুরুষ ও তিনজন হিন্দুর একটি কাফেলা বেরা থেকে পয়গাম নিয়ে এসেছে।

সবার আগে হিন্দুদেরকে ডেকে পাঠালো দাউদ। হিন্দু বৃদ্ধ দরবারে এসে দাউদকে কুর্নিশ করে দুই তরুণীকে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল। সেই সাথে দাউদের পায়ের কাছে একটি চামড়ার থলে মেলে ধরল। দাউদ একবার তরুণীদের আরেকবার পায়ের কাছে স্তূপীকৃত স্বর্ণমুদ্রা দেখছিল। তরুণীদ্বয় তাদেরকে বরণ করে নিতে মুচকি হাসি ও সলজ্জ আনুগত্য ও অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল অবয়ব জুড়ে। একে তো এরা সীমাহীন সুন্দরী, তদুপরি কাউকে কাবু করতে এদেরকে দীর্ঘ ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল দক্ষরূপে। কোন কাজে কিসের জন্যে তাদেরকে কার কাছে পাঠানো হচ্ছে সে কথা তাদেরকে আগেই বলে দিয়েছিল পণ্ডিতেরা। তাই অল্পক্ষণের মধ্যে দাউদের মনে কামাগ্নি জ্বালিয়ে দিল তরুণী দু'টি। ওদের পটলচেরা চাউনী ও মোহনীয় ভঙ্গিতে বেসামাল হয়ে পড়ল দাউদ।

বৃদ্ধ হিন্দু জানাল, "আমি বিজি রায়ের সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় কমান্ড ইন চীফ ছিলাম। মহারাজার পরাজয়ের পর আমরা মন্দিরে আশ্রয় নেই। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে মন্দিরের মধ্যে রাজকোষের অধিকাংশ স্বর্ণ, রৌপ্য লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিভাবে তাদের পরাজয় ঘটল এবং সুলতান মাহমূদের অবস্থা এখন কিরূপ সবই সবিস্তারে জানাল বৃদ্ধ। তার কাছে তাকে কোন উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তাও ব্যক্ত করল। বলল, লাহোর ও বাটান্ডাতেও পয়গাম পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকেও সৈন্য আসবে। তখন আপনার কাজ আরো সহজ হয়ে যাবে। হিন্দু বৃদ্ধ আরও বলল, আপনি যদি শাসন টিকিয়ে রাখতে চান তবে আপনাকে বেরা আক্রমণ করতেই হবে। বেরা আক্রমণ করলে আপনি শুধু শত্রুমুক্ত হবেন না, অঢেল সম্পদও আপনার কব্জায় আসবে।

খুব গম্ভীরভাবে বৃদ্ধের কথা শুনছিল দাউদ। বৃদ্ধ বলা শেষ করার পরও দাউদের কাছ থেকে সে কোন প্রতিক্রিয়া পেল না। হিন্দু বৃদ্ধ জানতো, যুদ্ধবিগ্রহ কেরামতীদের ধাতে নেই। এই বেঈমান গোষ্ঠী চক্রান্তের ফসল। চক্রান্তই এদের প্রধান হাতিয়ার। ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও ইসলামের মোড়ক এঁটে কুফরী কর্মই এদের

টিকে থাকার প্রধান সহায়ক। কেননা, ইসলামের নামে কুফরী মতবাদ প্রচার করে খাঁটি মুসলমানদের ঈমান হারা করতেই খৃস্টান, হিন্দু ও ইহুদীরা এদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে। কেরামতীদের এসব দুর্বলতা ও দাউদের সাহস সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল হিন্দু বৃদ্ধের। তাই সে বলল, "মহামান্য মুলতানের অধীশ্বর" বাটান্ডা ও লাহোরের সৈনিকদের আপনার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আপনি বিলক্ষণ জানেন, আপনার ক্ষমতা আমাদের সহযোগিতায় টিকে রয়েছে। এও জানেন, চারপাশে হিন্দু রাজা মহারাজাদের বেষ্টনীর মধ্যে আপনার অবস্থান। হিন্দুরা যদি আপনার সহযোগিতা না করে আপনাকে আর্থিক সাহায্য না দেয় তাহলে ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আপনার উপায় থাকবে না। আপনি যদি বেরা অভিযান না করেন তাহলে আমরা এটাই বুঝব, আপনি আমাদের মিত্র নন, গজনী শাসকের মিত্র। তখন আমরা আপনার সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করব, সব সহযোগিতা বন্ধ করে দেব এবং কেরামতীদেরকে জানিয়ে দেবো আপনার পয়গাম্বরীর গূঢ় রহস্য ও প্রতারণার গোপন কথাও ফাঁস করে দেবো।"

দাউদ হিন্দু বৃদ্ধের কুশলী চালে ঘাবড়ে গেল। বলল, "দেখুন! আপনি নিজেও একজন সেনাধিনায়ক। প্রায় শত মাইল দূরে গিয়ে কোন শহর অবরোধ করার মতো সৈন্যবল আমার নেই, বড় জোড় এখানে কেল্লাবন্দী হয়ে লড়াই করতে পারব।"

"শত মাইল দূরে হলেও আপনাকে সেনাভিযান করতেই হবে। আমরা আপনার সৈন্যদের সুলতান মাহমূদকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ব্যবহার করবো। আপনার অগ্রাভিযান দেখেই মাহমূদ বেরা শহর ছেড়ে বাইরে চলে আসবে, আপনাকে অবরোধ করার সুযোগ সে দেবে না। কারণ, সে জানে অবরোধের জের পোহাবার সামর্থ তার নেই। মাহমূদ শহর থেকে বেরিয়ে এলেই লাহোরে ও বাটান্ডার সৈন্যরা তাকে ঘিরে ফেলবে। আপনার কিছুই করতে হবে না। সে লাহোর ও বাটান্ডার সৈন্যদের মোকাবেলাই তো সামলাতে পারবে না। সে আপনার দিকে আসার সুযোগই পাবে না। এর আগেই খেলা খতম হয়ে যাবে। আমরা আপনাকে এই ওয়াদা দিচ্ছি যে, মাহমূদকে বন্দী করে আপনার হাতে তুলে দেবো।"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল দাউদ। এমতাবস্থায় তার দৃষ্টি পড়ল পায়ের কাছে পড়ে থাকা স্বর্ণমুদ্রায়; দৃষ্টি মুদ্রা থেকে সরিয়ে দুই তরুণীর দিকে ফেরাল দাউদ। তরুণীদের দিকে তাকানোর পর তার চিন্তাক্লিষ্ট চেহারা বদলে গেল। তার অভিব্যক্তিতে তখন প্রকট হয়ে উঠল যুদ্ধবিগ্রহ ও যুদ্ধাভিযান ইত্যাকার বিষয়াদির প্রতি বিতৃষ্ণা। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, সে হিন্দু বৃদ্ধকে এখান থেকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে।

"আমার বাহিনীকে কখন রওয়ানা করতে হবে?" বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল দাউদ।

"প্রস্তুতি শুরু করে দিন আপনি।" বলল বৃদ্ধ। "আমি এখন বেরা যাচ্ছি, সেখানে আমি লাহোর ও বাটান্ডার সৈনিকদের আগমন সংবাদ জানতে পারবো। তাদের সেনাবাহিনী রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়েই আমি আপনাকে দ্রুত সংবাদ পাঠাবো। আপনি রসদপত্র গরুর গাড়িতে বোঝাই করে রাখুন, যাতে খবর পাওয়া মাত্র অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারেন।"

দাউদ বিন নসর হিন্দু আগন্তুকদের আপ্যায়নে শরাব ও কাবাব আনার নির্দেশ দিলে তার এক দরবারী স্মরণ করিয়ে দিল, বন্দীদের নিয়ে বাইরে সৈন্যরা অপেক্ষা করছে। বন্দীদেরকে হাজির করার নির্দেশ দিলে তাদেরকে হাজির করা হলো।

"তোমাদেরকে বেশী কথা বলার সুযোগ দেবো না।" আলেম ও তার সাথীদের উদ্দেশে বলল দাউদ। তোমাদের এক সাথী চার কুমারী দুর্গে আমার এক প্রহরীকে হত্যা করেছে। তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তোমরাও তার সাথে ছিলে। এ ছাড়াও তোমরা আমার চৌকস চারজন সৈন্যকে হত্যা করেছো। তা কি ঠিক নয়? কেন তোমরা এদেরকে হত্যা করলে?"

"এর জবাব আমার কাছে শুনুন, মহামান্য মহারাজ!" বলল বৃদ্ধ হিন্দু। এরা যদি এ চার পাষণ্ডকে হত্যা না করতো তাহলে এই সোনার মুদ্রা আর এই তরুণীরা আপনার কাছে পৌঁছাতে পারতো না। আমরা তো কিছুতেই বুঝতে পারতাম না, এরা আপনার সৈনিক কিনা। হিন্দু বৃদ্ধ চার কেরামতী হত্যার ইতিবৃত্ত সবিস্তারে জানাল দাউদকে এবং বলল, এই বুযুর্গ ব্যক্তি ও তার সাথীরা উদ্ধার না করলে স্বর্ণ ও মেয়েগুলোর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেতো না।

আমরা তো এদের কাণ্ড দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একদল হায়েনার কবল থেকে আরেক দলের পাল্লায় পড়লাম। কিন্তু এই বুযুর্গ আলেম তরুণীদের কাপড় পরালেন, আমাদের নিশ্চিন্ত করলেন। আমরা তাকে উপঢৌকন পেশ করলাম। তিনি আমাদের উপঢৌকন গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানালেন। এমতাবস্থায় মধ্যরাতে আপনার এই সৈন্যরা আমাদের ধরে নিয়ে আসে।"

দাউদ তাকাল বন্দীদের দিকে। আলেম বললেন, "কিছুতেই আমাদের বুঝার উপায় ছিল না, এরা আপনার সৈনিক। আমরা তো এই নিরপরাধ মেয়েগুলোর জীবন বাঁচানোর জন্যে এদেরকে হত্যা করেছি।"

"বন্দী ওই বুড়োর সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক?" আলেমকে জিজ্ঞেস করল দাউদ। "আমি জানি, তোমরা সুলতান মাহমূদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বেরা যাচ্ছিলে।"

"তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।" বললেন আলেম। "আমরা বেরা যাচ্ছিলাম ঠিক কিন্তু আমরা জানি না, সুলতান মাহমূদ কোথায় থাকে। আমরা ব্যবসায়ী, ব্যবসার কাজেই যাচ্ছিলাম।"

"মহামান্য আমীর! এরা আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে, মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করেছে, আপনার আমানতকে হেফাযত করেছে। আমাদের উপঢৌকন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। আমি এদেরকে মুক্ত করে দিয়ে আপনার দ্বারা পুরস্কৃত করতে চাই।" বলল বৃদ্ধ হিন্দু।

তরুণী দু'জনের দিকে তাকাল দাউদ। তরুণীরা কয়েকবার বলল, "হ্যাঁ, এদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। যদি এরা পশুগুলোকে হত্যা না করতো........।"

"ছেড়ে দাও এদের......।" স্মিত হাস্যে নির্দেশ করল দাউদ। দাউদের নির্দেশে আলেম ও তার সাথীদের মুক্ত করে দেয়া হলো।

* * *

দু' তিন রাত পরের ঘটনা। সেই পুরনো হাভেলীতে আবার গভীর রাতে মিলিত হলেন আলেম ও তার সাথীরা। দরবেশ ও আলেম গ্রেফতার হয়ে আলেম ও তার তিন সাথী মুক্ত হওয়ার পর তাদের অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তদুপরি তারা করণীয় নির্ধারণে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মিলিত হতেন নিয়মিত। এ রাতেও একে একে মিলিত হলেন সবাই। আলোচনার বিষয় ছিল দরবেশকে মুক্ত করা। দরবেশকে মুক্ত করার কোন ব্যবস্থাই দেখা যাচ্ছিল না। তাকে জেলখানার কোন জায়গায় কোন ঘরে রাখা হয়েছে কোন ধারণা নেই তাদের। বিগত দু'দিন তাদের কয়েকজন জেলখানার দেয়াল পরখ করে দেখেছে। হুক ছুড়ে দেয়ালের উপর উঠে তাকে মুক্ত করার চিন্তাও জানবাজ যুবকরা করেছিল। কিন্তু তাতে বৃথা জীবনহানি ঘটতে পারে বিধায় আলেম তাতে সারা দিলেন না। আলেম তাদের বুঝালেন, বাস্তব ও ফলপ্রসূ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কি না তা ভেবে দেখো।

এসব ভাবনায় আলেমের সময় ক্ষেপণে কিছুটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এক যুবক। বলল, "আমাদের বুযুর্গ সাথী জল্লাদের তরবারীর নীচে মৃত্যুর প্রহর গুণছে, এ কথাটি আপনারা অনুধাবন করছেন না কেন? আমাদের কারো জীবন চলে গেলেও তাতে আপত্তি নেই, তবুও তাকে মুক্ত করা একান্ত কর্তব্য।"

আলেম তাকে সান্ত্বনা দিতে বললেন, "দেখো, আমরা দরবেশকে মুক্ত করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে দরবেশকে তখনি জল্লাদের হাতে খুন হতে হবে। জীবন মরণের মালিক আল্লাহ্। আমরা যা কিছু করছি আল্লাহ্র জন্য করছি। ধৈর্য ধরো, আল্লাহ্ অবশ্যই একটা সুরাহা করবেন।"

হঠাৎ কে যেনো কড়া নাড়ল দরজায়। সবাই সতর্ক হয়ে গেলেন পালানোর জন্য। কারণ গ্রেফতার ও মুক্তির পর তাদের পদে পদে বিপদাশঙ্কা আরো বেড়ে গিয়েছিল। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে দরবেশ সবার ঠিকানা বলে দিতে পারেন এমন আশঙ্কাও তাদের আলোচনায় ছিল।

দু'জন হাতে খঞ্জর নিয়ে পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একজন দরজার শিকল খুলে দিয়ে দরজার আড়ালে চলে গেল। অন্যজন অপর পাল্লার আড়ালে লুকাল নিজেকে। ভিতরে এক লোক প্রবেশ করল। বন্ধ করে দিল দরজা। আগন্তুক তাদেরই একজন।

"এখানে ক'জন আছে?" জিজ্ঞেস করল আগন্তুক।

"আটজন।" জবাব দিল একজন।

"সবাই বাইরে চলে এসো। দরবেশকে চারজন সৈনিক এদিকে নিয়ে আসছে। আমরা ইচ্ছে করলে দরবেশকে এখন মুক্ত করতে পারি। এখন শহর একেবারে জনশূন্য। কাজটি করার এখনি উপযুক্ত সময়।"

কয়েদখানায় দরবেশের হাড়গুড়ো করে ফেলেছিল অত্যাচার চালিয়ে। তবুও তার মুখ থেকে তার সাথী ও অন্য কারো পরিচয় ও ঠিকানা বের করতে পারেনি জালেমরা। ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত শত্রু চিহ্নিত করতে অন্য পন্থা উদ্ভাবন করল। রাতের দ্বিপ্রহরে দরবেশকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রী-সন্তানকে শাস্তি দিয়ে তাদের কাছ থেকে অন্যদের পাত্তা উদ্ধার করবে। এ উদ্দেশ্যে রাতের অন্ধকারে চার সিপাহী তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য রওয়ানা হয়েছিল। দরবেশের ঘর ছিল পুরনো হাভেলী থেকে অনেকটা আগে।

আলেম ও তার সাথীদের সবাই হাতে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। রাস্তায় একটু অগ্রসর হওয়ার পরই তারা সিপাহীদের দেখতে পেল। সিপাহীদের দেখেই তারা অন্ধকারে লুকিয়ে গেল। যেই তাদের পাশ দিয়ে দরবেশকে নিয়ে সিপাহীরা যেতে লাগল অমনি অতর্কিতে সবাই সিপাহীদের মাথায় আঘাত করল। উপর্যুপরি আঘাতে ওরা চিৎকার দেয়ার অবকাশও পেল না, জ্ঞান হারিয়ে চার সিপাহী লুটিয়ে পড়ল। দরবেশের হাত-পা বাঁধা ছিল শিকলে। তাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে সাথীরা সবাই অন্ধকার গলির মধ্যে আড়াল হয়ে গেল। গলিপথ ছিল নীরব নিস্তব্ধ। কেউ এই মহা অপারেশন দেখতে পেল না।

দাউদের দরবার থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়িতে এসেই আলেম এক ব্যক্তিকে বেরায় এ সংবাদ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, মুলতানের শাসক দাউদ বেরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাকে রাজী করানোর জন্যে হিন্দুরা নারী ও সোনাদানা উপঢৌকন পাঠিয়েছে। অনুরূপ সংবাদ লাহোর ও বাটাভাতেও পাঠানো হয়েছে। তিন তরফ থেকেই আক্রমণ আশঙ্কা রয়েছে সুলতানের।

সুলতানের কাছে অবশ্য এ সংবাদ অপ্রত্যাশিত নয়। তিনি এ সংবাদ পাওয়ার আগেই দু'জন হিন্দু সংবাদবাহককে বন্দী করে ষড়যন্ত্রের খবর জানতে পেরেছেন। এরপর মন্দিরে তল্লাশী চালিয়ে বিজি রায়ের বহু সেনা অফিসারকে গ্রেফতার করা

হলো। ষড়যন্ত্রকারী পণ্ডিতদেরও আটক করা হলো। সব হিন্দুকে শহরের বাইরে ময়দানে জড় করে মন্দিরের সকল মূর্তি ওদের সামনে রেখে দেয়া হলো। সমবেত সকল হিন্দুর উদ্দেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন সুলতান ঃ

"তোমাদেরকে আমি এখানে একত্রিত করে এ বিষয়টি বুঝাতে চাচ্ছি, তোমাদের হাতের তৈরী মাটি ও ইট পাথরের এসব মূর্তির কিছু করার ক্ষমতা নেই। এদের যদি ক্ষমতা থাকে তবে বল, তারা নিজেদেরকে রক্ষা করুক। এদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ কর। সব ছেড়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, যে আল্লাহ্ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের জীবন মরণের মালিক।"

সুলতানের নির্দেশে হিন্দুদের সামনেই সকল মূর্তি গুড়িয়ে টুকরো টুকরো করা হলো।

বেরা দখল করেই সুলতান দ্রুত পেশোয়ারে এই বলে দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, "যত কম সংখ্যকই হোক দ্রুত সৈন্য পাঠাও, রসদের দরকার নেই।"

সেইদিন থেকে সুলতানের প্রতিটি প্রহর কাটতো সাহায্যকারী সৈন্যাগমনের অপেক্ষায়। পথ ছিল দীর্ঘ। তাছাড়া শত্রু বেষ্টিত এলাকা দিয়ে অনেক ঘুরো পথে শত্রুদের দৃষ্টি এড়িয়ে সহযোগিদের পৌছাতে যথেষ্ট বিলম্ব হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু সমূহ বিপদাশঙ্কায় সহযোগী সৈন্যদলের আগমনের বিলম্ব অস্থির করে তুলেছিল সুলতানের মন। কারণ, দু'টি অপ্রত্যাশিত যুদ্ধে সুলতানের অধিকাংশ সৈন্য শহীদ হয়ে গিয়েছিল। সৈন্য ঘাটতি পূরণ করার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। অবশ্য বেরায় মুসলমান যথেষ্ট ছিল, কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদেরকে দাসে পরিণত করেছিল। সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের মোটেও নেয়া হতো না। শুধু তাই নয়, তরবারী, অস্ত্র চালনা ও অশ্বারোহণ করা ছিল মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ।

বেরায় সুলতানের অবস্থা হয়েছিল শিকারীদের পাল্লায় আহত বাঘের মতো। নিজের দেশ থেকে অনেক দূরে সুলতান। চতুর্দিকে শত্রু। অবস্থা এমনই করুণ যে, শুধু যে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে পরাজিত হবেন তাই নয়, জীবনাশঙ্কাও প্রকট হয়ে উঠেছিল তার। অবশিষ্ট সৈনিক ও কর্মকর্তাদের মনে বিরাজ করছিল চরম হতাশা।

"বন্ধুগণ! আমি তোমাদের জীবন নিয়ে জুয়া খেলা শুরু করিনি।" সকল কমান্ডারদের একত্রিত করে একদিন বললেন সুলতান। "উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি সচেতন। তবে জেনে রেখো এবং মনে সাহস রেখো, আমরা কখনও পালিয়ে যাবো না, পরাজিতও হবো না। আল্লাহ্ সঠিক সময়ে ঠিকই আমাদের সাহায্য করবেন। ইতোমধ্যে আমাদের অধিকাংশ আহত যোদ্ধা সুস্থ হয়ে উঠেছে, দু' একদিনের মধ্যেই সহযোগী সৈন্যরা এসে পড়বে। ইনশাআল্লাহ, আমাদেরকে অবশ্যই মুলতান অভিযান করতে হবে। এখানে আমরা বসে থাকলে মুলতানের সৈন্যরা আমাদের ঘেরাও করে ফেলবে এবং আনন্দ পাল ও বিজি রায়ের সৈন্যরাও

এদের সাথে যোগ দিবে। আর আমরা মুলতানে অভিযান চালালে ওদের পরাজিত করা কোন দুষ্কর ব্যাপার হবে না তা তোমরা জান। কারণ মুলতানের সৈন্যদের যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা নেই। মুলতান জয় করে নিলে ওখানকার সৈন্যদের দ্বারা আমাদের উপকার হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। শত পাপাচারী হলেও ওরা মুসলমান তো?"

সকল কয়েদীকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন সুলতান। যাতে ওরা চলতে পারে কিন্তু পা তুলে দৌড়াতে না পারে। অপরদিকে বেরার সকল মসজিদে আযান এবং বেদখল হওয়া মসজিদগুলোকে আবাদ করার নির্দেশ দিলেন আর বললেন, পুরুষরা মসজিদে এবং মেয়েরা বাড়িতে কুরআন খতম ও মুসলমানদের কল্যাণে নফল নামায পড় এবং দু'আ করতে থাক।"

বেরায় সুলতান যখন সহযোগী সৈন্যাগমনের অধীর অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন তখন লাহোরে চলছে অন্য কাণ্ড। লাহোরের রাজা আনন্দ পাল সুলতানের পথরোধ করতে গিয়ে এমনভাবে পরাজিত হলো, সে রাভী নদী পেরিয়ে কাশ্মীরের পথে পালিয়ে গেল। লাহোরে তার স্থলাভিষিক্ত ছিল রাজকুমার শুকপাল। শুকপালের অধীনেও বহু সৈন্য রিজার্ভ ছিল। এরা এ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু রাজার সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে দু'জন চারজন করে রাজধানীতে ফিরে এসে পরাজয়ে নিজেদের নিরপরাধ সাব্যস্ত করতে মুসলিম সৈন্যদের সম্পর্কে ভীতিকর বর্ণনা দিচ্ছিল। তাদের কথাবার্তায় মনে হতো, গযনী বাহিনীর সৈন্যরা মানুষ নয়, এগুলো জিনের মতো। তাদের কথা শুনে যুদ্ধে না যাওয়া সৈন্যদের মধ্যেও ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজকুমার শুকপাল ও তার মা রাণী প্রেমদেবী এসব সংবাদে চরম উদ্বিগ্ন ছিল। তারা রাজা আনন্দ পালের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল কিন্তু সপ্তাহ চলে যাওয়ার পরও তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কেউ বলতেও পারল না কোনদিকে গেছে রাজা।

আনন্দ পালের ছিল তিন স্ত্রী। প্রেমদেবীর পুত্র শুকপাল ছাড়াও তার আরো বৈমাত্রেয় ভাই ছিল। রাজার নিরুদ্দেশে প্রেমদেবীর উদ্বেগ ছিল না, তার দৃষ্টি ছিল রাজার অবর্তমানে পুত্র শুকপালকে সিংহাসনের অধিকারী করা।

একদিন শুকপালের কাছে খবর গেল, বেরা থেকে একটি দল জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছে। তাদেরকে তখনি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ডেকে নেয়া হলো। এরা ছিল বেরার মন্দিরে লুকিয়ে থাকা সামরিক অফিসার ও পণ্ডিতদের প্রেরিত সংবাদ বাহক। এই সংবাদ বাহকরা বাটান্ডায় আনন্দ পালের দ্বিতীয় রাজধানীতে খবর পৌঁছালে সেখানকার কর্তাব্যক্তিরা তাদেরকে বলল, এখানে সেনাভিযান পরিচালনা করার মতো কর্তৃত্ববান কেউ নেই, আপনারা লাহোর যান। সেখানে রাজার পুত্র শুকপাল রয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে অভিযান পরিচালনা করতে পারেন। সংবাদ

বাহকরা বেরার পরিস্থিতি জানিয়ে তাকে বেরা আক্রমণের প্রস্তাব করল। শুকপাল সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করে তার মাকে জানাল। শুকপালের মা প্রেমদেবী সংবাদ শুনে সাথে সাথেই সেনাপতি রাজ গোপালকে ডেকে পাঠাল।

সেনাপতি রাজ গোপাল বেরা আক্রমণে অস্বীকৃতি জানাল। রাজ গোপাল আত্মপক্ষ সমর্থনে বলল, যে বাহিনীর পথরোধ করতে গিয়ে রাজা আনন্দপাল পরাজিত হয়ে হারিয়ে গেছেন, পথে বিপুল জনবল হারানোর পরও যারা অগ্রাভিযান চালিয়ে রাজা বিজি রায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত ও সর্বাত্মক প্রস্তুত একটি বাহিনীকে পরাজিত করে রাজধানী দখল করেছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে হলে ওদের চেয়ে তিনগুণ সৈন্য প্রয়োজন। আমাদের ততো সৈন্য নেই। তাছাড়া বেরা পর্যন্ত পৌঁছাতে অন্তত দু'টো বড় নদী আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে। আমাদের এখন যে সৈন্য রয়েছে এদের মানসিক শক্তিও ভঙ্গুর। রাজকুমার শুকপাল ছেলে মানুষ। এমতাবস্থায় এতো বড় ঝুঁকি না নিয়ে মহারাজা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

"মহারাজার অনুপস্থিতির সুযোগটুকুই আমি নিতে চাই সেনাপতি।" বলল রাণী প্রেমদেবী। "বেরায় মাহমূদের মুষ্টিমেয় যে সৈন্য রয়েছে এরা আমাদের বাহিনীর আক্রমণে মোটেও দাঁড়াতে পারবে না। এ অভিযানে আমাদের বাহিনী বিজয়ী হলে এই বিজয় আমার পুত্রের সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তা আমার ছেলের সিংহাসনের অধিকারী হওয়ার সহায়ক হবে। আর যদি পরাজয় ঘটে তবে সেই পরাজয় হবে আমার। কেননা, সেনাবাহিনী কমান্ড থাকবে আমার হাতে। তাতে শুকপালের কোন ক্ষতি হবে না।"

"শুকপাল সাথে থাকবে বটে তবে তাকে রাখতে হবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাঝে। তার জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।" বলল রাজরাণী প্রেমদেবী।

রাজ গোপাল! তুমি কি বুঝতে পারছো না, আমাদের আগে যদি দাউদ বেরা দখল করে নেয় আর মাহমূদ ও দাউদ মিলে বেরাকে ইসলামী রাজ্যে পরিণত করে তবে এ অঞ্চলে গযনীর দু'টো ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। বলাতো যায় না, দাউদ আর যাই হোক মুসলমান তো, সে মাহমূদের সাথে যদি মিত্রতা গড়ে তোলে।"

"দাউদ সেনাভিযান করবে এমনটা আমি কল্পনাও করতে পারি না।" বলল সেনাপতি রাজগোপাল। "ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস আর মদ-নারীতে আকণ্ঠ ডুবে থেকে সে তো ধর্মকেই ভুলে গেছে, সে কোন দিন যুদ্ধের সাহস করার কথা নয়। গযনীর সৈন্যরা যুদ্ধ করে ঈমানের জোরে। দাউদ আমাদের কাছে ঈমান বিক্রি করে ফেলেছে, তার পক্ষে গযনী বাহিনীর মোকাবেলা করা অসম্ভব।"

রাজগোপালকে অন্য কক্ষে নিয়ে গেল প্রেমদেবী। প্রেমদেবীর বয়স তখন প্রায় পঁয়ত্রিশ। কিন্তু তার শরীর, সৌন্দর্য তখনও কুমারীর মতো অটুট। সে

রাজগোপালের চোখে চোখ রেখে বলল, রাজগোপাল! ভুলে গেলে, শুকপাল যে তোমারই সন্তান। মহারাজাকে মানুষ শুকপালের বাবা বলে সে আমার স্বামী বলে। রাজরাণী হওয়ার পরও তোমাকেই আমি হৃদয়ের স্বামী বানিয়ে রেখেছি। মহারাজা আনন্দপাল লাহোরের এ যুদ্ধে তোমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাকে বলেছি, রাজধানীতে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি থাকা দরকার। তুমি তার সাথে গেলে নিশ্চয়ই নিহত হতে........। রাজগোপাল! তোমার সন্তানকে সিংহাসনে আসীন করাতে উদ্যোগী হও। আমি চাই, তোমার সন্তান শুকপাল মাহমূদকে কয়েদ করে লাহারে নিয়ে আসুক। রাজগোপাল! তোমাকে আমার প্রেমের দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি অভিযানে আপত্তি করো না।"

সুলতান মাহমূদ জানতেন, পেশোয়ার থেকে সহযোগী বাহিনীর এতো তাড়াতাড়ি পৌঁছা সম্ভব নয়। তবুও তিনি শহর প্রাচীরের উপরে উঠে অধীর উদ্বেগে উত্তর-পশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ধুলো উড়তে দেখলেই সহযোগী বাহিনী এসে গেছে বলে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

* * *

মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত দুই তরুণী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তরুণীদ্বয় পান পাত্রে ঢেলে দিচ্ছিল শুরা, আর আয়েশী ভঙ্গিতে গলাধঃকরণ করছিল দাউদ। এমতাবস্থায় দাউদকে খবর দেয়া হলো, প্রহরী হত্যাকারী কয়েদীকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পথে প্রহরীদেরকে বহু লোকজন আক্রমণ করে আসামী ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। মদে মাতাল দাউদ নির্দেশ দিল। ওরা ঘুষ খেয়ে কয়েদীকে ছেড়ে দিয়েছে। ওদেরকে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখো। আর কয়েদীর ঠিকানা তালাশ করে ওর স্ত্রী সন্তান ধরে এনে বন্দী করো। কিন্তু দরবেশের বাড়ি তালাশ করে সৈন্যরা ওখানে কোন মানুষকেই দেখতে পেল না।

একদিন সকালে উত্তর-পশ্চিম দিকের বদলে উত্তর-পূর্ব দিকে ধুলো উড়তে দেখলেন। সুলতান ধুলো দেখেই বুঝতে পারলেন কোন সেনাবাহিনী এদিকে আসছে। তিনি ভাবলেন, আমার সহযোগী বাহিনী হয়তো এসে পড়েছে। তিনি দৌড়ে শহর প্রাচীর থেকে নেমে এলেন মুলতান রওয়ানা হওয়ার জন্য। তিনি মুলতান পৌঁছাতে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। তার গন্তব্য ছিল মুলতানেরই দিকে। কিন্তু পথিমধ্যে বিজি রায় তার পথরোধ করার কারণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হলো।

তিনি সেনাপতিদের ডেকে বললেন, "সহযোগী বাহিনী এসে গেছে। অতএব আমরা আগামীকালই রওয়ানা হচ্ছি।" এমন সময় এক অশ্বারোহী গোয়েন্দা খবর নিয়ে এলো, "কোন এক শত্রুবাহিনী আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে! বাহিনীতে হাতি ও বহু সংখ্যক অশ্বারোহী ছাড়াও পদাতিক সৈন্য রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এরা হিন্দু। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না কোন রাজা বা মহারাজার সৈন্য এরা।"

সুলতান মাহমূদ চিৎকার দিয়ে উঠলেন এই বলে, তোমরা বসো, আমি নিজেই ওদের দেখে আসছি। তিনি দ্রুত একটি ঘোড়ায় চড়ে ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটি উচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে তিনি অগ্রগামী বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি কয়েকবার জায়গা বদল করে শত্রুবাহিনীর জনবলের আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন এবং তার সাথে আগমনকারীকে বললেন, আমরা ওদেরকে অবরোধের সুযোগ দেবো না, তাহলে মুলতানের বাহিনী এসে সেই অবরোধকে আরো দীর্ঘায়িত করবে। তুমি জলদী যাও। কৃষক ও মুসাফির বেশে কয়েকজন গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দাও, যাতে তারা এরা কার সৈন্য এবং এদের উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে নিশ্চিত খবর নিয়ে আসতে পারে।"

শহরে ফিরে এসেই সুলতান নিজের স্বল্প সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। এমন সময় তাকে আবার খবর দেয়া হলো উত্তর-পশ্চিম দিকেও ধুলো উড়তে দেখা যাচ্ছে। তিনি দৌড়ে শহর প্রাচীরের উপর উঠলেন। তাকে এ দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছিল যে, এটি কি পেশোয়ারের সহযোগী বাহিনী না রাজা আনন্দপালের বাহিনী! দুশ্চিন্তায় তার চেহারায় ঘাম দেখা দিল, তিনি একবার উত্তর-পশ্চিম কোণে একবার পূর্ব-উত্তর কোণের উড়ন্ত ধুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল নদী। তার চিন্তা শক্তি বিদ্যুতের মতো তীব্র গতিতে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছিল। নদীর দিক থেকে উর্ধ্বশ্বাসে শহরের দিকে ছুটে এলো একজন অশ্বারোহী। কাছে পৌছতেই তাকে সুলতানের নিকটে আসার জন্য ইঙ্গিত করা হলো। অশ্বারোহী কাছে পৌছে সালাম দিয়ে জানাল, মাননীয় সুলতান! সহযোগী বাহিনী এসে পড়েছে।

সাথে সাথে সুলতান বললেন, "ওদেরকে নদীর তীরেই থামতে বল।" আরো বললেন, "অন্য কাউকে পাঠাও, এ লোকটি ক্লান্ত হয়ে গেছে।"

রাতে সুলতান নিজেও শয্যা গ্রহণ করলেন না, অন্য কাউকেও ঘুমাতে দিলেন না। ইত্যবসরে তার কাছে খবর পৌছল, উত্তর-পূর্বের বাহিনী আনন্দপালের কিন্তু রাজা আনন্দপাল নেই, তার ছেলে শুকপাল বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই সংবাদের ঘণ্টা তিনেক পর আবার সংবাদ এলো, লাহোরের বাহিনী শহর থেকে তিন মাইল দূরে থেমে গেছে কিন্তু তারা তাঁবু ফেলেনি। বোঝা যায়, রাতেই তারা শহর অবরোধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এ সংবাদ জানার পর দু'জন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে রাতেই সুলতান সহযোগী বাহিনীকে যেখানে থামতে বলেছিলেন সেখানে চলে গেলেন। পেশোয়ারের সহযোগী বাহিনী ও লাহারের আনন্দপালের সৈন্যের মাঝে ব্যবধান ছিল মাইল পাঁচেক—তন্মধ্যে ছিল ঝিলাম নদী।

সহযোগী বাহিনীর অধিনায়ককে বুকে নিয়ে সুলতান বললেন, "তোমরা আমার জন্যে আল্লাহ্‌র রহমত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছো। তোমরা আজ না পৌঁছলে আমি বুঝতে পারছিলাম না আমাদের অবস্থা কি হতো?"

"ভাই নু'মান! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমার অবস্থান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে রাজা আনন্দপালের সৈন্যরা অবস্থান করছে। ওরা রাতের শেষভাগে কিংবা ভোরে শহর অবরোধ কিংবা আক্রমণ করবে। বেলা উঠার আগেই তুমি সৈন্যদের নদী পার করিয়ে ওপারে নিয়ে যাবে। কিন্তু কোন শোরগোল করবে না। দিনের আলোতে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে আর উঁচু জায়গায় বসে শত্রু সেনাদের পর্যবেক্ষণ করবে। আমি ওদেরকে শহর অবরোধ করার সুযোগ দেব না। একদল পদাতিক সৈন্যকে ওদের দিকে এগিয়ে দেবো, ওরা ওদের মুখোমুখি হয়ে পিছিয়ে আসবে। আর ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে। তোমার সামনে থাকবে এদের একবাহু, ইচ্ছে করলেই তুমি ওদের পিছনে চলে যেতে পারবে। আমি ওদের সম্মুখ দিক ও বাম বাহু সামলাবো।"

শুকপাল ও সেনাপতি রাজগোপাল রাত পোহাতে দেয়নি। ফজরের নামায থেকে সালাম ফেরাতেই সুলতানকে খবর দেয়া হলো, শত্রুবাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। তাকে আরো বলা হলো, শত্রুবাহিনীর আগমন দেখে মনে হচ্ছে, তারা শহর অবরোধ করবে। শহরের কাছে এসে ওরা অবরোধ বিস্তৃত করছে, আরো ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে সুলতানের পরিকল্পনা বেকার হয়ে গেল। তিনি পদাতিক বাহিনী পাঠিয়ে ওদেরকে এগিয়ে এনে সুবিধামতো জায়গায় অবস্থান নেয়ার সুযোগ পেলেন না।

সুলতান মাহমূদ শহর প্রাচীরে উঠে দেখলেন, শহর থেকে এক মাইলের মতো দূরে—এগিয়ে আসছে শত্রুবাহিনী। তিনি কমান্ডারদের নির্দেশ দিলেন, অশ্বারোহীদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে দুই প্রান্তে আক্রমণ করো। অশ্বারোহীরা প্রস্তুতই ছিল। দ্রুত শহর থেকে অশ্বারোহীরা বেরিয়ে দু'দিকে শত্রুবাহিনীর দুই বাহুর দিকে চলে গেল।

রাজগোপাল সুলতানের বাহিনীকে অগ্রসর দেখে বিদ্যুৎ গতিতে তার বাহিনীর বিস্তৃতি রুখে সুলতানের অশ্বারোহীদের ঘেরাও করে ফেলার চেষ্টা করল। সুলতানের অশ্বারোহীরা বিজলীর গতিতে আঘাত করল শত্রুবাহিনীর বাহুতে। সুলতান শহর প্রাচীরে দাঁড়িয়ে সবই প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি দ্রুত অশ্বারোহী বাহিনীর পিছনে পদাতিক বাহিনীকে পাঠালেন বাম বাহুতে আঘাত হানতে। সুলতানের নির্দেশ মতো উভয় দল পশ্চাদপসরণ শুরু করল। এতে শত্রুবাহিনী পদাতিক বাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়ল। ভেঙে গেল ওদের অবরোধ চেষ্টা। শত্রুবাহিনীর পশ্চাদদেশ এখন নদীর তীরে অপেক্ষমাণ সুলতানের সহযোগী বাহিনীর সামনে।

নু'মান ছিলেন অভিজ্ঞ সেনাপতি। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তারা আক্রমণ চালাল পিছন দিক থেকে। শত্রুবাহিনী আর পালিয়ে যাওয়ার অবকাশ পেল না। ওদের আহত হাতিগুলো তাদের জন্য হয়ে উঠল যমদূত।

বেলা তখন উপরে উঠে গেছে। হিন্দুদের ঢাকঢোল নাকারার আওয়াজ, হাতির চিৎকার আর ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ও মুসলিম বাহিনীর তকবীরে আকাশ কেঁপে উঠছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। সুলতান মাহমূদ নগর প্রাচীরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তার দৃষ্টি ছিল রাজকুমার শুকপালকে বহনকারী হাতির উপর। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, হিন্দুদের পতাকা বহনকারী সওয়ার শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। হতাহত হচ্ছে হিন্দুরা। মুসলমানরা ঝটিকা আক্রমণ করে দ্রুত জায়গা বদল করছে। এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে শুকপাল ও হিন্দুদের পতাকাবাহী হাতি সোজা এগিয়ে আসল শহর প্রাচীরের দিকে। সুলতান দেখলেন, হাতির উপরে রাজকীয় আসনে বসা এক যুবক। হাতিটি আহত হয়ে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল। শতচেষ্টা করেও মাহুত এটিকে শহরের দিকে আসার গতি ফেরাতে পারেনি। আহত হাতি শহর প্রাচীরের প্রধান গেটে এসে থামতেই একসাথে কয়েকটি তীর এসে বিদ্ধ হলো হাতির গায়ে। ভয়ংকর চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল হাতি। মাহুত এক লাফে হাতি থেকে নেমে দৌড়ে পালাল। সুলতান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, "হাতিটিকে ধরে ফেল।"

যুবককে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সেই হবে আনন্দপালের ছেলে রাজকুমার শুকপাল। পতাকাবাহী ছাড়া তার সাথে আর কেউ ছিল না। বেসামাল হাতির আর্তচিৎকারে হাতি থেকে নেমে পড়ল শুকপাল। সে শহর প্রাচীরের গায়ে গা ঘেঁষে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সুলতান নির্দেশ দিলেন, ওকে ধরে উপরে নিয়ে এসো।"

সুলতান এগিয়ে গেলেন শোকপালের দিকে। হাত ধরে বললেন, "ভয় পেয়ো না। তোমার কিছু হবে না। তোমার সাহসের প্রশংসা করতেই হয়। তবে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসার আগে বাবাকে তোমার জিজ্ঞেস করে আসা উচিৎ ছিল, গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে কত মূল্য দিতে হয়। এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সৈন্যদের পরিণতি দেখো।"

শুকপাল দেখলো, তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে মুসলমানদের হাতে কচুকাটা হচ্ছে। ওদের গর্বের হাতিগুলো সেনাদের পিষে মারছে আর মুসলিম সৈন্যরা তকবীর দিয়ে ময়দানে একক প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সেনাপতি রাজগোপালকে কোথাও দেখতে পেল না শুকপাল। শঙ্কায় কাঁপতে লাগল রাজকুমার।

"আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে?" সুলতানকে জিজ্ঞেস করল রাজকুমার।

"নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ কর। তোমার ক্ষেত্রে আমি হলে তুমি কি সিদ্ধান্ত নিতে। তবে এর আগে এ ব্যাপারটি বুঝে নাও, তোমাদের হাতে গড়া

মূর্তিগুলো তোমাদের কোনই সাহায্য করতে পারে না। এসব মিথ্যা দেবদেবী ছেড়ে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে মানো, তার ইবাদত কর। এই আল্লাহ আমাকে দুরবস্থার মাঝেও এ নিয়ে তৃতীয় বিজয় দান করেছেন।"

"আপনি আমার ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ।" বলল শুকপাল।

সুলতান মৌলভী সাঈদুল্লাহকে ডেকে বললেন, "এই যুবককে আপনার কাছে রাখুন। সে কয়েদীও নয়, আযাদও নয়। এখন সে তার ধর্মের প্রতি আস্থাহীন। তাকে খুব যত্ন করুন।"

বিজয়ের তিনদিন পর সুলতান মুলতানের উদ্দেশে রওয়ান হওয়ার ঘোষণা দিলেন। তার সামনে দু'শ মাইলের দীর্ঘ সফর। সুলতান সকল কয়েদীকে পায়ের শিকল মুক্ত করে গলায় বেড়ী পরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কাফেলা দ্রুত চলার জন্য গরুর গাড়িগুলো যেখানে বালু ও চড়াইয়ে আটকে যেতো কয়েদীদের ঠেলে তুলতে নির্দেশ দিতেন। কাফেলা অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিলো।

এদিকে মুলতানের কেরামতী শাসক লাহোর ও বাটান্ডার সৈন্যদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদের অপেক্ষায় ছিল। যুদ্ধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হিন্দুদের "নিমক হালাল" করতে বাধ্য হয়েই সে বেরা আক্রমণের জন্যে তৈরী হয়ে সংবাদের অপেক্ষায় ছিল। তার কাছে আর লাহোর বাহিনীর সংবাদ পৌঁছল না।

বেরা থেকে যুদ্ধে যাওয়ার কোন সংবাদ এলো না বটে তবে তার গোয়েন্দারা তাকে খবর দিল, এক বিশাল বাহিনী দ্রুতগতিতে মুলতানের দিকে আসছে। দাউদ খবর পেয়ে দৌড়ে দুর্গের উপরে একটি মিনারে উঠে অগ্রসরমান সৈন্যদের দেখতে লাগল, ততক্ষণে সুলতানের বাহিনীকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সুলতানের সৈন্যরা মুলতানের সীমানায় প্রবেশ করল। দাউদ তার বাহিনীকে দুর্গ প্রাচীরে মোকাবেলার জন্য দাঁড় করিয়ে প্রধান গেট বন্ধ করে সেখানকার পাহারা মজবুত করতে নির্দেশ দিল। দেখতে দেখতে সুলতানের বাহিনী মুলতান শহর অবরোধ করে ফেলল।

সুলতানের পক্ষ থেকে দাউদকে কয়েকবার শহর গেট খুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দেয়া হল। বলা হলো, গেট খুলে না দিলে শহরের প্রতিটি ইট খুলে ফেলা হবে এবং সকল কেরামতীকে হত্যা করা হবে।

সুলতান মাহমূদকে বলা হয়েছিল, কেরামতীরা নির্বীর্য ও সাহসহীন। এরা পাপাচারে লিপ্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয়। কিন্তু শহরে প্রবেশের প্রতিটি আক্রমণ ওরা ভয়ংকরভাবে ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। কয়েকটি হামলা এভাবে ব্যর্থ করে দেয়ার পর সুলতানের ভুল ভাঙল।

টানা সাতদিন অবরোধ করে রাখার পরও কেরামতীরা শহরে প্রবেশ রোধে কঠোর অবস্থান বজায় রাখল। সুলতান বললেন, "এভাবে অবরোধ দীর্ঘায়িত করার সুযোগ নেই। আমাদের হাতে সময়ও নেই। তোমাদেরকে আল্লাহ্ কঠিন মুহূর্তেও বিজয়ী করেছেন এবারও করবেন। প্রাচীর ডিঙাতে এবং ভাঙতে চরম আঘাত হানো, এরা পাপাচারী এরা তোমাদের ঠেকিয়ে রাখবে কোন শক্তি দিয়ে।"

সুলতান শহর দুর্গের প্রধান ফটক ও প্রাচীর ভাঙতে গাছ কেটে দু'টি হাতির মাঝে বেঁধে হাতি দৌড়িয়ে আঘাত করতে নির্দেশ দিলেন। ঝুলন্ত গাছ নিয়ে হাতি শহর ফটকে আঘাত হানছিল। এভাবে কেটে গেল আরো তিনদিন। হাতি ও মানুষ মিলেও প্রধান গেট ভাঙতে সক্ষম হলো না। দরজার কাছাকাছি গেলেই উপর থেকে কেরামতীদের তীরবৃষ্টি বর্ষণে মুজাহিদরা হতাহত হচ্ছিল। প্রধান ফটকের দিকে কেরামতীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অন্যদিকেও প্রাচীর ভাঙার চেষ্টা চলছে। শহরের ভিতরে অবরুদ্ধ লোকেরা আতংকিত হয়ে ভয়াবহ চেচামেচি শুরু করেছে। আর গেটের বাইরে মুসলিম সৈন্যদের তকবীর ধ্বনি ও হাতী-ঘোড়ার চিৎকারে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। শহরের ভিতরের মুসলিম নাগরিকরা যখন জানতে পারল, গযনীর সুলতানের বাহিনী মুলতান আক্রমণ করেছে তখন তারা ভিতর থেকে প্রধান গেট খুলে ফেলার জন্যে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লে কেরামতীরা তাদের সবাইকে শহীদ করে ফেলে।

চতুর্থ দিন দাউদ বিন নসর ভীত হয়ে বছরে বিশ লাখ দিনার কর দেয়ার অঙ্গীকার করে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠাল সুলতানের কাছে। কিন্তু সুলতান যখন শুনলেন, ভিতরের মুসলমানরা দরজা খোলার চেষ্টা করলে তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে, তখন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি কমান্ড নিজের হাতে নিয়ে আখেরী হামলা চালালেন। মুসলিম যোদ্ধারা মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গেট ভাঙতে। কয়েক জায়গা ভেঙেও ফেলল। দুরাচারী কেরামতীদের গণহত্যার নির্দেশ দেয়া হলো। সুলতান নিজেই এতো কেরামতী হত্যা করলেন যে, জমাট রক্তে তরবারীর হাতলে তার হাতের মুষ্টি এভাবে আটকে গিয়েছিল, মুষ্টি আর খুলতে পারছিলেন না। দীর্ঘক্ষণ গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর তার হাতের মুষ্টি খোলা সম্ভব হয়েছিল।

কেরামতীরা সেদিন ইতিহাসের শেষ লড়াই করেছিল সুলতান বাহিনীর মোকাবেলায়। সেদিন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ওরা শেষ রক্ত বিন্দু ঢেলে দিয়েছিল। কেরামতী নারীরাও অস্তিত্ব রক্ষায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু মুসলিম বাহিনীর ক্রোধের মুখে তারা ছিটকে পড়ে গেল। সেদিনের যুদ্ধে কেরামতীদের রক্তের বন্যায় মুলতান শহর ভেসে গিয়েছিল।

দাউদ বিন নসর সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। দাউদের লাপাত্তা হওয়ার সাথে সাথে মুলতানের যমীন থেকে

চিরতরে কেরামতী শাসন ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হলো। কেরামতী শাসন এখন এক ইতিহাস। সুলতান মাহমূদ মুলতান দখল করে কেরামতীদের স্বর্গ-মন্দির ধ্বংস করে দিলেন। ওদিকে ভিতর থেকে দরজা খুলে দেয়ার অভিযানে মুলতানের সেই দরবেশ, আলেম ও তাদের সহকর্মীবৃন্দ জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

মুলতান অভিযান শেষ করে তখনও স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেননি সুলতান। তিনি এর পুনর্গঠন ও মুলতানকে গযনী শাসনের অধীনের মজবুত ঘাঁটি তৈরীর ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলেন। এ মুহূর্তেই হেরাতের গভর্নর আরসালানের কাছ থেকে পয়গাম এলো-কাশগরের রাজা এলিখ খান গযনী আক্রমণ করেছে। খবর শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন সুলতান।

তিনি আবু আলী মঞ্জুরীকে মুলতানের গভর্নর নিযুক্ত করে দ্রুত বেরায় পৌছলেন। বেরা এসে জানতে পারলেন, শুকপাল মুসলমান হয়ে গেছে। সে এখন সুলতানের গোলাম ও বৎস হয়েই থাকতে চাচ্ছে। সুলতানের মন তখন গযনীতে। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে গযনী আক্রমণের সংবাদে। তিনি গভীরভাবে অগ্রপশ্চাৎ ভাববার অবকাশ পেলেন না। শুকপালের আনুগত্য ও মুসলমান হওয়ার কারণে তাকে বেরার গভর্নর ঘোষণা করলেন। যদিও তাকে জানানো হলো, হিন্দুরা অবিশ্বস্ত ওদের উপর এতোটা বিশ্বাস করা ঠিক হবে না কিন্তু কারো কথা শোনার সময় তার ছিল না। ঘোষণা সেরেই তিনি গযনীর পথে পা বাড়ালেন............।

সুলতান মাহমূদের সামনে এখন শত্রু কবলিত রাজধানী গযনী। অপর দিকে বেরায় নিজের নিয়োজিত হিন্দুজাদা শুকপাল। যার রক্তে রয়েছে অবিশ্বাস, প্রতারণা ও মিথ্যার মিশ্রণ। সুলতানের অনাবশ্যক পুরস্কার ও উদারতার প্রতিদান কিভাবে শোধ করবে শুকপাল? দীর্ঘ পথপাড়ি দিয়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত সহযোদ্ধা ও সুলতান কিভাবে উদ্ধার করবেন শত্রু কবলিত রাজধানী?

এসবের বিস্তারিত জানতে সিরিজের পরবর্তী খণ্ডের জন্য একটু অপেক্ষা করুন।

হিন্দু রাজা-মহারাজাদের রাম রাজত্ব বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন সুলতান মাহমূদ। তাদের আজন্ম স্বপ্ন রাম রাজত্বকে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত করা। কেননা তাদের ভাষায় মুসলমানরা কাবা ঘরের ৩৬০দেব-দেবীকে উৎখাত করে দেবালয় জবরদখল করেছে। কাবার একমাত্র অধিকার পৌত্তলিকদের। কাবা ঘর নাকি ভগবানের তৈরী প্রথম দেবালয়।
হিন্দু মহারাজা জয়পাল দু'বার পরাজিত হয়ে শেষ বারের মত চূড়ান্ত আঘাত হানে মাহমূদকে নিশ্চিহ্ন করতে। কিন্তু চূড়ান্ত যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বন্দী হল জয়পাল। বিপুল অংকের মুক্তিপণ ও ভবিষ্যতে যুদ্ধ না করার শর্তে মুক্তি পেয়ে রাজধানীতে গিয়ে পুত্র আনন্দপালের নিকট শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিল জয়পাল। কিন্তু তাতেও হিন্দুদের শত্রুতা প্রশমিত হল না। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র পেল দ্বিগুণ মাত্রা।

এদিকে মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরের চক্রান্তের শিকার হয়ে ওমর ফিরে এল রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রের নীল নক্সা নিয়ে। কিন্তু ব্যর্থ হল ওমরের চক্রান্ত। নিজ তলোয়ার পেটে বিদ্ধ করে বেঈমানীর প্রায়শ্চিত্ত করল ওমর। যশস্বী অফিসার পিতা ওমরের অপমৃত্যু নাড়া দিল তরুণ যোদ্ধা কাসেমকে। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠল পুত্র কাসেমের মধ্যে। মায়ের আশির্বাদ নিয়ে অগ্রবর্তী দলের কমান্ডার হিসাবে শুরু হল তার অভিযান। পেশোয়ার-মুলতানের পথে পথে প্রতিটি রণক্ষেত্রে ঝলসে উঠল কাসেমের তলোয়ার। অকুতোভয় কাসেম ও তার সহযোদ্ধাদের **ঝলকিত তলোয়ার** ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল আনন্দপালের অহংকার। উৎঘাটিত হল চারকুমারী দুর্গের তেলেসমাতি কারবার।

বিশুদ্ধ ইতিহাসের আলোকে রচিত এ উপখ্যান আপনাকে নিয়ে যাবে হাজার বছর আগের উপমহাদেশে। দিক নির্দেশ করবে আজকের উদ্ভূত সংকটময় মুহূর্তে করণীয় নির্ধারণে। দেখাবে ইতিহাসের দর্পণে সেকাল ও একালের চিত্র। সময় ও ক্ষেত্রের ভিন্নতা হলেও সত্যপন্থী মুসলিম ও তাবৎ বেঈমানদের অবস্থা সেই আগের মতই।

এই বই পড়ে মিলিয়ে দেখুন, বর্তমান ও অতীতের চিত্রে পার্থক্য কতটুকুন!

আবেহায়াত পাবলিকেশন্স

আবেহায়াত পাবলিকেশন্স